৯ শ্রেণীর

954.01
H 67

ইতিহাস

নবপর্যায়

খণ্ড ৮ সংখ্যা ২ ও ৩ ॥ ১৩৮০ শ্রাবণ-পৌষ

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমলেন্দু দে শ্রীঅনিরুদ্ধ রায়

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত শ্রীশোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩.০০
বার্ষিক চাঁদা ১০.০০
রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে ১৪.০০
ছাত্র সদস্য ৬.০০

P, 5600

মুদ্রক
শ্রীনলিন রায়
অটো-প্রিন্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৭০০০০৬

ইতিহাস অষ্টম খণ্ড ॥ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা· শ্রাবণ-পৌষ ॥ ১৩৮০

সূচীপত্র

বীরভূমের লোহা-মহাল : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ॥
রতন গুপ্ত ১৭

ভারতের বিপ্লব সংগ্রামে শ্রীমতী ভিকাজী কামার কামা ।
আরতি গঙ্গোপাধ্যায় ৮৮

বাংলার নবজাগরণ : কয়েকটি প্রশ্ন ॥
অমলেন্দু দে ১০৩

প্রাচীন ব্যাবিলনের গণিত চর্চা ॥
প্রদীপ কুমার মজুমদার ১১৪

ফরাসী বিপ্লবের মূল্য নিরূপণের ব্যর্থতা ॥
দিলীপ কুমার বিশ্বাস ১২১

পোয়েটিকস্ ও ইতিহাসের যুক্তি ॥
কাতিক লাহিড়ী ১৪৪

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার মৌল প্রবর্তনা ।
নিখিলেশ গুহ ১৫২

পুস্তক পরিচয় ॥
(১) স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জী :
অমলেন্দু দে ও বিনয় ভূষণ রায়
জগদীশ নারায়ণ সরকার ১৬২

(২) ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্স : অমর দত্ত ।
নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ১৭১

Publications of Calcutta Historical Society

BENGAL PAST AND PRESENT
(Bi-annual Journal of Modern Indian & Asian History)
Annual Subscription Rs. 20/-

BENBAL PAST AND PRESENT SPECIAL SIR JADUNATH BIRTH CENTENARY NUMBER
Rs. 16/-

BENGAL PAST AND PRESENT SPECIAL DIAMOND JUBILEE NUMBER, 1967.
Rs. 15/-

ITIHAS
A Quarterly Journal of History in Bengali)
Annual Subscription Rs. 10/-

LITTLE'S HOUSE OF JAGAT SETH,
With an Introduction by Dr. N. K. Sinha Rs. 15/-

SIR JADUNATH RACHANAPANJI
Compiled by : Amalendu De & Benoy Bhusan Roy Rs. 8/-

Available at Dasgupta & Co., Calcutta 12

ইতিহাস

নবপর্যায়

খণ্ড ৮ সংখ্যা ৪ ॥ ১৩৮০ মাঘ-চৈত্র

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমলেন্দু দে শ্রীঅনিরুদ্ধ রায়

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত শ্রীশোভন [illegible]

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩.০০
বার্ষিক চাঁদা ১০.০০
রেজেস্ট্রী ডাকযোগে ১৪.০০
ছাত্র দপ্তর ৬.০০

মুদ্রক
শ্রীঅনিল রায়
অটো-প্রিন্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৭০০০০ ৬

ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ॥ ১৩৮০

স্মৃতি কথা ॥
রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৭৩

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান : একটি সমীক্ষা ॥
রমাকান্ত চক্রবর্তী ১৮১

পণ্ডিত গুরুচরণ বিদ্যালঙ্কার ১৭৯২-১৮১৯ ॥
সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায় ২১১

উনিশ শতকের বাংলার বর্ষচিন্তা ও অক্ষর বর্ষ ॥
অমিত ভট্টাচার্য ২২৬

বাংলার নবজাগরণ : কয়েকটি প্রশ্ন ॥
অমলেন্দু দে ২৪৯

বিশেষ ঘোষণা

ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি গত সাধারণ অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন যে সোসাইটি আর ইতিহাস পত্রিকা প্রকাশ করিবেন না। ডঃ অরুণ দাশগুপ্ত, ডঃ নিমাই সাধন বসু, ডঃ অশীন দাশগুপ্ত ইতিহাস পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব লইয়াছেন।

সম্পাদক মণ্ডলী, ইতিহাস পত্রিকা

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন বছরের বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা (রেজেস্ট্রি সহ ১৪ টাকা) অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাবেন।

অরুণ দাশগুপ্ত
৪৭/২এ গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-১৯

UNIVERSITY

ইতিহাস

৮ম খণ্ড | শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০ | [২য় ও ৩য় সংখ্যা

বীরভূমের লোহা-মহাল ঃ আষ্টদশ শতাব্দীতে

রঞ্জন গুপ্ত

বীরভূম জেলায় লোহাখনি কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও এর উৎপাদন যে সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা চলে। খনিগুলো ছিল প্রধানতঃ নলি মল্লারপুর ও মৌড়েশ্বর পরগণায়।১ রুক্ষ, পাথুরে এবড়ো খেবড়ো মাটি, এখানে ওখানে ছিটানো-ছড়ানো ছোটখাটো পাহাড় বা টিলা; আর হিংস্র জন্তু জানোয়ার অধ্যুষিত ঘন বন: খনি অঞ্চলের এই হলো মোটামুটি ভূপ্রকৃতি। এরই ভেতর বনাঞ্চল পরিষ্কার করে গড়ে উঠেছিল ছোটবড় কর্মমুখর কিছু গ্রাম জনপদ: জেলার লৌহ উৎপাদনের কেন্দ্র। অপেক্ষাকৃত বনমুক্ত গ্রামগুলোতে হিন্দু ও মুসলমানের বাস; বনবনের অধিবাসী সাঁওতাল ও আগুরিয়ার (আগুরি ?) উপজাতি। লৌহ উৎপাদনে আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের যৌথ ভূমিকা।

উৎপাদনের কাজ চলতো দেশীয় পদ্ধতিতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রথমে শক্ত পাথুরে মাটি খুঁড়ে আকরিক লৌহ বা লোহা-পাথর উত্তোলনের কাজ। ভূস্তরের পনেরো থেকে পঁচিশ ফুট গভীরে সাধারণত লোহার স্তর পাওয়া যেত।২ একাজ মুখ্যতঃ আগুরিয়া উপজাতির একচেটে,৩ যদিও কঠোর পরিশ্রমী তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও কেউ কেউ এতে অংশ গ্রহণ করতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দু ব্যাপারীরা সংগ্রহ করিতেন ঐ আকরিক ধাতুর সওদা।৪ সাধারণত নামমাত্র মূল্যে— কিছু ধানচাল বা নুন, একটিলতে কাপড় অথবা প্রয়োজনীয় বা চোখ-ভোলানো

কোন তুচ্ছ দ্রব্যের বিনিময়ে। বলদের পিঠে চাপিয়ে ব্যাপারীরা তাঁদের মাল নিয়ে যেতেন বিভিন্ন আড়ং বা উৎপাদন কেন্দ্রে। একটি আড়ং-এ থাকতো অনেকগুলো কোটশাল বা কাঁচা লোহা উৎপাদনের চুল্লী। শামুইরা এগুলোর মালিক ও পরিচালক।[৭] ব্যাপারীদের কাছ থেকে কেনা আকরিক লোহায় তাঁদের কোটশাল চলতো। কোটশালের গঠন কৌশল ছিল একান্তভাবে দেশীয়। প্রথমে শক্ত শাল বা তালের খুঁটির উপর তোলা হতো মস্ত উঁচু এক চালা। খুঁটি থেকে সাত আট হাত দূরে চালার ভেতরে খনন করা হতো দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় যথাক্রমে দশ, দশ ও সাত-আট হাত একটি কূপ। কূপের মাঝামাঝি প্রাচীর তুলে তাকে দুভাগ করা হতো। প্রাচীর তৈরী হতো খরবোনার মাটি দিয়ে। প্রাচীরের একধারে বাঁধা একটি শক্ত মাচা; মাচার উপর স্থাপিত দুটি হাপর; হাপর দুটির নল মাঝ-প্রাচীর বরাবর নোজা নামিয়ে ভূমিতল সংলগ্ন এক বৃহৎ ছিদ্রপথ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো প্রাচীরের ওপাশে কূপের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে। সেখানে প্রথমে কাঠ কয়লা দিয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে সাজানো হতো লোহা-পাথরের কুচি ও কাঠ কয়লা। এক হাত উঁচু প্রতি স্তর, এমনি করে সাত আট স্তর সব শুদ্ধ। কয়লা ও আকরিক ধাতুর সাজানো পাঁজার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো একহাত দেড়হাত পুরু করে। এবারেও ঐ খরবোনার মাটি। তৈরী হলো শাল বা চুল্লী। এরপর শালে আগুন ধরিয়ে সুরু হয় মাচার উপর হাপরের কাজ। চারজন মজুর পা দিয়ে দুটি হাপর চালাবে অহোরাত্র, অবিরাম। হুস্‌হুস্‌ করে নল দিয়ে চুল্লীর মধ্যে হাওয়া ঢুকবে। এভাবে শালে কাজ চলবে একটানা চারদিন চাররাত।[৮] বড়শাল হলে সাতদিন সাতরাত।[৯] খুবই শ্রমসাধ্য কাজ; তাই ঘনঘন মজুর পাল্টানোর প্রয়োজনে বৃহৎ একটা কোটশালে প্রয়োজন হতো প্রায় একশোজন শ্রমিক।[১০] মাচার উপরে যখন হাপরের শ্রমিকেরা গলদঘর্ম, নিচে তখন উত্তপ্ত প্রাচীরের ছিদ্রপথে আগুন ও পাথরের অবস্থা পর্যবেক্ষণে রত অভিজ্ঞ লৌহ কারিগরেরা প্রয়োজন মতো উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁরা নির্দেশ পাঠাবেন হাপরের শ্রমিকদের। পাথর পুড়ে কখন লোহা গলে তরল হবে, ঐ তরল লোহা কখন ফুটোর মধ্য দিয়ে টেনে প্রথম প্রকোষ্ঠে আনতে হবে তা একমাত্র তাঁদেরই জানা। কাঁচা লোহার এই কারিগরদের বলা হতো 'পাশা'।[১১] বিচিত্র ব্যাপার, 'পাশা'দের সবাই ছিলেন মুসলমান।[১২] কোটশালের কাজ শেষ। এবার কাঁচা লোহা পাকা হবার জন্যে যাবে ভুকিশালে।[১৩] ইংরেজ কালেক্টরেরা ভুকিশালকে ফারাবশালা বলে উল্লেখ করেছেন। কাঁচা লোহার পিণ্ডি খণ্ড খণ্ড কেটে চুল্লীতে

গলিয়ে পরিশোধিত করে তৈরী হতো পাকা লোহা।১৪ চাহিদা অনুযায়ী লম্বা ও গোলপিণ্ড দুই আকারেই করা হতো। পাকা লোহার কারিগরেরা পরিচিত ছিলেন 'লেহড়' বলে।১৫ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'লেহড়'রা সবাই ছিলেন হিন্দু।১৬

সাধারণত একশো পঁচিশ ত্রিশ মন আকরিক লোহা গলিয়ে পাওয়া যেত পঁচিশ ত্রিশ মন কাঁচা লোহা।১৭ আর ঐ পরিমান কাঁচা লোহা থেকে নিষ্কাশিত হতো উনিশ কি কুড়ি মন পাকা ধাতু।১৮ কামারশালে পাকা লোহা দিয়ে তৈরী হতো কৃষি ও ঘর গৃহস্থালীর বিবিধ সরঞ্জাম। আভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েও পাকা লোহার কিছু অংশ বাইরে চালান যেতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত লোহার উৎপাদন ও ব্যবসা বেশ জম-জমাট ছিল মনে হয়। ১৭৬৩ সালে বীরভূমের লোহাখনি অঞ্চলের যা সে বছরই 'লোহা মহল' নামে পৃথক একটি মহালে পরিণত হয়—ভূমিরাজস্ব ছিল সিক্কা টাকা ৮৮৫০।/১৫ গণ্ডা।১৯ লোহা মহলের ইজারাদার ছাড়াও উৎপাদনের প্রায় সর্বস্তরে বীরভূমের পাঠান রাজারা অল্প বিস্তর শুল্ক ধার্য করতেন। কিন্তু যতদিন জেলার রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক কাঠামো স্থিতিশীল ছিল ততদিন জমিদার ইজারাদার ব্যেপারীদের বোঝা সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে দুর্বহ হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু সংকট ঘনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে। রাজা আসাদ-উজ্-জামান খাঁ তখন ইংরেজদের কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত। তাঁর 'স্বাধীনতা' বিলীন এক অবমাননাকর চুক্তিতে আবদ্ধ তিনি ইংরেজ ও নবাবের সংগে। তাঁর বিশাল পাইক বাহিনী বিলুপ্ত ; শাসন শৃঙ্খলার কাঠামো নড়বড়ে, শিথিল ; আর্থনীতিক সংকটের লক্ষণগুলোও তীক্ষ্ণরেখায় প্রকট। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে শুরু হয় উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া উপজাতির বাৎসরিক আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা। জেলার লৌহ-সমৃদ্ধ অঞ্চল বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এর ফলে। পুজো ঈদের দিন গুলোতে বন্ধ রেখে লোহার উৎপাদনও কারবার চলে সারা বছর—অবশ্য যদি ঘাটতি না পড়ে লোহা পাথর ও কাঠ কয়লার যোগানে।২০ বর্ষার ক'টা মাস বাদ দিয়ে বছর জুড়ে হানাদরদের হামলা চলে—তীব্রতর হয় ফসল কাটার সময়ে। পেছনে পেছনে আসে চরম বিপর্যয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। যার প্রাথমিক এক আঘাতেই জেলার এক চতুর্থাংশ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; অপূরণীয় ক্ষতি হয় অসংখ্য গ্রাম-জনপদের। জেলার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে নলি নল্লারপুর মৌড়েশ্বর অন্যতম। নল্লারপুর পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম ঘাটগাছিয়া।

১৭৬৭ সালের আগে ছিল এক সমৃদ্ধ জনবহুল লৌহ উৎপাদন কেন্দ্র। বছর দু'শতের মধ্যে পাহাড়িয়াদের উপর্যুপরি আর আক্রমণে মনুষ্যের ধ্বংসলীলার ফলে হাটগাছিয়া গ্রামের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।২১ শুধু তাই নয় হাটগাছিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তর-দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে বাইশের পর বাইশ মাইল বিস্তৃত এবদা-লোকালয় আবার অরণ্য গ্রাস করে নেয়। অরণ্যে বাসা বাঁধে হিংস্র জানোয়ার আর দুর্দান্ত সমাজ বিরোধীরা লোহার আড়ংগুলো লুব্ধ; শ্রমিক-কারিগর পালুইদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরা কে কোথায় ছিন্নমূল, পলাতক; বৃত্তিচ্যুত কৃষিক্ষ আদিবাসীরা বাঁচার তাগিদে সংঘবদ্ধ ডাকাতি ও লুণ্ঠনে তৎপর। লোহা মহলের রাজস্ব হ্রাস পেয়ে ৭৬৬ সিক্কা টাকায় দাঁড়ায়।২২

কিন্তু লৌহ কেন্দ্রের কতকগুলো তবু টিম টিম করে জ্বলে কোন কোন অঞ্চলে। স্থানীয় প্রয়োজন ও দেশ-বিদেশে বীরভূমের পাকা লোহা ও লোহা-সামগ্রীর বিস্তৃত সুনাম ও চাহিদা সীমাবদ্ধভাবে হলেও এর উৎপাদনকে টিঁকিয়ে রাখে। টিঁকিয়ে রাখে কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক ও মূলধনের অভাবে এর যথার্থ পুনরুজ্জীবন ঘটেনা অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত।

এরই ভেতর আশা মরীচিকার চকিত চমক নিয়ে আসেন ইন্দ্রনারায়ণ শর্মা।

ইন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জেলার বাইরে তিনি একজন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর আয়ের উৎস কী ভূসম্পত্তির ইজারা না ব্যবসা তা ইতিহাসে অজ্ঞাত। বীরভূমের লৌহ উৎপাদনে তাঁর আগ্রহ দেখে মনে হয় শিল্প বা ব্যবসা-ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত ছিলেন না। তিনি সম্ভবতঃ কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীদের সংগেও তাঁর যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। ১৭৭৪ সাল নাগাদ বীরভূমের লোহানহলের প্রতি ইন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্বয়ং তিনি জেলা পরিভ্রমণে আসেন এবং মল্লারপুর পরগনা ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেন। পূর্বোক্ত হাটগাছিয়া কে বেষ্টন করে বহু মাইল বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল তিনি বেছে নেন, তাঁর শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে। ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর প্রস্তাবিত কর্মোদ্যোগে আদিবাসীদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিলেন। তিনি লেখেন: 'যে চুয়ার ও পর্ব্বতবাসীরা বর্তমানে বালুভরাট জমিগুলো ছেয়ে আছে, এবং যাদের আক্রমণের ফলে রায়তরা দেশত্যাগ করে চলে গেছে, তারা নিজেরাই লৌহ উৎপাদনে সামিল হবে। তারা আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছে..।"২৩ সে বছরই সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দ্রনারায়ণ বর্ধমান কাউন্সিলের মাধ্যমে মাদ্রাজস্থ কোম্পানী বাহাদুরের কাছে

"৮ অথবা ১০ বৎসরের জন্য" বীরভূমের লোহা মহলের ইজারার জন্য দরখাস্তে পেশ করেন। দরখাস্তে তিনি জানান, জঙ্গল পরিষ্কার করে কোটশাল স্থাপনের জন্য তাঁকে প্রথমে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে। প্রথম বছরে তিনি তাই খাজনা বা অন্য কোনও সরকার বাহাদুরকে কিছু দিতে অক্ষম। পরবর্তী তিন বছর তিনি দেবেন বার্ষিক তিন হাজার টাকা করে; ইজারার বাকী বছরগুলো দেবেন বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা হিসেবে। যে মহালের তখন বার্ষিক জমা ৭১১ টাকা মাত্র তার জন্যে ঐ বিরাট পরিমান অর্থের প্রস্তাব! উদ্যোগ সফল হলে সরকার বাহাদুরকে বাজার দরে লোহা সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি জানালেন ইন্দ্রনারায়ণ। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করলেন, প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ শেষ দ্বিতীয় বারের জন্য তাঁর নাম বিবেচিত হলে তিনি বাধিত হবেন; বিশেষ কারণে যদি তা সম্ভব না হয়— বিশেষতঃ সরকার যদি লোহা মহলের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাঁর নির্মিত কোটশাল ও গৃহাদির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলেই কৃতার্থ বোধ করবেন তিনি।২৪

বিন্দুমাত্র ঝুঁকি ঝামেলা মুক্ত এর চেয়ে লোভনীয় প্রস্তাব সরকারের পক্ষে আর কী হতে পারে? লোহা মহলের তখনও আইন সম্মত মালিক বীরভূমের জমিদার আসাদ-উজ্-জামান খাঁ। ইন্দ্রনারায়ন তাঁকে ডিঙিয়ে আবেদন করেছেন কোম্পানীর দরবারে। কোম্পানী বিনা দ্বিধায় দ্রুত সে আবেদন মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এসেছে ইজারা প্রার্থী ইন্দ্রনারায়ণ শর্মার। অত্যুৎসাহের বশে স্বেচ্ছায় যে সব সর্ত তিনি প্রস্তাবাকারে রেখেছেন তার গুরুতর ভবিষ্যৎ তাৎপর্য এবার তার সুস্থির বিবেচনায় ধরা পড়ে। মনে হয় ইজারায় বর্ধিত খাজনার অতি উচ্চাহ্বান তাঁকে বিশেষ ভাবে ভীত নিষ্ক্রিয় করে রাখে। সরকারের অনুমোদন পেয়েও তিনি ইজারা সম্পর্কে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন।২৫ লোহা মহলের পুনরুজ্জীবনের যে ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

এরপর মঞ্চে আবির্ভূত হন কলকাতার এক বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। মেসার্স মট এণ্ড ফারকুহার।২৬ এঁদের কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত. আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ়, পশ্চাতে শক্ত খুটির জোর। প্রথমতঃ ইংরেজ প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয়তঃ অন্যতম অংশীদার মিঃ মট তখনকার সরকারী মহলে একজন কেউকেটা ব্যক্তি। কলকাতার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছাড়াও তাঁর আর একটি বড় পরিচয় গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি। লর্ড ক্লাইভের বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে

১৭৬৬ সালে তিনি সম্বলপুরে গিয়েছিলেন সে দেশের সঙ্গে হীরের ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে—যদিও তার সেবারের চেষ্টা সফল হয়নি। এহেন ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত তাঁর পক্ষে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সরকারী সাহায্য লাভ এমন কি আর দুরূহ ব্যাপার?

১৭৭৭ সালে মেসার্স নট এ্যাণ্ড কারকুহার সরকারের কাছে এক স্মারকলিপিতে তাঁদের লৌহ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দান করেন।২৭ তাঁরা জানান, বীরভূম ও রামগড় জেলায় এমন এক শ্রেণীর আকরিক লৌহের সন্ধান পাওয়া গেছে (যদিও বীরভূমে প্রচুর ধাতুর পরিমান সীমিত) যার আর্থনীতিক ও সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। অত্যন্ত নরম এই লোহা; দৈনন্দিন সাধারণ প্রয়োজনের পক্ষে এর উপযোগিতা হয়তো সীমাবদ্ধ কিন্তু কতকগুলো সামরিক প্রয়োজনে এর সম্ভাব্য কার্যকারিতা অতীব উজ্জ্বল। তাঁরা কামানবাহী লোহার ট্রাক নির্মাণে এর ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা বিশেষ জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন কামান ও গোলাগুলি নির্মাণে এর উপযোগিতার কথা। এসব যুদ্ধাস্ত্র চালাইয়ের জন্য যে ধরণের নরম লোহার প্রয়োজন তার অভাব বীরভূম ও রামগড়ের লোহায় বহুলাংশে মিটতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্পেন এবং ইংলণ্ডের খনিজ লোহাতে এই বিশেষ গুণ অনুপস্থিত। সেজন্য উন্নততরশ্রেণীর কামান ও গোলাগুলি ঢালাইয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার লোহায় নমনীয় গুণ সংযোজনের প্রয়াস বিরামহীন। কিন্তু, নট এ্যাণ্ড কারকুহার স্মারক লিপিতে লেখেন, আজ পর্যন্তও এক্ষেত্রে কোন সাফল্য সেখানে অর্জিত হয়নি। সুতরাং এখানের কাঁচা লোহা জাহাজের ভারসাম্য রক্ষাকারী লৌহপিণ্ডের (Kortledge) আকারে ঢালাই করে ইংলণ্ডে চালান দিতে পারলে দেশপ্রেমিক কর্তব্যপালনের সাথে সাথে কোম্পানীর বাণিজ্যেরও বিস্তার ঘটে বৈকি! তাঁরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরো কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লৌহজাত পণ্য প্রস্তুতের প্রস্তাবও রেখেছিলেন। সে সময় চীন দেশ থেকে এদেশে আমদানী হতো বহু লৌহপাত্র, কড়া, চাটু, ও অন্যান্য তৈজসপত্র; আর অত্যন্ত চড়া দামে সেগুলো বিক্রী হতো বাজারে। ঐসব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজেই এখানে উৎপাদন করে আভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানী করা যায়। তাছাড়া আছে চিরকালের সিলিণ্ডার, চিনিকল, লবন ও সোরার কারখানার বয়লার এবং আরো বহু জিনিষ যা রামগড়-বীরভূমের লোহা দিয়ে তৈরী করা সম্ভব।

কিরিচি বাড়িয়ে লাভ নেই। নট এ্যাণ্ড কারকুহার এবার কাজের কথায়

আসেন। তাঁরা আবেদন করেন, যেসার্স সামার এ্যাণ্ড হিটলী কোম্পানী বীরভূম ও পাকেতে লৌহের খনিজ সম্পদ আহরণে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছেন তাতে কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে "বর্ধমানের ত্রাধিনা রেখার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত মহারাজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকৃত অঞ্চল সমূহের অন্তর্গত যে কোন অংশে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের একচেটে সুযোগ সুবিধা', তাঁদের দান করা হোক। একই সংগে বিনাশুল্কে উৎপাদিত পণ্যবিক্রয়ের বিশেষ সুবিধাও তাঁরা দাবী করলেন। বিনিময়ে, ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত গোলাগুলির গড়মূল্যের চার পঞ্চমাংশ দরে তাঁদের কারখানার চালাই উপযুক্ত লৌহ সামগ্রী তাঁরা সরকারকে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন। তদুপরি দেবেন রামগড়ের প্রস্তাবিত সীসার খনিটির মুনাফার এক-দশমাংশ।

সরকার সাগ্রহে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। ১৮৭৮ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের এক আদেশবলে মিঃ ফারকুহারের হাতে লৌহখনিগুলোর অধিকার অর্পনের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল ;—হায়, আসলে তা কিন্তু পাকেতের লৌহ খনিগুলোর উপর অধিকার ? মিঃ ফারকুহার কাল বিলম্ব না করে চুক্তির সর্তাবলীতে পাকেতের বদলে বীরভূমের লোহামহল সংযুক্ত করতে চাইলেন। কারণ "চালাই কাজের জন্য রামগড় ও বীরভূমের আকরিক ধাতু অনেকাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ : অপরদিকে পাকেতের ধাতু থেকে একপ্রকার ভঙ্গুর, ছোট লৌহ তৈরী হয় যা গোলাগুলির জন্য উত্তম হলেও কামান নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয় মোটেই"। আবেদন গৃহীত হলো। উনিশ বছরের জন্য বীরভূম লোহামহলের ইজারার অনুমতি পেলেন মট এ্যাণ্ড ফারকুহার। রামগড় ও বীরভূমের মধ্যবর্তী স্থানগুলে প্রধান আড়ং হিসেবে প্রথমে ঝরিয়া মনোনীত হলেও পরে তা স্থানান্তরিত হয় বীরভূমের ডেউচায়। উন্নততর লৌহখনি বেষ্টিত ডেউচা তার এই বিশেষ মর্যাদার আসন অক্ষুণ্ণ রাখে পরবর্তী সত্তর বছরেরও বেশী সময়।

সরকারী আদেশপত্র নিয়ে ১৭৭৮ সালে বীরভূমে এলেন মিঃ ফারকুহার। এসেই ধাক্কা খেলেন। আইন অনুযায়ী লোহামহলের জন্য নির্ধারিত খাজনা দিতে হবে বীরভূমের জমিদারকে। জমিদার আগের বছর খাজনা বাবিক ৭৬৬৲ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,২৬২৲ টাকায় নির্দিষ্ট করেছেন।২৮ ফারকুহারের সহায়তায় সরকারী হস্তক্ষেপ অবিলম্বে নেমে এলো। খাজনা পুনর্দ্ধারিত হলো ৭৬৬৲ টাকায়। কামান ও গোলাগুলি চালাই-এর চুক্তি পালনে সাহায্য করার জন্য সরকার থেকে ১৫,০০০৲ টাকা অগ্রিমও দেওয়া হলো তাঁকে।২৯ পরবর্তী দশ

বছর (১৭৭১-৮১) ফারকুহার ডেউচায় তাঁর চালাই কারখানা স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। মনে হয় চুক্তির সর্তস্বরূপ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে লৌহ উৎপাদন ও চালাই-এর লক্ষ্য নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য পূরণ করে চুক্তি রক্ষা করতে তিনি কতদূর সক্ষম হয়েছিলেন তা ইতিহাস অজ্ঞাত। ফারকুহারের সময়ে বীরভূমের পেরেক লোহা কলকাতার বাজারে সহজ প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রী হতো। বিলিতি পেরেক লোহার দর ছিল মন প্রতি দশ থেকে এগারো টাকা; বীরভূমের মাল পাওয়া যেত পাঁচ টাকা মন দরে।৩০ বাজারের নিম্নতম দরের এই পণ্য দেশীয় না ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত তা অনুমান নির্ভর এক বিতর্কের বিষয়। আমাদের বিবেচনায় বীরভূমের লোহা মহলের মালিক ফারকুহারই এর প্রস্তুতকারক।

কিন্তু লোহা মহলের কপালে শনি। লোহার কারবারে নিঃ মনের উৎসাহে আগেই ভাঁটা পড়েছিল; এবারে ফারকুহারের পালা। জেলায় পদার্পণ মাত্র তাঁর বিরোধ বেঁধেছিল বীরভূমরাজের সংগে সরকারী হস্তক্ষেপে ফারকুহারের সুবিধা হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিরুদ্ধ দুই পক্ষে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়নি কখনও। তাছাড়া ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে লৌহ উৎপাদনের অধিকার নিয়ে অব্যাহত তিক্ত দ্বন্দ্ব—যা অনুমানে বাধা নেই, মাঝে মাঝে আদালতের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ফেটে পড়তো নিশ্চয়ই। অষ্টম দশকের গোড়া থেকে ইংরাজ-জমিদার-ইজারাদারের শোষন দুঃশাহসের বিরুদ্ধে সমগ্র বীরভূম অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ১৭৮৬ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর দাবানলের মত তা জেলাময় ছড়িয়ে পড়ে। জমিদার-ইজারাদারদের কাছারীবাড়ী ছাড়াও কোম্পানীর কুঠীবাড়ী, শহর-গঞ্জ তাঁত শিল্প ও লৌহ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলো যুগপৎ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে।৩১ কমবেশী তীব্রভাবে এ অবস্থা চলতে থাকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত। ফারকুহার নিরুদ্যম হয়ে পড়েন। ব্যবসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেন তিনি। ১৭৮৯ সালে বীরভূমের কারবার তুলে দিয়ে কলকাতায় বারুদ কারখানায় চাকরি নিয়ে চলে যান ফারকুহার। ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত লোহা মহলের ইজারা তিনি হাতছাড়া করেননি। পরের বছর বীরভূমরাজের হাতে তাও তুলে দেন।৩২

বীরভূমরাজ তখন নামেই রাজা। পুরনো ঘৃতপাত্রের মতো ভেঙে পড়ছে তাঁর জমিদারী: বকেয়া বিপুল পরিমান সদর খাজনা আদায়ের জন্য তাঁর বিশাল জমিদারী খণ্ড বিখণ্ড করে, বহু মহালে লাটে বিভক্ত করে নিলামে বিক্রী করা

হচ্ছে। ১৭৯৮ সালের জুলাই মাসে এমনি এক নীলামে টা ৩২৬৭৮/৮ গণ্ডা অবায় লোহা মহল ৭০০০ টাকায় কেনে নিলেন বর্ধমানের বৈষ্ণব চরণ হজরা।৩৩ কিন্তু মহাল খণ্ডীকরণের বিরাম নেই, নিলামের ও শেষ নেই। সমগ্র জেলার লৌহখনিগুলোর মালিকানা ও কোটশাল স্থাপনের অধিকার নিয়ে অচিরে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয় বৈষ্ণবচরণের সংগে লৌহখনি সম্বন্ধ বিভিন্ন মহলের নতুন জমিদারদের।৩৪ বিরোধ মানে মামলা। ঝাঁকে ঝাঁকে মামলা। আর লাঠালাঠি মারামারি, অনিবার্যভাবেই। বোঝা যায় লোহার খনিগুলোর মূল্য এখন এতই বেশী যে এগুলোর সামান্য অংশ মাত্রের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও যথেচ্ছ অর্থব্যয় ও রক্তপাতে ভুক্তভোগী মাত্রেই প্রস্তুত। বস্তুত পক্ষে আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক শান্তি আর লোহার বাজারে ফটকাবাজির পটভূমিকায় লোহার উৎপাদন ও কারবারে প্রকাশ পায় আসন্ন ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

এরই ভেতর এসে যায় উনবিংশ শতাব্দী।

সূত্রনির্দেশ

১। Capt W. S. Sherwill : Geographical and Statiscal Report of the District of Beerbhoom (Calcutta, 1855) pp 25, 26, 30.

২। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে আগুরিয়ারা এক ও অভিন্ন জন সমষ্টিভুক্ত নয়। ছিন্ধুয়ার থেকে দূরে এদের বসতি; আকরিক লৌহ উত্তোলন এবং পরিশোধন এদের জীবিকা। আদিবাস প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল; বিহারের ধাঁচী ও পালামৌ; সাঁওতাল বিদ্রোহ-পূর্ব বীরভূমের উত্তরাঞ্চল।

দ্রষ্টব্য : Sabyasachi Bhattacharyya : Iron Smelters and the indigenous iron & steel industry of India from stagnation to Atrophy, appeared in Surajit Sinha ed, Aspects of Indian culture and Society : Essays in felicitation of Professor Nirmal Kr. Bose (Calcutta. 1972) p. 136

বর্ত্তমান বীরভূমের 'আগুরি' নামধেয় কৃষিনির্ভর এক বর্ণগোষ্ঠির সংগে আগুরিয়া উপজাতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়।

৩। Francs, Lowth Collector of Birbhum to G. Taylor Commissoner of Burdwan Division dated, 15.10. 1815

৪। Ibid.

৫। Journal of Asiatic Society of Bengal (JASB) vol XII pt. II (July—September, 1843) p.542

৬। Collector of Birbhum to Commissioner (commr) of Burdwan Division. 15.10.1845

৭। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত বীরভূম বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৪-০৬।

৮। Memorandum on the Iron works of Beerbhoom, by W Jackson—appeared in JASB, Part II, 1845 p, 755

৯। বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ১০৮

১০। ঐ

১১। ঐ

১২। "T. Oldham : Report of the Examination of the Districts in Damoodarh valley and Beerbhoom producing Iron ore" extracpt reproduced in A Mitra ed ; Distriet Hand Book Birbhoom, 1951. p. ixxix

১৩। বীরভূম বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০৫

১৪। Collector of Birbhum to Comm. of Burdwan 15.10.1895

১৫। বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০৬

১৬। A Mitra ; ed, District Hand Book : Birbhum 1951, p Ixxiv

১৭। Collr. of Birbhum to Commr. of Burdwan 15.10.1845

১৮। Ibid.

১৯। Consultation, Board of Revenue dated 15.5. 1788.

২০। A. Mitra ed. District Hand Book Birbhum 1951 p. lxxiv

২১। Crntributions towards a History of the Development of the Mineral Resources of India by G. T Heartly appeard in JASB, vol XII part II p 543

২২। Ibid. p. 556

২৩। Ibid. p. 544

২৪। Ibid.

২৫। Ibid

২৬। Ibid p. 545.

২৭। Ibid. pp. 547-55.

২৮। Ibid. pp. 556-57

২৯। Ibid p. 559

৩০। Ibid p. 563

৩১। সুধীর করণ সম্পাদিত সংকলন "বনিকায়' (৩০শে শ্রাবণ ১৩৭৯ প্রকাশিত বর্তমানে লেখক কর্তৃক লিখিত "সেকালের সিউড়ী : এক পর্ব দ্রষ্টব্য।

৩২। JASB vol XII part II p 562

৩৩। Coller of Birbhum to Board of Revenue dated .7.7.1798

৩৪। Coller of Beerbhoom to Commr. of Burdwan Div 15.10.1845

ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের একটি অধ্যায় ও শ্রীমতী ভিক্ষায়জী রুস্তম কামা

আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারে অন্ততঃ একটি মাত্র কারণে, তা হল এই, যে নিয়তির নির্বন্ধে পরবর্তী কালের ইতিহাসের বহু শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্নে চিহ্নিত নানব মানবী এই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। দু' একজনের নাম উল্লেখ করলেই ঘটনাটি স্পষ্ট হবে, প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারপর যথাক্রমে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পণ্ডিত মদন মোহন মালবা, মোক্ষগুন্ম বিশ্বেশ্বরায়, আর সর্বশেষে উল্লেখ করলেও অনন্যসাধারণত্বে এঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মাদাম ভিক্ষায়জী রুস্তম কামা। সকলের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে বসা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়, তা ছাড়া শতবার্ষিকী উৎসব করে এবং আরও নানা ভাবে এঁদের সকলের সম্বন্ধেই কিছু না কিছু জন সমাজে প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু এই মহীয়সী মহিলাটি, যিনি আজীবন বিদেশে বাস করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সহ্য করে দুরূহ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে ভারতবর্ষে আসবার অনুমতি পেলেন, এবং একাকী রোগশয্যায় বন্ধু বান্ধবহীন বিস্মৃতির আবরণে আবৃত হয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় পেলেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা এত কম জানি যে শুনিলে আশ্চর্য হতে হয়। সরকারী পক্ষ থেকে তাঁর শতবার্ষিকী স্মৃতিতে ডাক টিকিট ছাপা হয়েছে, সত্য কথা, কিন্তু তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখও অনুসন্ধান করে ঠিকমত ব্যবহার করা হয় নি। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে।

সম্প্রতি অবশ্য কিছু লেখক ও গবেষক শ্রীমতী কামার কার্যকলাপের প্রতি কিছু আলোকপাত করেছেন। প্রধানতঃ তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মাদাম ভিক্ষায়জী কামা সম্বন্ধে কিছু বলবার প্রচেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলে রাখা ভালো মাদাম কামা কে ছিলেন, কী কী

তাঁর কার্য কলাপ এবং তাঁর জীবনেতিহাসের যতটুকু সংগ্রহ করা যায়, তাই এই রচনার উপজীব্য। তিনি পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কতখানি জড়িত হয়ে ছিলেন একমাত্র তা নির্ণয় করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই যে আমার ধারণায় মাদাম কামা এবং তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন সমস্ত ব্যক্তিই সমাজতন্ত্রে আস্থা স্থাপন করেছিলেন বটে, তবু জাতীয়তাবাদকেই তাঁরা প্রধানতঃ অনুসরণ করেছিলেন। এ দুই মতবাদ হয়তো পরস্পর বিরোধী বলে তখন মনে হয় নি, কিন্তু সাংসিবাদের উগ্র জাতীয়তাবোধ কতখানি ভয়াবহ হতে পারে তা পরবর্তী কালে সেপ ভালো করেই প্রমাণিত হয়ে যাবার পর রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে নূতন উপলব্ধির উদ্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে স্টুটগার্টের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি বেনিটো মুসোলিনী ইতালীর জাতীয়তাবাদী দল ফ্যাসিষ্ট পার্টি তৈরি করেন। এ ফ্যাসিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কী করেছে, তা আজ আর আমাদের অজ্ঞাত নয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই শহরের এক পার্সী পরিবারে শ্রীমতী ভিকাইজীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল সোরাবজি ফ্রামজী প্যাটেল এবং মায়ের নাম ছিল জায়জী সোরাবজি প্যাটেল। প্যাটেল দম্পতির অন্য কোনো সন্তান সন্ততি ছিল কিনা জানা যায় না। সোরাবজি ছিলেন ব্যবসায়ী। তখন অবশ্য বোম্বাই শহরে পার্সী সম্প্রদায়ের সকলেই কোন না কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন।

বোম্বাই এর পার্সী সম্প্রদায় সম্বন্ধে এক্ষেত্রে দুচারটি কথা বোধ হয় বলা আবশ্যক। পার্সীরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে বোম্বাই শহরের নাগরিক বৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। এই পার্সীদের মধ্যে কর্মক্ষমতায় আদর্শবাদে এবং ব্যক্তিত্বে নেতৃস্থানীয় ছিলেন দাদাভাই নওরোজী এবং তাঁর ঘনিষ্ট সুহৃৎ কামা পরিবার। প্রখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিৎ খুরশেদজী কামা দাদাভাই নওরোজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এঁরই পুত্র রুস্তম কে আর কামা শ্রীমতী কামার স্বামী।

দাদাভাই নওরোজীর উৎসাহেই পার্সী সম্প্রদায়ের বহুদিন ব্যাপী সংকীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মজীবনে এক নবীন জীবন স্পন্দনের সূচনা হয়। প্রধানতঃ শিক্ষার বিস্তার বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এঁদের প্রধান কৃতিত্ব। পূর্বে পার্সিদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা পর্দানশীন ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের মত

তাঁদের সম্প্রদায়েও স্ত্রীশিক্ষার রেওয়াজ ছিল না। এই মূর্খতা এবং অজ্ঞতা যে ব্যক্তির পক্ষে, সম্প্রদায়ের পক্ষে, তথা জাতির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর, সে কথা দাদাভাই এবং তাঁর সহযোগিগণ ছাত্রজীবন থেকেই প্রচার করতে থাকেন। তাঁরা উৎসাহী হয়ে ১৮৪৯ সালে Students literary and Scientific Society স্থাপন করেন Principal Patton এর সহায়তায়।১ এই সোসাইটির সভায় একবার শ্রীযাহুরামজী গাঙ্গী নামে এক ভদ্রলোক স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী এবং উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন।২ এর প্রভাবে এবং ছাত্রদের চেষ্টায় উল্লিখিত সোসাইটির সহায়তায়• বোম্বাই এর বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ক্লাস শুরু হয়। এই ক্লাসগুলিতে মেয়েরা যোগ দিতেন এবং শিক্ষকতা করতেন ছাত্ররা। কালক্রমে এই ক্লাসগুলিরই অধিকাংশ পার্শী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই পার্শী বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান বিদ্যালয় আলেকজান্দ্রা নেটিভ গার্লস ইংলিশ ইন্‌স্টিটিউসন স্থাপিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে।৩ প্রথমে ২৯ জন আবেদন কারিনীর মধ্যে ১৩ জনকে ভর্তি করা হয়। পরে ঐ সংখ্যা বেড়ে ২০ জন হয়। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইংরাজী অনুসারী হবে বলে ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ধর্ম বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও ভাষা এবং জীবন যাত্রার ধারা বিষয়ে পার্শী সম্প্রদায় গুজরাটি ভাষা ও সংস্কৃতিরই অনুসরণ করে এসেছেন। এই সময় থেকেই ব্যাপক ইংরেজী চর্চা এবং ভাবধারা অনুশীলনের ফলে পরে পার্শীরা বেশ কিছুটা ইংরাজীয়ানা অভ্যাস করতে থাকেন। আলেকজান্দ্রা বিদ্যালয়টি কালক্রমে পার্শীদের দ্বারা পরিচালিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এখানে নানা ভাষা শেখার ব্যবস্থা ছিল এবং এখান থেকে পরবর্তী কালে বহু স্বনামধন্যা পার্শী মহিলা শিক্ষালাভ করেন।

শ্রীমতী ভিক্কায়জী কামা এই আলেকজান্দ্রা নেটিভ গার্লস ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন তিনি ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে শ্রীমতী ভিক্কায়জীর বিদ্যালয়গত শিক্ষা কতদূর পর্যন্ত লাভ হয়েছিল তা জানা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল। ইতিপূর্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সাধারণ জনমানসে যতই প্রভাব বিস্তার করে থাকুক না কেন, নাগরিক ইংরেজী শিক্ষিত জনমানসে তা কোনো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, বরং বিক্ষুব্ধকারই

উদ্রেক করেছিল কিন্তু এই শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যেও এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর ৭৯-৮৯ দশকে, যা তখনও ব্যাপক আকারে ফেটে পড়েনি। এই অসন্তোষের আভাস ব্রিটিশ সরকারও পেয়েছিলেন, যে জন্য অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে Indian National Congress এর পতাকা তলে এই জাতীয়তাবাদীদের সমবেত করার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়েছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হ'ল W.C. Bonerjeeর সভাপতিত্বে।

এই জাতীয় উন্মীলনের সময়ে শ্রীমতী কামার কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে উত্তরণ, কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর কোন ভূমিকাই ছিল না। উত্তরকালে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব কর্মক্ষমতা এবং উপলব্ধির গভীরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রথম যৌবনে তিনি সম্ভবতঃ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু এই অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ নয়। একথা ঠিক, পার্শী সম্প্রদায় সে সময় ছিল রাজভক্তিতে অগ্রগণ্য। এই সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় আন্দোলনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া তখনকার দিনের এক তরুণীর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

১৮৮৫ সালের ৩রা আগস্ট শ্রীমতী ভিকাজীর বিবাহ হয় শ্রীরুস্তম কে আর কামার সঙ্গে। পূর্বেই জানানো হয়েছে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ শ্রীখুরশেদজী আর কামার পুত্র ছিলেন শ্রীরুস্তম কামা। এসময় ভিকাজীর বয়স ২৩ বৎসর। শ্রীযুক্ত রুস্তম কামা কর্মজীবনে ছিলেন সলিসিটর। পরবর্তীকালে তিনি ফিরোজশা মেটার সহকারী রূপে 'বম্বে ক্রনিকল' পত্রিকায় যোগ দেন।

কামা পরিবারের সঙ্গে দাদাভাই নওরোজীর সম্পর্ক ছিল গভীর। এঁদের বিশাল ব্যবসায় ছিল ভারতবর্ষ, সুদূর প্রাচ্য এবং ইংলণ্ড ও ইউরোপে বিস্তৃত। ব্যবসায়গত ক্ষেত্রেও দাদাভাই এর সঙ্গে এই পরিবারের যোগ ছিল। তবে প্রধানতঃ খুরশেদজী কামার সঙ্গেই দাদাভাই নওরোজীর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। খুরশেদজী নিজে ছিলেন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ এবং কর্মজীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দাদাভাই এর একনিষ্ঠ সহচর এবং দেশপ্রেমিক। এঁদের দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা কামনার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় নি। এঁরা ইংরেজ শাসনকে ভারতের পক্ষে অনেকটা কল্যাণজনক মনে করতেন, তবে তাঁরা চেয়ে ছিলেন স্বায়ত্ত শাসন। ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর রাজনৈতিক অধীনতায় তাঁদের আপত্তি ছিলনা, তবে তাঁরা মনে করতেন আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ভার

ভারতীয়দের হাতে দিলে তবেই সেটা সুবিচার হবে। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের অধিকাংশ দাদাভাই এরএই ধারণার বিরোধিতা করেন।

কাদা পরিবারের মহিলারা ছিলেন সুশিক্ষিতা এবং আলোক প্রাপ্তা। এঁদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে এবং শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করে পরবর্তী কালে যশস্বিনী হন।৭ শ্রীমতী ভিকাজীও যোগ্যতার দিক থেকে এই আলোকপ্রাপ্ত, আধুনিক শিক্ষিত পরিবারের আদর্শবধূ ছিলেন।

কেউ কেউ বলেন রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে এই স্বামীর সঙ্গে শ্রীমতী কামার মতবিরোধের সূত্রপাত। উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয় বোম্বাই এর বিখ্যাত প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব কালে নাকি শ্রীমতী কামা ভগিনী নিবেদিতার মতো অকাতরভাবে প্লেগ রোগাক্রান্তদের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হন স্বামীর মত উপেক্ষা করে।৮ এই মন্তব্যটিতে কিছু কল্পনার আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে এক ভয়ানক প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। এই সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই মহামারীর ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি বোম্বাই শহরে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যা ৪।৫ শত থেকে আরম্ভ করে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে বেড়ে গিয়ে প্রায় ৩০০০ এর উপর দাঁড়ায়। এ ঘটনায় সরকার পক্ষেও বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হয় এবং সরকার পক্ষ থেকে নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু এই প্লেগ রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য সরকার পক্ষ থেকে যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন অমানুষিক বর্বরতার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল যার ফলে স্বভাবতঃ জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিল। কিয়ৎকাল পরে এই বিক্ষুব্ধি প্রচণ্ড আন্দোলনে ফেটে পড়ে। যাই হোক নাগরিক সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ সরকারকে নানা ভাবে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। এই নাগরিকদের মধ্যে পার্শী সমাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সাহায্যে একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয় এবং সেই হাসপাতালের সুব্যবস্থা সরকারের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।৯ সম্ভবতঃ শ্রীমতী ভিকাজীও এই হাসপাতাল স্থাপন ও প্লেগরোগাক্রান্ত রোগীদের সুব্যবস্থার ব্যাপারে অগ্রণীদের মধ্যে ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর পারিবারিক জীবনে স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল বলে যে কথা শোনা যায়, তাতে মনে হয় দৃঢ়চিত্ততা ও আদর্শনিষ্ঠা শ্রীমতী কামার চরিত্রের একটি বিশেষ সম্পদ ছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই, বোম্বাই থাকা কালে শ্রীমতী কামা যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন, তার কোন

উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এ ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অবশ্য এমন হতে পারে যে, সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া মাদার কামাকে প্রত্যক্ষভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁর পারিবারিক জীবনের অশান্তি এবং তজ্জনিত মানসিক অস্থিরতা তাঁকে সাময়িকভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ করে রেখেছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রীমতী ভিকাজীর পারিবারিক জীবনে এক বিপর্যয়ের সূচনা হয়। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পারিবারিক পটভূমিকা কি, সে সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যায় না। অবশ্য আইন সম্মত বিবাহবিচ্ছেদ তাঁদের হয় নি, তবে তাঁদের যৌথ জীবনযাত্রা চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়। নিঃসন্তান এই দম্পতি পরস্পর থেকে বিচ্যুত হয়ে জীবনের আলাদা রুক্ষপথে সরে গেলেন।

ভগ্ন স্বাস্থ্য ও বিপর্যস্ত মন নিয়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমতী কামা চলে যান লণ্ডনে চিকিৎসার জন্য। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ।১০

প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গৃহাবদ্ধতার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার পরই তিনি যেন বৃহত্তর জগতের দিকে পরিপূর্ণভাবে চেয়ে দেখবার সুযোগ পেলেন।

লণ্ডনে শ্রীমতী কামার সঙ্গে পরিচয় হল শ্যামাজী রুক্ষবর্মার। হয়তো এ পরিচয় না ঘটলে শ্রীমতী কামার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতো না। লণ্ডনে তখন দাদাভাই নওরোজী প্রতিষ্ঠিত London India Societyর সঙ্গে শ্রীমতী কামার যোগাযোগ ছিল।১১ লণ্ডনে ভারতীয়দের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সাধারণ ভাবে তাঁর যোগসূত্র ছিল, অবশ্য সে কার্যকলাপ গুরুতর রাজদ্রোহ সূচক মোটেই ছিল না।

শ্যামাজী রুক্ষবর্মা ছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলের লোক। ছাত্রজীবনে তাঁর অসাধারণ মেধা ও সংস্কৃত ভাষার পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত মানিয়ের উইলিয়মস তাঁকে অক্সফোর্ডে নিয়ে যেতে চান। ঘটনাচক্রে তখন তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে কিছুদিন পরে তিনি অক্সফোর্ডে গিয়ে মানিয়ের উইলিয়মসের সহকারী সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন এবং বরোদা ও জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ানের কাজ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

তাঁর এই ভারতে অবস্থান কালেই জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়, এবং তার পরই নানা ভাবে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ইংরেজ বিদ্বেষ জনিত সন্ত্রাসমূলক কার্যের পরিচয় ছোটখাটো আকারে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাকে এ সকল ব্যাপারে তখন অগ্রণীরূপে দেখা যায় না। নানাবিধ উৎপীড়ন ও মানসিক অশান্তির মধ্যে দেশীয় রাজ্যে কাজ করার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল। এই সময় সেখানে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির সম্বন্ধে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাও প্রত্যক্ষ ভাবে তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এই সময়েই তিনি 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' (Indian Sociologist) পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। পত্রিকার শিরোনাম দেওয়া হয়, "স্বাধীনতা এবং রাজনীতি সমাজ ও ধর্ম সংস্কার প্রচারের জন্য।" শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার ধারণা অনুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনের নীতি ছিল

"Resistance to agression is not simply justifiable but imperative. Non-resistance hurts both altruism and egoism"

এই পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে দাদাভাই নওরোজী প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভায় উল্লিখিত পত্রিকার প্রতি প্রশংসাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার হাইগেটস্থিত গৃহে এক সভা হয়। এই সভায় "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটী" স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল।

১। ভারতের জন্য স্বায়ত্ত শাসন অর্জন করা।

২। যুক্ত রাজ্যে (U.K) এই উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার সুরু করা।

৩। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতির বাণী প্রচার করা এবং এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার সঞ্চার করা।

শ্রীমতী কামা প্রথম থেকেই এই হোমরুল সোসাইটির উৎসাহী সভ্যা হন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' এরও নিয়মিত লেখিকা হন। এখন পর্যন্ত

শ্রীমতী কামার রাজনৈতিক মতামত ও কার্যকলাপ ছিল নরমপন্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৯০৫ সালের ১০ই মে সর্বপ্রথম লণ্ডনে "প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে"র স্মৃতি বার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয় শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার গৃহে এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কামা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

১৯০৫ সালেই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও সর্দার সিং রাণার সহযোগিতায় কয়েকটি বৃত্তি ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষিত বৃত্তিগুলি শিবাজী, রাণা প্রতাপসিংহ এবং অন্য আর একজন মুসলমান শাসকের নামে দেওয়া হবে, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯০৬ সালে 'শিবাজী' বৃত্তি নিয়ে বিনায়ক দামোদর সাভারকর লণ্ডনে আসেন এবং ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য 'গ্রেস ইন' (Grey's Inn) এ ভর্তি হন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা তাঁকে ৬৫, ক্রমওয়েল এভিনিউ, হাইগেট নর্থ এ স্থাপিত 'ইণ্ডিয়া হাউসের' অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সাভারকর অবিলম্বে ঐ বাড়িতে তাঁর নাসিক অভিনব ভারত সংঘের শাখা স্থাপন করেন এবং বৈপ্লবিক কাজের সম্প্রসারণে ব্রতী হন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত জাতীয়তাবাদী তরুণেরা ইণ্ডিয়া হাউসে সম্মিলিত হতেন। এই সময় শ্রীমতী কামার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়: তাঁদের সঙ্গে মাদাম কামা বিভিন্ন সংগঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। এখানেই 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র স্থাপনা হয়। শ্রীমতী কামা সোসাইটির পরামর্শদাত্রী নিযুক্ত হন।

ইতিমধ্যে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল এবং এই প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশিত বিপ্লববাদের স্পষ্ট প্রকাশ ক্রমশঃ শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার প্রকৃত মতামত সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করে তুলছিল। ফলে তাঁর লণ্ডনবাস ক্রমশঃ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল সেই জন্য তিনি লণ্ডনবাস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ সালে সপরিবারে প্যারিসে এসে বসবাস করতে থাকেন।

কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে বসবাস শুরু করেন এই উদ্দেশ্যে যে এখানে তিনি তাঁর কাজকর্মের দ্বারা পরিবর্তনের পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন।[১২] তিনি নরমপন্থীদের তীব্র আক্রমণ করলেন কারণ তাঁরা খোসামোদ করতেন ব্রিটিশ সরকারের ও নির্ভর করতেন ইংরেজ জাতির চেতনা ও ন্যায় পরায়ণতার উপরে। কৃষ্ণবর্মা তাঁর পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি স্পষ্টতঃ সহানুভূতিপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার প্যারিসে বসবাস করতে আসার পূর্বেই সম্ভবতঃ মাদাম কামা প্যারিসে আসেন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন। সর্দার সিং রাণার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁর পরিবারের বাসস্থানের কাছাকাছিই ক্যু লাকায়েৎ এ তিনি বাস করতে থাকেন। এই সময় Shroff & Co এর Kotwal এবং Godrej টাটা পরিবার ইত্যাদি বহু সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল এবং এঁদের সকলের সহায়তা ও সহানুভূতিতে তাঁর কার্যকলাপের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। প্যারিসে এই ভাবে এক বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্যারিসে থাকা কালে প্রবাসস্থিত ভারতীয়গণ ছাড়াও ভারত থেকে সদ্য বিদেশাগত ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা এই সময় শ্রীমতী কামা ও অন্যান্যদের কাছে প্রায়ই যেতেন। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীমতী কামা "দেশের কাজে সর্বস্ব পণ করেছিলেন, আর উনি প্যারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর একজন সংস্থাপয়িত্রী কয়েকমাস যাবৎ এঁর সঙ্গে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এক টেবিলে বসে খাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।১৩ ভারত প্রসঙ্গে বিশেষতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলাপ করতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা যেতেন। দুনিয়ার নানা দেশে ভারতীয় রাজনীতির অবৈধতা দেখিয়ে পরাধীন ভারত বাসীর প্রতি অন্য দেশবাসীর সহানুভূতি উদ্রেক করাতেই ছিল এঁর প্রধান কার্য।"

এ ছাড়া বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাপুরজী সকলাত ওয়ালা, বিপিনচন্দ্র পাল এঁরাও শ্রীমতী কামার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও শ্রীমতী কামার লণ্ডনবাস পরিত্যাগের পর সাভারকারই লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া সোসাইটীর' প্রধান নেতা রূপে পরিগণিত হন। তখন শ্রীসাভারকর বহু তরুণকে তাঁদের ক্ষমতা ও আদর্শবাদ পরীক্ষা করে এই সোসাইটির সভ্যরূপে গ্রহণ করতে থাকেন। এভাবে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত লণ্ডনে শ্যামাজী সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' সাভারকরের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী কামা ও প্যারিস বাসিনী অন্য কয়েকজন ভারতীয় মহিলার নির্দ্বান্তিশয্যে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' এ একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়।১৪ এতে বলা হয় যে একটি অধ্যাপনা বৃত্তির জন্য ১০০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হবে। এই অধ্যাপনা বৃত্তি অবশ্যই ভারতীয় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এই সংখ্যাতেই শ্রীমতী কামার লিখিত একটি পত্র প্রকাশিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের গ্রেপ্তারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে।

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকের সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে। এবারকার সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অন্যান্য বারের থেকেও অনেক বেশি। কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক শক্তি পরীক্ষার জন্য ইউরোপের শক্তিবর্গ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে, তুর্কীস্থানে এবং অন্যান্য উপনিবেশে স্বাধীনতার জন্য, অন্ততঃ পক্ষে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠছিল। এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদীদের সামনে দুটি প্রশ্ন প্রধান তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, (ক) উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কী আচরণ করা দরকার তা স্থির করা এবং খ) ঘনায়মান বিশ্ব যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব কী হবে তা স্থির করা।১৫

এই কংগ্রেসের পূর্ববর্তী Paris Socialist Congress ১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাতে রণমুখিতা (militarism) এবং উপনিবেশ প্রসার চিন্তা (colonialism)র বিরোধিতা করা হয় এবং ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে উক্ত দুইটি মনোভাবের উল্লেখ করা হয়। প্রথমতঃ যে কোনো ক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের জন্য অর্থ মঞ্জুরীর বিরোধিতা করা; দ্বিতীয়তঃ যুব সাধারণকে যুদ্ধবিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করা, তৃতীয়তঃ কোনো রকম আন্তর্জাতিক সংকট উপস্থিত হবার সূচনা হলেই যুগপৎ প্রতিটী দেশে প্রতিবাদের ঝড় তুলে দেওয়া।১৬

এই প্রস্তাবগুলি থেকে মনে হয় সমাজতন্ত্রী শিবিরে ধনতন্ত্রজাত জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রজ আন্তর্জাতিকতাবাদের উপলব্ধির বৈষম্য ঘটেছিল। ১৯০৭ সালের স্টুটগার্টের কংগ্রেসের চেহারাতে তা স্পষ্ট ধরা পড়ল।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী এবং জাতীয়তাবাদী মহলে এই ধরণের বৈষম্য তখনও দেখা যায় নি। কারণ উপনিবেশ হিসেবে ভারতের অবস্থা ছিল ইউরোপের দেশগুলির অবস্থা থেকে ভিন্ন। পূর্বে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতেন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রীরাই। এবারে ভারতের নবগঠিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সম্প্রদায় অনুভব করলেন তাঁদের নিজস্ব মতামত স্পষ্টতঃ জানানোর প্রয়োজনীয়তা। সেইজন্য তাঁরা চাইলেন এমন কাউকে কংগ্রেসে পাঠাতে যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। এ উপলক্ষে প্যারিসে গুপ্ত গোপন সভা-সমিতি হয়। সভারকার, সর্দার সিং রাণা প্রমুখ সকলেই মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে সর্দার সিং রাণা, তাঁর পত্নী এবং শ্রীমতী কামা প্রতিনিধি হিসাবে

স্টুটগার্টে যাবেন এবং তাঁদের সহকারী থাকবেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। স্টুটগার্টে পৌঁছে তাঁরা প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হতে বাধাপ্রাপ্ত হন। ব্যারন্থে ম্যাকডোনাল্ড এই বাধা প্রদানে প্রধান সাহায্য করেন। পরে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী নেতাদের চেষ্টায় তাঁরা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা প্রাপ্ত হন।১৮

স্টুটগার্ট কংগ্রেসে ডাচ প্রতিনিধি Van Kol এই উপনিবেশ বিরোধিতা সূচক প্রস্তাব কে 'নেতিবাচক' বলে ঘোষণা করেন এবং একটী 'সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতি' গ্রহণ করার কথা বলেন। কারণ হিসাবে তিনি দেখান যে উপনিবেশ সাম্রাজ্য বিস্তার ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার ফলশ্রুতি তবে কিনা উপনিবেশগুলির জনসাধারণের উন্নতিবিধান সম্পর্কে নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে উপনিবেশের সম্পদকে সারা পৃথিবীর জনগণের উপকারার্থে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। বলা বাহুল্য। এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেন অধিকাংশ মার্কসবাদী নেতা, এঁদের মধ্যে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ও রোজা লুক্সেমবুর্গ অগ্রগণ্য।১৯

এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বক্তা হিসেবে মাদাম কামার নাম ঘোষণা করা হয়। বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করে মাদাম কামা ভারতের এক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকাই অবশ্য ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা নয়।২০ তবু এই পতাকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব। অবশ্য এ পতাকা পরিকল্পনার সমস্তটাই মাদাম কামার একার কৃতিত্ব নয়। সম্মেলনে যোগ দেবার আগে এ সম্বন্ধে প্যারিসে প্রভূত আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত অনুযায়ী এর পরিকল্পনা করা হয়। পতাকাটি ত্রিবর্ণ; লাল, গেরুয়া ও নীল এই তিনটি রঙের উপরাংশে ছিল আটটি আধখোলা সাদা পদ্ম, মাঝখানে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা বন্দেমাতরম্ এবং তলায় একপাশে সূর্য অন্য পাশে তারকা শোভিত অর্ধচন্দ্র।২১

এই পতাকার নমুনা এবং এই পতাকা স্টুটগার্ট কংগ্রেসে উত্তোলন করা, সমস্তটাই আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের পটভূমিকায় ভারতীয় প্রতিনিধিরা বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন। এই পতাকা উত্তোলন করে শ্রীমতী কামা এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তার অংশ বিশেষ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।২২

That the continuance of British Rule in India is positively disastrous and extremely injurious to the best interests of India and lovers of freedom of all over the world ought to co-operate in freeing from Slavery the fifth of the whole human race, inhabiting that oppressed country, since the perfect social state demands that no people should be subject to any despotic or tyrannical form of government."

মজার কথা এই যে যদিও স্থানটি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন, তথাপি সাম্রাজ্য বিস্তার পন্থী কতিপয় ব্যক্তি এই সম্মেলনে উপনিবেশ বিস্তার বিরোধিতার এই স্পষ্ট বক্তব্যটিতে গ্রহণ করতে পারলেন না। বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় প্রতিনিধিরাও ব্রিটিশ অধিকৃত দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিশ্চয় স্বীকৃত হয়েছিলেন, ফলে মত বৈষম্যের চেহারাটা বিসদৃশভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রকৃত পক্ষে একমাত্র হাইওম্যান ছাড়া আর সমস্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধিই এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। এদিকে সম্মেলনে উত্থাপিত Van Kol এর প্রস্তাব নিয়ে আগেই যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে অন্যান্য অনেকেই এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে তুমুল তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে সভাপতি ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবটীকে ভোট দেওয়া সম্ভবপর নয় কারণ এই প্রস্তাবকে আগে থেকেই নথিভুক্ত করা হয় নি। তবে প্রস্তাবটীর বক্তব্যের স্বপক্ষে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবের মধ্যে নিশ্চয় কিছু বলা হবে। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব ছিল চারটী।২৩ তন্মধ্যে ফ্রান্সের নেতা জাঁ জোরেস (Jean Jaures) এবং ভেইয়াঁ (Vaillant) যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ, প্রয়োজন হলে ধর্মঘট ইত্যাদি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জার্মানীর নেতা বেবেল (Bebel) ধনতন্ত্র ও যুদ্ধের পরস্পর সম্বন্ধতা বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান করেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐকামত ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে একদল উপনিবেশ বিস্তারকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এরূপ মত প্রকাশ করেন। এই স্টুটগার্ট কংগ্রেসের আলোচনা বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত হয়েছিল ; তন্মধ্যে রাজনৈতিক প্রস্তাব আলোচনার বিষয়টীই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে Barbara Tuchman তাঁর Proud Tower গ্রন্থে একটী বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, সেটি কিয়দংশ উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।২৪

P, 5600

"The duty of the working class in the face of rising militarism and threat of War placed on the agenda by the French, unleashed five days of debate. In an open tirade, Hervo again proposed mass disobedience to mobilization, in effect insurrection. Since this could be transformed into revolution, it was supported by the German radicals led by Rosa Luxembourg and Karl liebnecht, but the official weight of the party. From old Marxists like Bebel and Kantsky to new nationalists at the Noske variety shifted solidly to the right.

যদিও বেবেল এর অবিসংবাদী নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে যুদ্ধবিরোধী সাধারণ ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় অন্যান্য সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন, তবু রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং ভলদিমির ইলিচ লেনিন উভয়ে যুক্ত ভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে এই কংগ্রেস এ যুদ্ধবাদ বিরোধী যে প্রস্তাবই নেওয়া হোক না কেন, তাতে শ্রমিক শ্রেণীকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে হবে যে এই যুদ্ধকে বিপ্লবে পরিণত করতেই হবে। এ প্রসঙ্গে Barbara Tuchman এর মন্তব্য :

After many rewordings and discussions which Lenin found overlong but rich in dialectic a satisfactory formula was worked out and tacked on to the main resolution. ২৩

মূল প্রস্তাবটি হল এই রকম :

এতে সাধারণ ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা হল না। তবে শ্রেণী সংগ্রামের কথা এবং ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে যুদ্ধ, সে কথা বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে বলা হল। বর্তমান সেনাবাহিনীর বদলে নাগরিকদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হল কিন্তু এই আন্তর্জাতিকের পক্ষে যুদ্ধবাধার বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয় একথাও বলা হল। তবে লেনিন ও রোজা লুক্সেমবুর্গের মুখ্য সংশোধনী গ্রহণ করা হল এই মর্মে যে, 'শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রসভার সদস্য মণ্ডলীকে প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে হবে যুদ্ধায়োজন বন্ধ করার এবং যে কোন উপায়ে তা কার্যকরী করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার। যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলেও তাতে ক্ষত থেমে যায় তার চেষ্টা করতে হবে এবং ইতিমধ্যে এই সংকটজনক পরিস্থিতি সাধ্যমত গ্রহণ করতে হবে শুধু ধনতন্ত্রের উৎখাত ঘটানোর জন্য।

এই স্টুটগার্ট সম্মেলনে শ্রীমতী কামা তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ, ক্লারা জেটকিন, ইতালীর আনেজলিকা বালাবনভ ইত্যাদি স্বনামধন্যা মহিলাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ইতিপূর্ব্বে প্যারিসে জাঁ জোরেস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং তিনি ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রুশ লেখক পাভলেভিচ মন্তব্য করেন২৬।

"কৃষ্ণবর্মার যা ছিল না শ্রীমতীকামার সেই প্রবল আগ্রহ ছিল রাশিয়ার বিপ্লবী কার্যকলাপ আর বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ও সেই অভ্যুত্থানে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা বিষয়ে। তিনি মার্কসবাদও কিছুটা পড়েছিলেন।"

ম্যাকসিম গোর্কীর সঙ্গে তাঁর পরবর্তী পত্রালাপে জানা যায় যে গোর্কীর সঙ্গেও তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ যে মহাযুদ্ধ বিরোধী ছিল এবং তাঁরা জাঁ জোরেস এর সঙ্গে একমত হয়ে যুদ্ধ সজ্জার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল তাঁদের পরবর্তী নানা কাজে তার প্রমান পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

সূত্র নির্দেশ

১। দাদাভাই নওরোজী—আর পি মাসানী, পৃঃ ১৪

২। ঐ, পৃঃ ১৪

৩। Les Paris : Delphine Menant, pp. 340

৪। Source Material.—A history of freedom movement in India, vol. II, pp. 523

৫। য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা, অনিলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫১

৬। Makers of Modern India, by T. V. Parvar pp. 13

৭। Les Parais, D. Meinant p. 342

৮। য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা, পৃঃ ৬০

৯। Report on Plague in India, pp. 92

১০। History of Freedom Movement in India, vol II, pp. 524

১১। শতবর্ষ গোটাত সাধারকর, ভি ভি আম্বুরকর
দাদাভাই নওরোজী, আর পি মাসানী পৃঃ ৪০
১২। রুষ ভারতী (প্রবন্ধ, ১ম ও ২য় সংখ্যা), মিখায়েল পাভলোভিচ, পৃঃ ৬-৭
১৩। বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র কানুনগো, পৃঃ ২০৪-২০৫
১৪। Polltical activities in England and the continent.
(ভারত মহাফেজখানায় সংগৃহীত ফাইল।)
১৫। Internationale, R. Palme Dutt, pp. 105-106
১১। ঐ pp. 111
১৭। শতবর্ষ গোটাত সাধারকার
ভি ভি আম্বুরকর, পৃঃ ১২৮-১১৭
১৮। য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য পৃঃ ৬৩-৬৪
১৯। Internationale, pp.113
২০। Our flage, pp. 2-5
(Ministry of Information)
২১। Ibid
২২। য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা পৃঃ ৬৩
২৩। Internationale, pp. 114
২৪। The Proud Tower, Barbara Tuchman, Bantam edition, 1967
pp. 527
২৫। Ibid
২৬। রুষ ভারতী, 'বিপ্লবীদের ভূমি' ১৯৭১- ১ম ও ২য় সংখ্যা, পাভলোভিচ
পৃঃ ৬-৭

বাংলার নবজাগরণ ঃ কয়েকটি প্রশ্ন

অমলেন্দু দে

ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫–১৮৪২ খ্রীঃ)

রামমোহনের যুগের আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি হলেন ডেভিড হেয়ার। রাধাকান্ত দেবকে আমরা যেমন রক্ষণশীল বলে অভ্রান্ত করেছি, তেমনি ডেভিড হেয়ারকেও আমরা বিশেষ মনে রাখিনি। অথচ এই মানুষটি বিদেশী হয়েও দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর এই দেশের উন্নতির জন্য আত্মত্যাগ করেন। আচার-আচরণে তিনি আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন, আর আমাদের দেশের মাটিতেই তাঁর নশ্বরদেহ মিশে গেছে। রামমোহনেরও অনেক আগে কলকাতায় এই মানুষটি প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটানা দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর (১৮০০-১৮১৪) সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য থেকে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কু-প্রথাগুলি তাদের সামনে তুলে ধরেন, আর আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করেন। তখন ঘড়ির ব্যবসা ও ঘড়ি প্রস্তুত কারিকের কাজে নিযুক্ত থাকায় হেয়ারের পক্ষে সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছিল। কু-প্রথাগুলি দূর করে দিয়ে হিন্দু সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে তিনি তৎপর হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি শিক্ষার প্রসারে পরিশ্রম করতে আরম্ভ করেন। সর্বক্ষণের কর্মী না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো সম্ভব নয়। তাই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দেন। দোকান-পাট বিক্রি করে দিয়ে যা টাকা পান (একলক্ষ টাকা), তা দিয়ে নিজের ভরণ পোষণের জন্য কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে জমি-জমা কেনেন এবং শিক্ষার স্বার্থে সারাক্ষণের কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডেভিড হেয়ার ছাড়া আর কি কেউ সারাক্ষণের কর্মীরূপে শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন? সম্ভবতঃ নয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ঠিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় হেয়ার প্রত্যক্ষভাবে কতটা যুক্ত ছিলেন এই নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে। তবুও বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রথম দিকে হিন্দু কলেজের গঠন পদ্ধতি রচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ

করেন তাঁদের মধ্যে হেয়ারও ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু ভদ্রলোকদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ এই হিন্দু কলেজের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে খ্রীষ্টান ও মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কেন হিন্দু কলেজে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? অনেকেই সন্দেহ করেন, এই পাঠ্যতালিকা নির্ধারণে ডেভিড হেয়ারের হাত ছিল। মনে রাখা দরকার, হেয়ার ছিলেন ধর্ম-বিরোধী, ঈশ্বর বিরোধী ও খ্রীষ্টান বিরোধী। আর পুরোপুরি যুক্তিবাদী। যে সব গোঁড়া হিন্দুরা রামমোহনের মত নরমপন্থী উদারনৈতিক ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব সহ্য করতে পারেননি, তাঁরা কিন্তু ডেভিড হেয়ারের মত ঈশ্বর বিরোধী যুক্তিবাদী ব্যক্তির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু, কেন? তার কারণ হল এই, শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করেন, নিজের অর্থ ও সম্পদ নিয়োজিত করেন, ছাত্রদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করেন, ব্যক্তিগত জীবনে সহজ সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ও আচার-আচরণে বাঙালী জীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই গোঁড়া হিন্দুরা পর্যন্ত তাঁর উপর আস্থা-স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাই হেয়ারের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা অর্থাৎ ঈশ্বর বিরোধী যুক্তিবাদী মন তাঁদের মোটেই উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। পরের হিতার্থে তিনি নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করেন যে, কলকাতার হিন্দু সমাজ হেয়ারকে তাঁদেরই একজন পরমাত্মীয় মনে করেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হেয়ারের নাম কেন সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি তা বুঝতে হলে হেয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ প্রয়োজন। হেয়ার প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। তাই তাঁর নাম আড়ালে থেকে গেলো। কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানতেই পারেননি যে, তিনি হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাছাড়া তিনি মনে করেন, হিন্দুরা উদ্যোগী হলে কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হবে। তাই তাঁদের সংগঠিত করে, তাঁদের সামনে রেখে, তিনি পেছনে থাকেন। সম্ভবতঃ হেয়ারের পেশার (ঘড়ি নির্মাতা ও ব্যবসায়ীরূপে) ও তাঁর ঈশ্বর বিরোধী মতবাদের জন্য তিনি কলকাতার ইংরেজ সমাজের নিকট ততটা প্রিয় ছিলেন না। তাই তাঁর উপস্থিতি তাঁর জীবনের মহান ব্রতকে যাতে ব্যর্থ না করে দেয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এই কারণেই হয়তো লাইব্রেরীর বার্ষিকীতে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে ধীরে ধীরে আমরা তাঁর উপস্থিতি ও প্রভাব দেখতে পাই। শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে যে কয়টি সংস্থা

গঠিত হয় (ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ইত্যাদি) তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা সর্বজনবিদিত (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি)। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে সময় তখনও উপযোগী হয়নি বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাই এই বিষয়েই শুধু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তাহলেও স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং এর প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' প্রতিষ্ঠিত হয় তার তিনি চাঁদাদাতা ছিলেন। তাছাড়া রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যখন হিন্দু মেয়েদের পাঠ শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত তাতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণে রাখলে 'রক্ষণশীল রাধাকান্তকে' ততটা অপাঙক্তেয় মনে হবে না।৪৬

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এসেন্সি হাউসেজগুলির ভূমিকা নিয়ে এখনও বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। এরা দেশীয় স্কুলগুলিকে অর্থ সাহায্য করত। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির ট্রেজারার ছিল মেসার্স ম্যাকিনটশ এণ্ড কোম্পানী। ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এসেন্সি হাউসেজগুলির পতন হলে অর্থাভাবে দেশীয় স্কুলগুলি খুবই ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার স্কুলগুলি রক্ষা করার জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেন এবং নিজে অনেক অর্থ সাহায্য করেন। শিক্ষার মাধ্যম কি হবে—ইংরেজি না মাতৃভাষা—এই নিয়ে তখন যে আলোচনা হয় তাতে হেয়ার উভয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা উল্লেখ করেন। এই কারণেই ইংরেজি ও মাতৃভাষার গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পণ্ডিতদের নিয়োগ করেন। ভাবতে অবাক লাগে কত আগে হেয়ার শিক্ষার বাহনের কথা চিন্তা করেন এবং একটি সমন্বয়ী পন্থা অনুসরণ করতে বলেন। হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র বলেন : "Mr. Hare's educational efforts were directed in the first place toward the encouragement of the Vernacular."৪৭ কিন্তু বাংলার জনশিক্ষার ধারাটি কেন ব্যাহত হল ? এই বিষয়ে এ্যাংলিসিষ্ট ও ওরিয়েন্টালিষ্ট মতের সমর্থকদের দায়িত্বই বা কতটুকু ছিল ? এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলে ডেভিড হেয়ার ও তাঁর সমসাময়িকদের ভূমিকা আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ে ডেভিড হেয়ারের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, যথা : (ক) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং জনসভার উপর সরকারী

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারী কলকাতার নাগরিকেরা টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করেন। এর একজন উদ্যোক্তা ছিলেন হেয়ার এবং এই সভায় তিনি একজন বক্তাও ছিলেন। (খ) এই সময়ে মরিশাস ও ব্রুবোঁ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় কুলি চালানের ব্যবসা শুরু হয়। জোর করে ও প্রতারণা করেও কুলি পাঠানো হত। হেয়ার নিজে উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের অনেক কুলিকে মুক্তিদান করেন এবং জোর করে কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এই অন্যায় প্রথার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই কলকাতার টাউন হলে একটি সভা হয়। সরকারের নিকট একটি আবেদন পত্র পেশ করা হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সরকারের পক্ষ থেকে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয়। হেয়ার ও আরও অনেকে এই কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেন। তার ভিত্তিতে এই কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাতে কুলিদের দুর্দশার কিছুটা লাঘব হয়। এই বিষয়ে হেয়ারের ভূমিকা পড়তে পড়তে আর একজন ভারত সুহৃদ বিদেশীর কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি হলেন মহামতি দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও হেয়ারের এই ভূমিকার কথা উল্লেখ নেই। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় হেয়ারকে অগ্রাহ্য করা কি যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে? (গ) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই কলকাতার টাউন হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সমগ্র দেশে ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন করা। হেয়ার ছিলেন এর উদ্যোক্তা। (ঘ) হেয়ার বিচারালয়গুলিতে ফারসী ভাষার ব্যবহার রহিত করবার জন্যও উদ্যোগী হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাব হেয়ার সমর্থন করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হেয়ার এগ্রিকাল্চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া হেয়ার আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যথা—একাডেমিক এসোসিয়েশন, সোসাইটি ফর দি এক্সটেনসান অব জেনারেল নলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ইত্যাদি।

হেয়ারের ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ণের প্রয়োজনে হেয়ার-ডিরোজিও ও হেয়ার-রামমোহন সম্পর্ক আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। হেয়ার ডিরোজিওর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ডিরোজিও হেয়ারের

মত ঈশ্বর বিরোধী ছিলেন। দুজনের চিন্তাধারায় অনেক মিল ছিল। তাই তাঁরা পরস্পরের এত নিকটে ছিলেন। আর এই কারণেই হিন্দু কলেজের হেড মাস্টার হেয়ারকে 'a vile sycophant' (of Derozio) বলে গালাগালি দেন। কোন কোন বিষয়ে এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও হেয়ারকে বাদ দিয়ে ডিরোজিওর ভূমিকা আলোচনা খুবই অসম্পূর্ণ হবে। অথচ এই ধরণের একটি ঝোঁক অনেক দিন ধরেই ইয়ং বেঙ্গল নিয়ে আলোচনায় রত লেখকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁরা দু এক লাইনে ডেভিড হেয়ারের নাম উল্লেখ করেই তাঁদের কর্তব্য সমাধা করেন। তেমনি যুক্তিবাদী রামমোহনের সঙ্গে যুক্তিবাদী হেয়ারের কোন কোন বিষয়ে মিল ছিল। দুজনেই শিক্ষায় প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে অনেক আলাপ-আলোচনা করেন ও উদ্যোগী হন। তা সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসী রামমোহনের সঙ্গে নাস্তিক হেয়ারের পার্থক্যও ছিল অনেক। অবশ্য মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা কখনই নষ্ট হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহান নায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের কিছু কিছু উপকরণ হেয়ার চরিত্রে পাওয়া যায়। তাই এই দুই চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। উভয়েই শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। উভয়ের আচার-আচরণে সরলতা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর দরদ দুজনেরই ছিল। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর অস্বাভাবিক ক্ষমতাও দুজনের ছিল। আর দুজনেই যুক্তিবাদী মননের অধিকারী ছিলেন।৪৮ হেয়ার যখন মারা যান তখন বিদ্যাসাগর বাইশ বৎসরের যুবক। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কাজেই এই সময় থেকেই বিদ্যাসাগর কলকাতার বাসিন্দা হন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের ছাত্র জীবন পরিসমাপ্ত হয়। তখন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের অনেকের অন্তরঙ্গতা হয়। আর বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত হন। তাছাড়া খুব কাছে থেকে ডেভিড হেয়ারকে দেখার সৌভাগ্যও তাঁর হয়। তাই হেয়ারের প্রভাব বিদ্যাসাগরের উপর পড়বে তাতো স্বাভাবিক। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন হেয়ারের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর গভীর বেদনা অনুভব করেন। হেয়ারের স্মরণে যে সব সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বন্ধুবান্ধবসহ বিদ্যাসাগর উপস্থিত থাকতেন। তা থেকেই হেয়ারের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর রামমোহনকে কতটা স্বচক্ষে দেখেছেন জানিনা। কিন্তু

তিনি তো প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে হেয়ারকে দেখেছেন।৪৯ তাই পরবর্তীকালে যেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে আবার আমরা হেয়ারকে দেখতে পেলাম অনেক বেশী বলিষ্ঠতা ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। একথা বলে কি খুবই অত্যুক্তি হবে?

বর্তমানে যে অর্থে আমরা স্বদেশিকতার অর্থ বুঝে থাকি তার খাঁটি নিদর্শন আমরা পাই ডিরোজিও রচিত The Fukeer of Junghoora নামক কবিতার মধ্যে এবং তাঁর শিষ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ রচিত কবিতায় (১৮৩০ খ্রী)। সম্প্রতি ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল: ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণে হেয়ারের কথা ভুলে যাওয়া কি উচিত হবে? যে পটভূমিকায় স্বাদেশিকতার উন্মেষ হল সেখানে তো এঁরা সবাই—হেয়ার-ডিরোজিও-ইয়ংবেঙ্গল—পরস্পরের কাছে ছিলেন। প্রসঙ্গত আর একটি কথা মনে রাখলে পরবর্তীকালের বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে বুঝতে সুবিধা হবে। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডা: দুর্গাচরণ ব্যানার্জি সেযুগে কলকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। প্রথম জীবনে দুর্গাচরণ হেয়ারের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। হেয়ারের পরামর্শেই দুর্গাচরণ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং পরে চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। হেয়ার ও ডিরোজিওর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাচরণের পরিবারে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধেই তা জানা যায়। এইভাবেই সুরেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে প্রথম দীক্ষিত হন।৫০

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে হেয়ারের প্রভাব খুবই সুদূরপ্রসারী ছিল। শিক্ষিত বাঙালীর জাতীয় চেতনা বিকাশে তাঁর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা কি করে ভুলতে পারি যে, প্রচণ্ড বর্ষণ সত্ত্বেও পাঁচ হাজার শোকার্ত মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে সমবেত হন। সে যুগে আর তো কোন বিদেশীকে বাঙালী সমাজ এতটা আপন করে গ্রহণ করেনি। কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে হেয়ারের কবরের দিকে তাকালে আর একটা কথাও মনে আসে। কেন খ্রীষ্টানদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানায় শায়িত না থেকে হেয়ার এইখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন? হেয়ার হয়তো ধারণা করেছিলেন তাঁর ঈশ্বর বিরোধী মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টান সমাজ, বিশেষ করে পাদ্রীরা তাঁদের কবরখানায় তাঁকে স্থান দিতে আপত্তি করতে পারেন। সম্ভবত: এই কারণেই তিনি নিজের কেনা জমিতে, নিজের কীর্তিকলাপের সান্নিধ্যে

চিরনিদ্রায় শায়িত থাকার সিদ্ধান্ত নেন।৫১ সমগ্র হেয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে একটা প্রশ্ন সহজেই মনে আসবে : তাঁর মত চিন্তায় ও কর্মে এতটা সমন্বয় সাধন সে যুগে কি আর কারও মধ্যে পাওয়া যায় ? বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আমরা হেয়ারকে প্রায় ভুলতে বসলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর কীর্তি যে কতটা অম্লান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় হেয়ার স্মরণে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জনসমাবেশে। প্রসঙ্গত হেয়ার মেমোরিয়াল মিটিং ও হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড কমিটির ভূমিকা উল্লেখ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুটো সংস্থা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়।৫২ অবশ্য হেয়ার জীবিত থাকাকালীন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তাঁর ছাপ্পান্নতম জন্মদিনে একটি সভার আয়োজন করে যে মানপত্র দেন তাও উল্লেখযোগ্য। তাতে বলা হয় : "We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait...it will be gratification to our feeling if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu Society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame and to imitate, immortality."৫৩ ডেভিড হেয়ারের নাম স্মরণার্থে যে তৃতীয় বাৎসরিক সভার আয়োজন করা হয় তার প্রধান বক্তা ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর ভাষণ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। আট পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা একটি মূল্যবান ডকুমেণ্ট। এই পুস্তিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত আধুনিক বঙ্গসমাজ গঠনে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকার বিশদ আলোচনা করেন। অক্ষয় কুমার বলেন : "এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহচক্র ধূমকেতুর ভ্রম, পরিমাণ, এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনারদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যালাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যালয় যে হিন্দু কলেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার করেন কোন্ ব্যক্তি ?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার

সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন পুরুষ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী কোন্ মহাত্মা?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এইরূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতবাসের বিদ্যারূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজরূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমাদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারী, তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।"৩৪

অক্ষয় কুমার দত্তের এই অনবদ্য ভাষণ ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা বিশ্লেষণে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনায় অপরিহার্য উপাদান বলা চলে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিচয় আমরা পাই তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার অন্যতম ছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষায়: "তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার।"৩৫ এই ডেভিড হেয়ারকে কি আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের অংশ হিসেবে ভাবতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। যিনি ভারতবাসীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন তিনি তো আমাদেরই একজন। আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশে হেয়ারকে অস্বীকার করার অর্থ হল ঊত্তরাধিকারকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে না পারা। সম্প্রতি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ারের কতটুকু অংশ ছিল তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। যাঁরা ডেভিড হেয়ারের ভূমিকাকে প্রায় অস্বীকার করতে চান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য উপরে উল্লিখিত অক্ষয় কুমার দত্তের উক্তি ও আরও কয়েকটি তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার স্মরণে যে সভা হয় তাতে বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র Practical Education নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে।৩৬ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে Recollections of My School Days নামে যে ধারাবাহিক রচনা 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' কাগজে প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়

মূলে ছিলেন ডেভিড হেয়ার, রামমোহন নন। রেভা: লাল বিহারী দে ছিলেন এই প্রবন্ধের লেখক। ডেভিড হেয়ারের ও রামমোহনের ভূমিকা আলোচনায় এই রচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।৫১

হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লেখেন : "হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অতুকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করায় কার্য্যে পরিণত হয়"।৫২ সম্প্রতি ড: এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদ এক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে লেখেন : "Even before the establishment of the Hindu College, Rammohun Roy is said to have established an English Free School for the education of Hindoo children on a liberal scale." ৫৩ কিন্তু প্রশ্ন হল : রামমোহনের এই বিদ্যালয় ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাবের পূর্বেই কি প্রতিষ্ঠিত হয় ?

বিভিন্ন তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ হিন্দু কলেজের প্রধান উদ্যোগীরূপে ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একজন মুখ্য প্রবর্ত্তকরূপে ডেভিড হেয়ারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই মনোভাব অগ্রাহ্য করা কি সম্ভব ?

সূত্র নির্দেশ

৪৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা ১৮০০-১৮৭৩, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা : ১-১৬ ; Amit Sen, Notes on the Bengal Renaissance, Calcutta, 1957, pp. 14-15 ;
হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন, এই বিষয়ে ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার নতুন তথ্য পরিবেশন করেন (দ্র: On Rammohan Roy, Calcutta, 1972) ; Radharaman Mitra, David Hare, His life and work, Calcutta, 1968, pp. 1-15 ; Rammohun Roy and English Education in India : A Revaluation by Dr. N. S. Bose, Indo-Iranica, Calcutta June 1972.
শিক্ষাক্ষেত্রে রাধাকান্ত ও ডেভিড হেয়ারের ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত

তথ্যবহুল আলোচনা যোগেশ চন্দ্র বাগল লিখিত পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

৪৭. William Adam, Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838), Edited by Anathnath Basu, University of Calcutta, 1941, p. 476 ; R. Mitra, David Hare.

৪৮. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর, কলিকাতা, ১৯৬৩ ; প্যারীচাঁদ মিত্র, ডেভিড হেয়ার, কলিকাতা, ১৯৭৪ (সাধারণ সম্পাদক : কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত) ; R. Mitra. David Hare. হেয়ার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এইসব গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪৯. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯০৯, পৃষ্ঠা : ৩৮, ৬৭-৭০

৫০. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা : ৩২ , মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণের, পৃষ্ঠা : ৫-৭ ; R. Mitra, David Hare, p. 14.

৫১. R. Mitra, David Hare, p. 29.

৫২. Jogesh Chandra Bagal, Beginnings of Modern Education in Bengal ; Women's Education, Calcutta, 1943, pp. 57-58. উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের বিষয়ে ও স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে রয়েছে।

৫৩. R. Mitra, David Hare, p. 25.

৫৪. অক্ষয় কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, পৃষ্ঠা : ১-৮ (Discourse Read at the Third Hare Anniversary Meeting by Baboo Ukhoy Coomar Duttu, Calcutta, 1845).

এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৫৫. ঐ

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থে লেখেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে "হেয়ার, রঙ্গভূমির পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধ উপায়ে সহায়তা করিতেছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও

উদ্যম না থাকিলে, বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোত: বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত।' (ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৭)।

৫৬. 'Practical Education' by Babu Iswar Chandra Mitra, The Bengal Magazine, August, 1872, pp. 27-29.

৫৭. 'Recollections of My School Days' by an Old Bengali Boy, The Bengal Magazine, May, 1873, pp. 438-440.

৫৮. Rajnarain Vasu, Hindu athaba Presidency Colleger Itibritta Edited by : Devipada Bhattacharya, Calcutta, 1957, p 4.

৫৯ A. F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835, Leiden, 1965, p. 35.

লেভা: ডেভিড হাইড ইষ্টকে হিন্দু কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লেখ করেন (দ্র: Adam, Reports, p. 478)। অর্থাৎ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন না, একাধিক ব্যক্তিকে এর প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা যায়।

প্রাচীন ব্যাবিলনের গণিত চর্চা

শ্রীপ্রদীপ কুমার মজুমদার

মানব জাতির আবির্ভাব কবে থেকে হ'য়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা জানি না, আনুমানিক এক থেকে দেড় মিলিয়ন বৎসর পূর্বে মানব জাতির আবির্ভাব হয়। আবির্ভাব কাল থেকেই মানুষ আজকের মত সুসভ্য ছিল না। তারা কাঁচা মাংস খেত, যাযাবরদের ন্যায় জীবন যাপন করতো। তারা মনের ভাবকে কিভাবে লিখতে হয় জানত না। অদম্য কৌতুহলই তাকে জানতে শিখিয়েছে কি করে মনের ভাবকে লিখে রাখা যায়। যার ফলে আবিষ্কার হয়েছে লিপির। কিন্তু প্রাচীনকালে এখনকার মত লিপি আবিষ্কৃত হয়নি। তারা দেওয়ালে বা পাহাড়ের গুহায় চিত্র এঁকে মনের ভাবকে লিখে রাখতো। এরপর তারা কিছুটা সুসভ্য হওয়ায় মনের ভাবকে লেখবার জন্য প্রতীক ব্যবহার করতে লাগলো এলো কিউনিফর্ম লিপির যুগ। তারপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আধুনিক লিপির যুগে আমরা এসেছি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম যুগকে প্রস্তর প্রস্তর যুগ বলা হয়। এরপর আসে নব্য প্রস্তর যুগ তারপর তাম্রযুগ এরই পরিণতি ব্রোঞ্জ যুগ। সভ্যতার প্রথম উদ্ভব হয় মিশরের নীলনদের তীরবর্তী এলাকায়, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়, সিন্ধুনদের তীরবর্তী ও হোয়াংহো এবং ইয়াং সি কিয়াং বিধৌত চীনদেশে। প্রাচীনকালের যে সমস্ত কীর্তি ও সভ্যতা, সব কিছু জানতে পেরেছি বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পাঠ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মিলিত চেষ্টায় জানতে পেরেছি, তৎকালীন মানব জাতি কতটা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মিলিত চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় খনন কার্য্য হয়েছিল সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ লিপি, ব্যবহার্য দ্রব্য, ইত্যাদি, যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের নিরলস গবেষণার ফলে আমরা প্রাচীনকালের ঘটনা প্রবাহ জানতে পেরেছি তাঁদের মধ্যে গর্ডন চাইল্ড, স্টুয়ার্ট পিগট, মরগ্যান, জর্জ সচিন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, জোগট, শোপেন হাউয়ার, টি এল হীথ, ক্যাজরি স্মীথ, দত্ত-মজুমদার, রাইও, অটো নিউগেবাওয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, মিশর, ব্যাবিলন, চীন, গ্রীস ও ভারতবর্ষে প্রথম গণিত চর্চা হয়। এটা ঠিক, গণিত ও জ্যোতিষের আবির্ভাবের সহিত কৃষি নির্ভর সভ্যতা ও অর্থনীতির এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল কারণ স্বরূপ বলা যায় কোন সময় কোন ঋতুর আবির্ভাব হবে এবং কতদিন পর্যন্ত থাকবে তা গণনার জন্যই পঞ্জিকার প্রণয়ন এবং এই জন্যেই গণিতের উৎপত্তি. প্রথমেই বলেছি গণিত শাস্ত্রের প্রচলন হয় মিশরে ব্যাবিলনে, চীন, গ্রীস ও ভারতবর্ষে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যাবিলনের গণিত চর্চা নিয়ে আলোচিত হচ্ছে।

ফ্রান্স ও ব্রটেনের প্রত্নতাত্ত্বিকদের যৌথ চেষ্টায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার খনন কার্য্য পরিচালনা করা হয়। সেই খনন কার্যের ফলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন লিপিও ব্যবহার্য্য দ্রব্য থেকে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন প্রায় চারহাজার বৎসর পূর্বে এখানে এক উন্নত ধরনের সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। 'নিনেভ' 'আসুর' ও 'নিপ্পুর' নামক শহরে পচা মাটির ট্যাবলেটের উপর লিখিত বহু গাণিতিক লিপি পাওয়া গেছে। তা থেকে অনুমান করা হয় গণিতে ব্যাবিলনীয়রা বেশ উন্নত ছিল। তাছাড়া আমরা বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানতে পেরেছি যে গ্রীকরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনীয়দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ব্যাবিলনীয়রা মাটির চাকতি বা সিলিণ্ডার বা প্রিজমের উপর কাঠির আগা দিয়ে কীলকের (wedge) আকারে এক প্রকার লিপির সাহায্যে গণিতের সব কিছু তত্ত্ব ও তথ্যকে লিখে রাখত এবং যাতে ঐ ধরণের চাকতি ভেঙ্গে না যায় তার জন্য পুড়িয়ে শক্ত করে রাখতো। এইগুলিই তৎকালীন অতিমূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে আদৃত ছিল। এ ধরণের প্রায় ২২০০০ (বাইশ হাজার) লিপি ঐতিহাসিকেরা সন্ধান পেয়েছেন বর্ত্তমানে এগুলি বৃটিশ মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে আনুমানিক এখন থেকে ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব থেকে ৩১০০ বৎসর পূর্বে এ ধরণের গণিতের লিপি তৈরী করা হ'য়েছিল। এ সমস্ত মৃন্ময়লিপি থেকে জানা যায় যে সেই সময় ব্যাবীলনীয়রা সহসমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ ইত্যাদি জানত তাছাড়া বর্গমূল, ঘনমূল, ক্ষেত্রফল ও সংখ্যার সাহায্যে অংক পাতন পদ্ধতি জানতো। বিভিন্ন সংখ্যাকে বিভিন্ন চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতো, যেমন, ১, ২, ৩,...১০, ১১, ১২ ইত্যাদিকে তারা লিখত

যে সমস্ত মৃন্ময়লিপি পাওয়া গেছে তার কতকগুলি আকারে বেশ ছোট, যেমন $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বায় ২ ইঞ্চি চওড়ায় $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি মোট। আবার কতকগুলি পাওয়া গিয়েছে

যেগুলি আকারে বেশ বড় এবং দু পৃষ্ঠাতেই লেখা। কোন কোন মৃন্ময় লিপিতে এত ছোট ভাবে গণিতে সমাধান করে দেওয়া আছে যা পাঠোদ্ধার করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ঐতিহাসিকেরা এমন একটা মৃন্ময় লিপি পেয়েছেন যার বৈশিষ্ট্য ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪ ইঞ্চি এতে ২০০ অধিক গণিতের সমাধান করে দেওয়া আছে। কতকগুলি মৃন্ময় লিপিতে একটি মাত্র অংকের সমাধান করা আছে। এই সমস্ত মৃন্ময় লিপিতে বহু সূত্রের তত্ত্ব ও তথ্যকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়েও লেখা আছে অবশ্য কতগুলিতে মাত্র কি করে করতে হবে তারই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

ব্যাবিলনীয়রা অংকপাতন পদ্ধতিতে ষাষ্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করতো। অনুমান করা যায় যে তারা দশমিক ও ষাদশিক পদ্ধতিতে অংক করতে অসুবিধা বোধ করতো। দশমিক পদ্ধতি একটি সংখ্যার যে মান হয় ষাষ্টিক পদ্ধতিতে সে মান হয় না উদাহরণ স্বরূপ ১২৪ সংখ্যাটিই ধরা যক।

$১২৪ = ১ \times (১০)^২ + ২ \times ১০ + ৪$ (দশমিক : আধুনিক)

$= ১ \times (৬০)^২ + ২ \times ৬০ + ৪$ (ষাষ্টিক : ব্যাবিলনীয়)

ব্যাবিলনীয়রা বর্গ রাশির ব্যবহার জানতো সে নিদর্শন পাই একটি বিশেষ মৃন্ময় লিপিতে। সেই মৃন্ময় লিপিতে ২·১ মানে $১১^২$ আছে এটা একমাত্র ষাষ্টিক পদ্ধতিতেই সম্ভব অর্থাৎ $২·১ = ২ \times ৬০ + ১ = ১২১ = ১১^২$ বহু মৃন্ময় লিপিতে ভগ্নাংশে ব্যবহার পাওয়া যায় উদাহরণ স্বরূপ ৪৬৩৫২ YBC প্রবলেম টেবলেট থেকে তুলে ধরছি।

"আমি একটি পাথর দেখলাম কিন্তু ওজন করিলাম না" (অতঃপর) আমি ১ বিয়োগ করি $\frac{১}{১০}$ যোগ করি (এবং) $\frac{১}{১০}$ বিয়োগ করি আমি ওজন করিলাম (ইহাকে) ১ মা-ন পাথরটি মূল ওজন কত ?

উত্তর পাথরটি মূল ওজন ১ মা-ন $৯\frac{১}{২}$ গিন এবং $২\frac{১}{২}$ সে আধুনিক গণিতের ভাষায় একে রূপ দিলে দাঁড়ায়।

$$\left(x^4 - \frac{x}{7} \right) + \frac{1}{11}\left(x - \frac{x}{7} \right) - \frac{1}{13}\left[\left(x - \frac{x}{7} \right) + \frac{1}{11}\left(x - \frac{x}{7} \right) \right] = 1,\ 0.$$

সমাধান :—

$$x=1\ (\text{মান})+9\tfrac{1}{2}\ (\text{গিন})+2\tfrac{1}{2}\ (\text{সে}).$$
$$=1,\ 9,\ 30,\ 50\ \text{গিন}$$

বস্তুতপক্ষে $\frac{x}{7}=9,\ 55,\ 50.$

$$x-\frac{x}{7}=59.,\ 35;\ \frac{1}{11}\left(x-\frac{x}{7}\right)=5,\ 25.$$

$$\frac{1}{13}\left\{\left(x-\frac{x}{7}\right)+\frac{1}{11}\left(x-\frac{x}{7}\right)\right\}=5.$$

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে ব্যাবিলনীয়রা ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ বেশ সুষ্ঠুভাবেই করতো। তাছাড়া ওজনের একক হিসেবে মা-ন গিন এবং সে প্রচলন ছিল। তারা শূন্যের ব্যবহার জানতো কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বেশ মত পার্থক্য আছে। তবে ২০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত মৃন্ময় লিপিতে শূন্যের স্থান বা ইহার অস্তিত্ব নির্দ্দেশের জন্য কৌণিক প্রতীক (৲) ব্যবহার করতে দেখা যায়। কোন কোন মৃন্ময় লিপিতে সংখ্যা সারণী দেখা যায় যেমন গুণের জন্য যে সারণী দরকার সেটা তারা তৈরী করেছিল নীচে কয়েকটি তুলে ধরলাম।

৭	৩০
৮	৪০
৪	১৫
৫	১২
৬	১০
৮	৭·৩০
৯	৬·৪০
১০	৬
১২	৫
১৫	৪

গ্রীক গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে ডায়োফ্যাণ্টাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি বীজগণিতে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তার আগে ব্যাবিলনীয়রা বীজগণিতের সাহায্যে এক ঘাত, দ্বিঘাত ও সহসমীকরণের সমাধান করবার চেষ্টা করেছিল। এ ধরণের সমীকরণে অজ্ঞাত রাশিটি ছাড়া আর সবগুলিই সংখ্যারাশি অবশ্য সমীকরণগুলি করবার পদ্ধতি তারা জানতো কিনা সে তত্ত্ব

আমরা হস্তগত করতে পারি নি। মনে হয় অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব বলে সমাধান করবার পদ্ধতি লিখে যায় নি তারা আঙ্কিক সমাধান নির্ণয়ে যেন দক্ষতার পরিচয় দেয় একটা উদাহরণ তুলে ধরলাম।

$(ax+by)^2+cx+dy=0$. a, c, c, d, ৫০টি বিভিন্ন মান প্রয়োগ করে সমাধান করবার চেষ্টা করেছি।

আমরা প্রত্যেকেই পীথাগোরীয় সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি অর্থাৎ কোন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ d হয় এবং বাকী ২টি বাহু l এবং b হয় তবে $d^2=l^2+b^2$.

ব্যাবিলনীয়রা কিন্তু এই পদ্ধতি জানতো অন্ততঃ মৃন্ময় লিপি থেকে সে কথা স্পষ্ট করে বোঝা যায়। উদাহরণ দিলাম $l=২·০$, $b=১·৫৯$, $d=২·৪৯$।

$l=২=২\times৬০=১২০$

$b=১·৫৯=১\times৬০+৫৯=১১৯$

$d=২·৪৯=২\times৬০+৪৯=১৬৯$

$২^2+১·৫৯^2=২·৪৯^2$

অথবা $১২০^2+১১৯^2=১৬৯^2$.

মৃন্ময় লিপির কয়েকটি লব্ধ সারিতে অনেক কিছুই করে দেওয়া আছে দেখা যায় তার একটি ব্যাবিলনীয় ভাষায় বাংলা হরফে তুলে ধরছি।

I	II
(তা-ক)-ই-ইল-টিসি-লি টিম	ইব-সি সাগ
III	IV
ইব-সি-লি ইপ টিম	মু-বি-ইব।

মৃন্ময় লিপি থেকে যা জানা গেছে তা হচ্ছে তারা দৈর্ঘ্যকে "আশ" প্রস্থকে সাগ এবং ক্ষেত্রফলকে অ-সা বলতো। দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে "গাড়" কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের একক ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যেমন রুক্ষ, কুশ, "তাগাল", সু-শী, সিলটুস গেস-উ ভরাধান ইত্যাদি যদিও শেষ তিনটির ব্যবহার ঠিক একক হিসাবে অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়নি।

মাটির ট্যাবলেটের উপর যে গাণিতিক চিহ্ন দিয়ে গণিতের দুরুহ তত্ত্ব লেখা আছে তা কোন কোনটা আকারে অত্যন্ত ছোট যেমন ধরা যায় yBo. ১২৮৪ মৃন্ময় লিপির কথা। মাত্র ১টা অংকই দেওয়া আছে। তুলে ধরছি তাহলেই বোঝা যাবে কত ছোট অংক দেওয়া আছে।

১ সিগ (একটি ইট)

কি-লা-বি এন নাম (এর ওজন কত ?)

কি-লা-বি $৮\frac{১}{৩}$ মা-ন (ইহার ওজন $৮\frac{১}{৩}$ মা-ন)

ব্যাবিলনীয়রা ত্রিভুজের ক্ষেত্র সংক্রান্ত ও তার সাধারণ হিসাবে অংকের সমাধান করতে হলে জানতো উদাহরণস্বরূপ Ca MLC ১৭৫০ নম্বর লিপির কথাই ধরা হক।

১। সাগ ডু ২০ গাড় বাস (একটি ত্রিভুজ ২০ গাড় দৈর্ঘ)।

২। ৫, ২০ অ-সা বি (৫.২০ ক্ষেত্রফল)।

৩। ৩০ গাড় ...লু (?) (৩০ গাড়.....)

৪। সাগ-আন-টা-উ সাগ-কি-টা মি-লু-ইউর কে-ই-ট [-লু-তে]
(উপর প্রস্থ ও নীচের প্রস্থ কত ?)

১। ইগি ২০ ডু ৩ টা-মার ৩ অ-না ৫, ২০ ই সি ১ (৬)
(২০ র বীপরীত নাও তুমি দেখতে পাবে ৩, ৫ ২০ কে ৩ দ্বারা গুণ কর এবং (ফল হইবে) ১ (৬).

২। ১৬ অ-না সাগ-আন-টাউ লু-লু. (১৬ ?) উপরে প্রস্থ এবং

৩। .....মা ৩০ আস অ-না ২ এ-সি (?) ইপ ১.

৪। উ ২০ মু টা-রি-টাম অন-টা আল-গাড় ১, ২০ (৩০ দৈর্ঘ্য, ২ দ্বারা গুণ কর। যোগ কর ১, ০ এবং ২০ উপরের দৈর্ঘ্য ১'২০)।

৫। ই গি ১২০ ডু ৪৫ অ-ন। ৫, ২০ অ-সা [ই-সি-মা ৪] [১২০ বীপরীত লও (গুণ কর) (ফলকে Resulting) '০, ৪৫ কে ৫, ২০ দ্বারা ক্ষেত্রটি এবং ফল হয় ৪]

৬। [৪ অ-না] ১৬ তা-ই-না ১৬ জি ২ [০-সাগ-আন-টা].
(১৬' র সঙ্গে ৪ যোগ কর ১৬ হইতে বিয়োগ কর [উপরের প্রস্থ] ২ [০]

৭। [১২ সাগ-কিটা (নিম্নের প্রস্থ)।

ব্যাবিলনীয় গণিতবিদরা অমলদ রাশি সম্পর্কে আরছা আরছা জানতো যেমন $(p^2+q^2)^{\frac{1}{2}}=p+\frac{q^2}{2p}$ লিখত। ঠিক এই ভাবেই তারা $\nu'২$ মান $১-\frac{৫}{১২}$ বের করেছিল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তারা π এর মান ৩ বের করেছিল।

ধরতে গেলে ২ হাজার বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনীয়রা ছিল এক চিন্তাশীল জাতি। তাদেরই কাছে শিক্ষা করে গ্রীকরা ৫০০ খৃষ্ট পূর্ব থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। সেই ব্যাবিলন আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। শুধু রেখে গেছে কয়েকটা মাটির চাকতি যা তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার স্মৃতি বহন করে আসে। কত সভ্যতাই তো উৎকর্ষতার চরমে উঠে আবার বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। শুধু স্মৃতি বহনের জন্য কিছু লিপি, কিছু ব্যবহার্য দ্রব্য ফেলে রেখে যায়। যখন মিউজিয়মে ঘুরে ঘুরে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের নিদর্শনগুলি দেখি, মনে প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয়, কার পাপে এত বড় সুসভ্য জাতির জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবলুপ্তি। হয়তো মিউজিয়মের কাঁচের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যাবে "দেখ তোমরা, লেখ তোমরা, আমরা হারিয়ে গেছি, তোমরাই পারবে আমাদের মনে রাখতে তোমরাই পারবে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে"। তাইতো ঐতিহাসিকেরা সাড়া দিয়েছেন। জানিয়ে যাচ্ছেন তাদের কথা। তাইতো মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপির পাতুর মুখে হাসি ফোঁটে। জগৎ আজ প্রাচীনদের জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতি জানতে উৎসুক। ঐতিহাসিকেরাও তৎপর জানাবার জন্যে।

ফরাসী বিপ্লবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা

অধ্যাপক শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস

আমাদের দেশের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। ফ্রান্স দেশে পৌনে দু'শ বছর আগে বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল আমাদের দেশেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু কোথায়ও সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কারণ কি?

ফরাসী বিপ্লবে রাজতন্ত্রের পতনের পর ২১শে সেপ্টেম্বর (১৭৯২) পুরাতন আইন সভার পরিবর্তে নূতন আইন সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এক নূতন আইন সভার নাম জাতীয় গণপরিষদ (National Convention)। এই সভা প্রথম দিন হইতে ফ্রান্সকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। বিপ্লবের আরম্ভে রাজতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে আর্থিক দুর্গতির জন্য দেশ ডুবিবার পথে চলিতেছিল। গভর্ণমেণ্টের আয় প্রায় ছিল না বলিলেই চলে কিন্তু ব্যয় প্রত্যেক বছর বেশি হইতেছিল। "মুস্কিল আসান" করিবার জন্য গীর্জার সম্পত্তি জাতীয়করণ হইয়া বাজারে বণ্ড ছাড়া হইল। এই বণ্ড শীঘ্রই কাগজী মুদ্রায় পরিণত হইল। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব মিটিল না। জিনিসপত্রের মূল্যও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। জন-সাধারণের সমর্থন না থাকিলে সাধারণতন্ত্রের পতন হইবার ভয়ে বিপ্লবী নেতাগণ দেশবাসীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিপ্লবের মধ্যে সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সে তাঁহাদের চেষ্টায় জাতীয় গণপরিষদ দুইটি সর্বোচ্চ মূল্য আইন পাশ করিয়াছিল। ১৭৯৩ সালের ৩রা এবং ৪ঠা মে গণপরিষদ "ক্রম নিয়ন্ত্রণী" সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য নীতি গ্রহণ করিয়া খাদ্যশস্যের প্রথম সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিল। ইহা দ্বারা জেলাগুলির কর্তৃপক্ষগণকে পৌরসভার উপর এবং পৌরসভাগুলিকে বাষ্টির উপর হুকুম দখল করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৭৯৩ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত দেশের প্রত্যেক জায়গার গত দরের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করা হইল। এই নীতি অনুসারে পরবর্তী মাসগুলিতে কৃষকগণ মে (১৭৯৩) মাসের সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা যথাক্রমে $\frac{১}{১০}$ (জুন), $\frac{১}{২০}$ (জুলাই), $\frac{১}{২০}$ (আগষ্ট), $\frac{১}{৪০}$ (সেপ্টেম্বর), কম মূল্য পাইবে।

তবে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজারের বাহিরে ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইল। ১৭৯২-৯৩ সালে যে অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহার মূল কারণ খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি মনে করিয়া আইনসভা এই আইন পাশ করিয়াছিল।১

১৭৯৩ সালের প্রথম চার মাসের স্থানীয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশে [ডিপার্টমেন্ট—সংবিধান সভা (Constituent Assembly) ১৭৯০ সালে সমগ্র দেশকে ৮৩ ডিপার্টমেন্ট-এ ভাগ করিয়াছিল] শস্যের মূল্য ধার্য করা হইয়াছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ অন্যান্য জায়গায় নাগরিকগণের সুবিধা ও অসুবিধার কথা না জানিয়া প্রায়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। ইহার ফলে নাগরিকগণ বড়ই অসুবিধায় পড়িলে পরিণাম খারাপ হইল। নিয়ন্ত্রণমুক্ত জিনিসের মূল্য খুব বেশি হইল। গমের মূল্য নিয়ন্ত্রিত ছিল কিন্তু ময়দার ছিল না। এর জন্য রুটি ক্রয় করা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ছিল। শাসন ব্যবস্থা শিথিল থাকায় সর্বোচ্চ আইনের প্রয়োগ কোথায়ও হইত না। এক আইন প্রয়োগ না হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রায়ই অভিযোগ পৌঁ ছিত।২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখ ত্র তখনকার পরিস্থিতি বিষয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন : "সর্বোচ্চ আইন বাতিল করিতেই হইবে। কারণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের প্রয়োজন ফাঁপাইয়া বলেন। জনসাধারণ নিজ নিজ আনুমানিক প্রয়োজন কম করে। যাহাদের ঘরে মাল আছে তাহারা কম মূল্যে বিক্রী করিতে অস্বীকার করে। যাহাদের একান্ত প্রয়োজন তাহারা ক্রয় করিতে অপারগ হয়।৩

খাদ্যশস্যের মূল্য ধার্য করিয়া আইন হওয়া সত্ত্বেও দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস-পত্র পাওয়া সহজ হইল না। কয়েক মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দরে রুটি সরবরাহ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (sans-culottes) ইহাই প্রধান খাদ্য ছিল, আর দরিদ্রের ইহাই একমাত্র খাদ্য ছিল। কারণ তাহাদের দৈনিক আয় এতই কম ছিল যে অন্য কোন প্রধান খাদ্য ক্রয় করিবার পয়সা যোগাড় করিতে পারিত না। "Pere Duchesne" নামে একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র রুটির সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া প্রায়ই লিখিত : "আমাদের দখলে যাহা আছে তাহার মধ্যে রুটিই প্রধান।" যে পরিবারে দৈনিক পাঁচ কিলো রুটির প্রয়োজন সেখানে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত দরে রুটি খরিদ করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নয়।৪

মধ্য এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি মাত্র প্রাথমিক সমিতি সর্বোচ্চ আইন সমর্থন

করিয়াছিল, উনপঞ্চাশটি ইহার উচ্ছেদ চাহিয়াছিল। কারণ এক অবস্থায় চাষী অল্প মূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় কিন্তু তাহাকে উচ্চ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিতে হয়। এজন্য সে সর্বোচ্চ মূল্য যথাসম্ভব কম বিক্রী করে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্ভিক্ষ। তুর (Tour) সহরে বাজারে জিনিসপত্র অমিল হইবার জন্য রসিদ সংগ্রহে নিযুক্ত এজেন্ট আগস্ট মাসে (১৭৯৩) কর্তৃপক্ষের নিকট বেশি দরে মাল ক্রয় করিবার অনুমতি চাহিয়াছিল। এই আইন সৈন্য বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাইবার প্রধান বাধা ছিল।৫

জুন মাসে এই আইনের সংশোধন করিয়া একটি সাধারণ সর্বোচ্চ আইন পাশ করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজারের বাহিরে খাদ্যশস্য খরিদ করিতে সুবিধা দিবার জন্য এই আইন আংশিক ব্যর্থ হইল। এই আইনের জন্য ফ্রান্সে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে সরকারী কর্মচারীগণ ইহা বলিয়া দৃঢ় ভাষায় ইহার উচ্ছেদ দাবী করিল।৬

জুলাই মাসের শেষে দেশে প্রত্যেক সহরে গুরুতর খাদ্যসঙ্কট ঘটিল। রুয়েন (Rouen), আমিঁ (Amiens), আটিচি (Attichi), সেনলিস (Senlis)—প্রতিটি জায়গায় খাদ্যসঙ্কটের জন্য ছোট বড় উপদ্রব ঘটিল। গভর্ণমেন্ট যথাসাধ্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। অনাবৃষ্টির জন্য সীন নদীর জল শুকাইয়া যাওয়ায় প্যারিস শহরের জলস্রোত চালিত চাকী বন্ধ হইল। তখন একমাত্র হস্তচালিত চাকীর উপর চাকীওয়ালারা নির্ভর করিল।৭

তখন উগ্র বিপ্লবীদলের (Enragés) দুটি খবরের কাগজ ছিল। মারা-র (Marat) মৃত্যুর পর জাকরুক্স (Jacques Roux) তাঁহার কাগজের নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নাম (জনগণের বন্ধু মারা-র ছায়ার পাশে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রকাশক") দিয়া কাগজটি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। লেক্লের্ক(Leclerc) ২০শে জুলাই Amidu peuplo "(জনসাধারণের বন্ধু) "নামে (মারা-র কাগজের প্রথম নাম ইহাই ছিল) আর একটি কাগজ বাহির করিলেন। তিনি তাঁহার কাগজে এই মত প্রকাশ করিলেন যে আইনের আশ্রয়ে থাকিয়া ধনীর ষড়যন্ত্রের জন্যই খাদ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তিনি ধনী সম্প্রদায়কে দস্যু এবং নরহত্যাকারী আখ্যা দিয়া জনসাধারণ যে এতদিনে তাহাদিগকে শেষ করে নাই ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ফাটকাবাজদের মৃত্যুদণ্ড দাবী করেন। জাকরুক্স তাহাকে সমর্থন করেন। Pere Duchesne কাগজের সম্পাদক এবেয়ার (Hebert) সহজ জনপ্রিয়তার সুযোগ লইবার জন্য এখন প্রস্তাব করিলেন যে

সহরগুলিকে খাওয়াইবার জন্য চাষীকে ক্ষতিপূরণ দিয়া ফসল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে লোকসংখ্যা অনুপাতে মদ এবং খাদ্যশস্য সহ সকল জিনিস গভর্ণমেণ্টের বাঁটিয়া দেওয়া উচিত।৮

এই প্রকার উত্তেজনামূলক প্রচারের ফলে প্যারিস সহরে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইল। নরমাণ্ডী এবং ব্রিটানী হইতে সরবরাহ বন্ধ হইয়াছিল। জিরোদাঁ (Girondins) দলের যে বিপদ আসিয়া পড়ন ঘটাইল জননিরাপত্তা কমিটি-র (Committee of Public Safety) ঐ একই বিপদের আশঙ্কা হইল। খাদ্যাভাবের জন্য জনতা এখন স্বভাবতই উত্তেজিত। ২০শে—২১শে জুলাই রাত্রে জননিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি (Committee of General Security) দুটির অধিবেশন আরম্ভ হইল। অবশেষে গণপরিষদ ২৭শে জুলাই খাদ্যকাটকাবাজগণের বিরুদ্ধে একটি আইন পাশ করিল।৯

দৈনিক বিক্রয়ের প্রকাশ্য ব্যবস্থা না করিয়া সাধারণ বা অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের ব্যবসায়ীগণ যদি ইচ্ছাপূর্বক বেচাকেনা বন্ধ রাখে অথবা কোন লোক যদি স্বেচ্ছায় অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র নষ্ট করে বা নষ্ট হইতে সাহায্য করে তবে এই প্রকার কাজকে আইনের সজায় খাদ্য-কাটকাবাজী বলা হইল। যাহাদের নিকট এই সকল জিনিসপত্র থাকিবে তাহাদিগকে এক সপ্তাহের মধ্যে জিনিসের পরিমাণ ঘোষণা করিতে বলা হইল। খাদ্য-কাটকাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য পৌরসভাগুলিকে কমিশনার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। যাহেয়াপ্ত মাল বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইবে তাহা হইতে তাহাদিগকে বেতন দিবার ব্যবস্থা হইল। তাহারা মালের রিটার্ণ (যে কাগজে মালের পরিমাণ ঘোষণা করা হইয়াছে) পরীক্ষা করিবেন। ব্যবসায়ীগণ যাহাতে সকল বিক্রেতার নিকট অল্প পরিমাণে মাল বিক্রয় করে তাহারা তাহাও দেখিবেন। ব্যবসায়ীগণ বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে তাহারা নিজেরা বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয়মূল্য দিবেন। জিনিসপত্রের রিটার্ণ দাখিল না করিবার বা ভুল রিটার্ণ দাখিল করিলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আইন প্রয়োগ করিবার ভার যাহাদের উপর থাকিবে তাহারা প্রয়োগ করিতে অবহেলা করিলে তাহাদেরও মৃত্যুদণ্ড হইবে। যাহারা আইন অমান্যের সন্ধান দিবে তাহারাও যাহেয়াপ্ত মালের এক তৃতীয়াংশ পাইবে। এই আইনে দণ্ডিতদের কোন আপীল চলিবে না। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর এই ব্যবস্থার দ্বারা কঠোর নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত হইল। জননিরাপত্তা কমিটির

সহিত পরামর্শ না করিয়া গণপরিষদ সভা এই প্রকার আইন পাশ করায় প্রমাণিত হইল যে সভার উপর তখনও কমিটির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নাই।১০

গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্য সরবরাহের কোন উন্নতি হইল না। লেক্লের্ক (Leclerc) তাহার নূতন প্রতিষ্ঠিত কাগজে (Amidu peuple) হিংসার আশ্রয় লইবার জন্য পাঠকগণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। ৬ই আগষ্ট তারিখে গণ-পরিষদকে আক্রমণ করিয়া তিনি লিখিলেন: "নাগরিকগণ, গণপরিষদের সদস্যগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কারণ কি আছে? তোমরা সকল অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য ধার্য করিতে বলিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে কান দেয় নাই....."১১ উগ্র বিপ্লবীগণের সহিত প্যারিসে অবস্থানকারী ভূতপূর্ব জিরোদাঁগণ এবং রাজতন্ত্রের সমর্থনকারীগণ হাত মিলাইয়া খাদ্যসঙ্কটের সুযোগে প্রথমে প্যারিস কমিউন পরে গণপরিষদের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিল। দুই জায়গায়ই জাকোবাঁগণের অধিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।১২

গত বসন্তকালে ফেবার (Fabre) "প্রাচুর্যের গোলা" ("greniers d' abondance") জায়গায় জায়গায় খুলিবার জন্য একটি প্লান দাখিল করিয়াছিলেন। খাদ্যশস্যের অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। তবে ইহার চলাফেরায় (circulation) বাধা পাওয়ায় সকলের হাতে পৌঁছিতে পারে না। "প্রাচুর্যের গোলা" দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যাইবে। কৃষি এবং বাণিজ্য কমিটি ২৪শে এপ্রিল গণপরিষদের নিকট খাদ্যসমস্যা দূর করিবার জন্য যে তিনটি প্রস্তাব দিয়াছিল ইহা তাহাদের অন্যতম।১৩ বারের (Barere) এখন এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ৯ই আগষ্ট তারিখে গণপরিষদে একটি আইন পাশ করিয়াছিলেন। স্থির ফসল তুলিয়া প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক চাষী এই শস্য গোলায় কিছু ফসল রাখিবে। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টও দশ লক্ষ টাকা ধার দিবে। প্রত্যেক কমিউন (বিপ্লব যুগে সহর ও গ্রামের পৌরসভা) রুটিওয়ালাদের উপর তদারক করিবে দরকার হইলে তাহাদের রুটি সেঁকিবার উনুন হুকুমদখল করিবে। যাহারা কাজ বন্ধ করিবে তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। তবে এই আইন কাগজ কলমেই ছিল। খাদ্য কোথায়? তবে এই আইন পাশ করিয়া ক্ষুধাতুরকে কিছু আশা দেওয়া হইল।১৪

খাদ্যদ্রব্যাদির দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষপত্র পাওয়া কিছুতেই সহজ হইল না। আন্দোলনের চাপে প্রথম সর্বোচ্চ মূল্য ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সংশোধিত হইয়া একটি "সাধারণ সর্বোচ্চ মূল্য" ("general maximum") আইন পাশ

হইল। বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী হইল। কমপক্ষে উনচল্লিশটি জিনিসের দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইল।১৫ আলানী, তামাক, লবন ও সাবানের জন্য দেশের সর্বত্র একই মূল্য ধার্য করা হইল। কিন্তু প্রত্যেক জেলার উপর অন্যান্য জিনিসের মূল্য ধার্য করিবার ভার দেওয়া হইল। এই সকল জিনিসের মূল্য ১৭৯০ সালের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে বটে কিন্তু ঐ সাথে শতকরা তেত্রিশ ভাগ যোগ করিতে হইবে। মজুরের বেতনও ১৭৯০ সালের হার অনুযায়ী নির্দিষ্ট হইল কিন্তু তাহাতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যোগ হইবে। নির্দিষ্ট তালিকার হার অনুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকার করিলে মজুরের তিন দিনের কারাদণ্ড হইবে। জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হইবার পর ক্রেতা বা বিক্রেতা এই আইন মানিয়া না চলিলে উভয়কে জিনিসের মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা করা হইবে এবং সংবাদদাতা ঐ টাকা পুরস্কার পাইবে। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের নাম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পাইবে।১৬

এক আইনে খুচরা বিক্রেতাদের নূতন সমস্যা দেখা দিল। গভর্ণমেণ্টের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রকাশিত হইবার আগেই তাহারা বড় পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তখনকার বাজার দর অনুসারে মাল খরিদ করিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত অনেকে বিশেষ কিছু বিক্রয় করিতে পারে নাই। মূল্য তালিকা দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিল। কারণ যে মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে তাহা অপেক্ষা তাহাদের ক্রয়মূল্য অধিক ছিল। এইজন্য পড়তায় পোষায় না। সুতরাং এখন বিক্রয় করিবার অর্থ মোটা লোকসান। তারপর আরও এক বিপদ। কাঁচা মালের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না অথবা উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের বেতন কত দিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট ছিল না। এইজন্য মাল তৈয়ারী হইয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হইলে তাহার যে মূল্য নির্দিষ্ট হইবে তাহা উৎপাদন খরচ অপেক্ষা কম। এমন কি মূল্য তালিকা প্রকাশিত হইবার পর খুচরা বিক্রেতা যদি আইন মাফিক করিয়া মাল খরিদ করে বা করিতে বাধ্য হয় তবুও তাহার ক্ষতি। এইজন্য যাহারা ব্যবসা বন্ধ করিল না তাহারা অসৎ পথ ধরিল। নিকৃষ্ট যে জিনিস আইন মাফিক করিয়া সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া ভাল ভাল জিনিস তাহারা কালো বাজারে বিক্রী করিল।১৭

এই আইনে ১৭৯০ সালের স্থানীয় মূল্যের উপর এক তৃতীয়াংশ মূল্য যোগ করিয়া সর্বোচ্চ মূল্য তালিকা প্রস্তুত করা হইলেও পাইকারী বিক্রেতা খুচরা বিক্রেতার নিকট সর্বোচ্চ মূল্য দাবী করিতে পারিত কিন্তু তখন খুচরা বিক্রেতা

নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রী করিয়া কোন কাজ করিতে পারিত না। ইহার আর এক দিক ছিল। পাইকারী বিক্রেতা পুনরায় মাল খরিদ করিতে গেলে মুস্কিলে পড়িত। কারণ উৎপাদক সর্বোচ্চ দরে তাহার নিকট বিক্রয় করিত কিন্তু পরিবহন খরচের কোন উল্লেখ না থাকায় কোন পক্ষের নিকট ইহা আদায় করা যাইত না। সুতরাং এই আইনের সংশোধন করিয়া এক মাস পরে ১লা নভেম্বর (11th Brumaire) তারিখে একটি সংশোধিত আইন পাশ হইল। ইহাতে বলা হইল যে উৎপাদন কেন্দ্রে ১৭৯০ সালের মূল্যের ভিত্তির উপর এক তৃতীয়াংশ মূল্য যোগ করিতে হইবে তবে মাল পরিবহনের জন্য প্রতি তিন মাইল পিছু একটি হার (rate) ধার্য করিতে হইবে। ইহার উপর পাইকারী বিক্রেতাগণ শতকরা পাঁচ ভাগ এবং খুচরা বিক্রেতাগণ শতকরা দশভাগ লাভ আদায় করিতে পারিবে।১৮

গভর্ণমেন্ট আইন করিল বটে কিন্তু খোলা বাজারে যখন মালের অভাব থাকে তখন কোন আইন কাজ দেয় না। সর্বোচ্চ আইন অগ্রাহ্য করিয়া উচ্চ মূল্যে মাল বেচাকেনা হইত, যেমন আমাদের দেশে ঘাটতির সময় চলে। গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ফলপ্রসূ হইল না। আইনের নবম ধারা অনুযায়ী পৌরসভাগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু এই ক্ষমতা ফলপ্রসূ হইল না। কারণ খোলা বাজারে প্রায়ই মাল পাওয়া যাইত না। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা গুদামে মজুত মাল বিক্রী হইলে নূতন মাল গুদামজাত করিতে চাহিত না।১৯

আইন বাঁচাইয়া বহু অবৈধ বিক্রী চলিত। শুকরের কাঁচা মাংসের মূল্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। এইজন্য বহু দোকানে রান্না করা মাংস বেশ লাভে বিক্রী হইত। কারণ ইহার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কসাইগণ মৃত এবং দুর্ঘটনায় নিহত পশু খরিদ করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রী করিয়া মোটা লাভ করিত। তাহারা জীবিত পশু এমনভাবে হত্যা করিত যাহাতে যথেষ্ট রক্ত ঝরিয়া না পড়ে। ফলে মাংসের ওজন বেশি হইত। রুটি ওয়ালারা ওজন বেশি করিবার উদ্দেশ্যে রুটি ভাল করিয়া সেঁকিত না। তাহারা ভাল রুটি অবস্থাপন্ন ক্রেতার জন্য রাখিয়া গরীব খরিদ্দারের নিকট খারাপ রুটি বিক্রী করিত। ব্যবসায়ীরা মদ, লবন, মসলা এবং সকল প্রকার তালিকাভুক্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ভেজাল দিতে আরম্ভ করিল।

ভাল মাংস পাওয়া এক ভীষণ সমস্যা হইয়াছিল। জনমতের চাপে কসাইগণ ব্যবসা করিত বটে কিন্তু চালাকী বজ্জাতি না করিলে এ ব্যবসায়ে শুধু লোকসানই হইত। মাংসের কোন সাধু ব্যবসায়ী কোন দিন লাভ করিতে পারিত না। কসাইগণ নাড়িভুড়ি হাড়গোড় বেশি পরিমাণে বিশাইতে আরম্ভ করিল। মাংসের

মূল্য নিয়ন্ত্রিত থাকিলেও পশুদের ছিল না। নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৩—১৪ স্থ (১০০ সেণ্টিম = ১ লিভার ৫ সেণ্টিম—১ স্থ ; ১ পেনি=২ স্থ ; ১ স্থ=২$\frac{৩}{৪}$ নঃ পঃ—১৯৬৬ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর) থাকিলেও মাংসের জন্য কসাইদের পাউণ্ড পিছু ৩২ স্থ খরচ পড়িত। অত্যধিক মাংস খাওয়ার ফলে আর একটি সমস্যা দেখা গেল। পূর্বে ধর্মীয় বাধা নিষেধের জন্য শতকরা প্রায় ৬০ জন লোক প্রতি বছর ১৪১ দিন মাংস খাইত না। কিন্তু বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর যখন ধর্মের বন্ধন নিষেধ থাকিল না তখন প্রায় সকলেই প্রতি দিন মাংস খাইতে আরম্ভ করিল।২১ ইহার পর সৈন্য বিভাগের চাহিদা ছিল। প্রতি বছর বিপ্লবের পূর্বে সমগ্র দেশে মাংসের জন্য চার লক্ষ পশুর প্রয়োজন হইত। এখন শুধু সৈন্য বিভাগের জন্য বহু সংখ্যার প্রয়োজন ছিল।২২ উৎকৃষ্ট পশুচারণভূমি পশ্চিম অঞ্চলে থাকায় মাংসের জন্য প্রয়োজনীয় গবাদি পশু সেখানে বেশি পাওয়া যাইত। কিন্তু রাজা ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের পর লাভেণ্ডী প্রদেশ সহ সেখানে বিপ্লবের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ হওয়ায় গবাদি পশুর চালান বন্ধ ছিল।২৩ অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর রাইন সীমান্তের প্রদেশগুলিতে যুদ্ধ চলায় সেখান হইতেও মাংস পাওয়া বন্ধ ছিল। গবাদি পশু কম পাইবার জন্য কসাইগণ সুযোগ বুঝিয়া ভাল মাংস চড়া দামে ধনীদের নিকট বিক্রী করিয়া অন্যান্যদের নিকট খারাপ মাংস সর্বোচ্চ মূল্য আইনের দরে বিক্রী করিয়া আইন আংশিক মানিয়া চলিত। এই প্রকারে লোক-সান পোষাইয়া তাহারা লাভ করিত।২৪ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাংস পাওয়া প্রায় অসম্ভব হওয়ায় চড়াদামে সেচাকেনা হইলেও গভর্ণমেণ্ট তাহা উপেক্ষা করিত। তখন দেশ আক্রান্ত হইয়াছে। সৈন্যদের নামমাত্র বেতন। তাহাদের খাওয়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিজেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া বাজার দরে মাংস খরিদ করিতে আরম্ভ করিল।২৫

চাষী গবাদি পশু বড় না করিয়াই বিক্রী করিতে চাহিত। কারণ খাওয়াইয়া বড় করিয়া বিক্রী করিতে গেলে কয়েক বছর বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু তখনই ছোট পশু বিক্রী করিলে লাভ কম নয়। তারপর পালন করিবার খরচ নিরর্থক এবং লোকসানজনক। ইহার উপর হুকুম দখলের সব সময় ভয়। হুকুমদখল করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে গবাদিপশু সর্বোচ্চ মূল্যে খরিদ করিত তাহাদের পরিবর্তে পালন করিবার জন্য নূতন পশু সংগ্রহ করিতে গেলে গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রী করিয়া চাষী যে টাকা পাইত তাহাকে তাহার কয়েক গুণ বেশি টাকা খরচ করিতে

হইত। এই জন্য পশুপালনে ভাঁটা পড়িল। ইহার ফলে বাজারে চাষের উপযুক্ত বয়স্ক গবাদি পশু অল্প হওয়ায় চাষী প্রয়োজন অনুযায়ী খরিদ করিতে না পারায় চাষবাসের ভীষণ ক্ষতি হইল।২৬

প্যারিসে বহু চোরাবাজার গজাইল ; সহরতলীতে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। শাকসব্জী, ফল, ডিম, মাংস, মাছ খোলা বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইল। একটি আঁধা কপি প্রায় কুড়ি ফ্রাঁ দামে বিক্রী হইত। তখনকার সময়ে ইহা কল্পনাতীত দাম। প্যারিসের বাজারে পৌঁছিবার আগেই খরিদ্দারগণ রাস্তায় গিয়া শাকসব্জীর গাড়ী থামাইয়া যে কোন দাম দিয়া খরিদ করিত। বড়লোকগণ গ্রাম অঞ্চলে লোক পাঠাইয়া আইন সঙ্গত সর্বোচ্চ মূল্যের অধিক দিয়া দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিয়া আনিত। সাধারণ লোকগণ এই সকল লোকের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল। অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা চলিল। প্যারিস কমিউন নিয়ম করিল যে কসাইগণ খরিদ করিবার উদ্দেশ্য পথে গবাদি পশু দেখিতে যাইবে না বা নির্দিষ্ট বাজারের বাহিরে খরিদ করিতে পারিবে না। আরও নিয়ম করিল যে নির্দিষ্ট কসাইখানার বাহিরে গবাদি পশু হত্যা করা যাইবে না এবং মাংস সেখানেই বিক্রী করিতে হইবে ; বাজারের পথে কৃষকগণকে কেহ থামাইতে পারিবে না। চাষীরা সহরে মাল আনিয়া পুলিশের নির্দেশে চলিবে এবং আনীত মাল সকল বাজারে সমানভাবে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কসাইখানার আগে গিয়া লাইন করিয়া দাঁড়াইবার জন্য বহু লোক রাত্রি তিনটার সময় বিছানা ছাড়িয়া উঠিত। ইহা বন্ধ করিবার জন্য প্যারিস কমিউন আরও নিয়ম করিল যে সকাল ছয়টার আগে কেহ কসাইখানায় যাইতে পারিবে না।২৭

কিন্তু নিয়ম করিয়াও কোন ফল হইল না। লাইনে দাঁড়াইবার জন্য সকাল ছয়টার অনেক আগেই কসাইখানায় ভীড় হইত। রুটির দোকানে যেমন একটি দড়ি লম্বালম্বি টানাইয়া দেওয়া হইত মাংসের দোকানেও তেমনি টানাইয়া দেওয়া হইত। ক্রেতারা একজনের পর একজন আসিয়া হাত দিয়া ঐ দড়ি ধরিত। কেনাবেচার সময় যাহাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে তাহার জন্যই এই নিয়ম করা হইয়াছিল। কিন্তু দুষ্ট লোক যদি ঐ দড়ি কাটিয়া দিত তবে গোলমালের সৃষ্টি হইয়া মারামারি বাধিত। পাঠক। আমাদের দেশের রেশন দোকানের লাইনের কথা মনে করুন।২৮

শাকসব্জীর সরবরাহ আরও বেশি করিবার জন্য প্যারিস কমিউন আর একটি ব্যবস্থা করিল। সহরের সীমানার মধ্যে বহু খোলা জায়গা ছিল। এক সাঁ জারমেন (Saint Germain) এলেকায়ই খোলা জায়গার সংখ্যা নেহাত কম ছিল

না। উগ্র বিপ্লবীদল এই জায়গাগুলিতে শাকসব্জী চাষের প্রস্তাব করিল। কমিউন ইহাতে রাজী হইল। উগ্র বিপ্লবীদল ইহাতেও খুশী না হইয়া শাকসব্জীর অভাবের জন্য অভিজাতগণকে পরোক্ষ দায়ী করিল। কারণ তাহারা প্যারিস সহরে না থাকিলেও নিকটেই থাকিত। হাতে নগদ টাকা থাকায় তাহারা সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া শাকসব্জী খরিদ করিতে পারিত। কমিউন-এর নিকট কয়েকটি নির্বাচনী জেলা (আইন সভায় নির্বাচনের জন্য প্যারিস সহর কয়েকটি নির্বাচনী জেলায় বিভক্ত ছিল) প্রস্তাব করিল যে অভিজাতগণকে সহরে ফিরিয়া আসিয়া বসবাসের জন্য কমিউন হয় প্রস্তাব গ্রহণ করুক, না হয় আইন পাশ করুক। কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া কমিউন নেতা শামেট (Chaumette) রাজী হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে সহরে ফিরিয়া আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া তাহাদিগের উপর নজর রাখিবার জন্য সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন।২৯

সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সর্বোচ্চ মূল্য আইন পাশ হইবার পর ধনিক শ্রেণী আতঙ্কিত হইয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে মজুত করিতে আরম্ভ করিল। সাঁ জুষ্ট-এর (Saint Just) মতে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইলে জিনিসপত্রের মূল্য কমিয়া যায়। ফলে ধনীরা প্রয়োজনের দ্বিগুণ খরিদ করে।৩০ ১৪ই অক্টোবর প্যারিস কমিউন-এর নিকট এক বক্তৃতায় দেশের বর্তমান আর্থিক দুর্গতি এবং জিনিসপত্রের অভাবের জন্য শমেট (Chaumette) ঠিকাদার এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে দায়ী করিলেন। ধনীদের বিরুদ্ধে শ্রোতাগণকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে রুশোর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহার বক্তৃতা শেষ করিলেন : "জনসাধারণের খাইবার জন্য যখন আর কিছু থাকিবে না তখন তাহারা ধনলোকগণকে খাইবে।"৩১

সর্বোচ্চ আইনকে অগ্রাহ্য করিয়া অনেকেই বেচাকেনা করিত। চাষী বাজারে মাল না আনিয়া প্রায়ই নিজ বাড়ীতে মাল বিক্রী করিত।৩২ সে গভর্ণমেণ্টের নিকট মিথ্যা কথা বলিত। শস্য ঘরে নিয়াও মাড়াই করিতে চাহিত না ; কৈফিয়ত দিত যে মজুরের অভাব। এই কৈফিয়ত আংশিক সত্য। কারণ পূর্বোদ্যমে যুদ্ধ করিবার সময় সৈন্যবাহিনীতে পনের লক্ষ লোক ছিল এবং সকলেই সুস্থ ও সবল। আরও কৈফিয়ত দিত যে ফসল ভাল হয় নাই।৩৩ ১৭৯৪ সালের মার্চ হইতে দেশের সর্বত্র একই হারে খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে উৎপাদন খরচ এক নয় ; জমির উর্বরতা অনুযায়ী ফলনও কম বেশি হয়। সুতরাং বিক্রয় মূল্য একই হওয়ায় বহু জায়গায় চাষীর ক্ষতি হইল।

প্রত্যেক পৌরসভার উপর জিনিস পত্রের মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকায় আর এক অসুবিধা দেখা দিল। যে পৌরসভার এলেকায় যথেষ্ট জিনিসপত্র কম ছিল সে পৌরসভা মূল্যবৃদ্ধি করিল। তখন নিকটবর্তী পৌরসভা অঞ্চলের (এখানে দাম অপেক্ষাকৃত কম ছিল) ক্ষতি করিয়া বহু বিক্রেতা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঐখানে আনিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিল। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের গতি কিছুতেই স্বাভাবিক ছিল না।৩৩

আইনভঙ্গের বেশি মামলা আদালতে আসিত না। সাধারণতঃ মাল বাজেয়াপ্ত করাই এই প্রকার অপরাধের শাস্তি ছিল। চোরাকারবারীগণের গোপনে বহু প্রকার অবৈধ ব্যবসা চলিত। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ মাংস, ডিম এবং মাখন নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খরিদ করিয়া গোপনে বাড়ীতে গিয়া বেশি দামে বিক্রী করিত। তাহাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অসুবিধা ছিল। ১৭৯৩ সালের শরত কাল হইতেই এই কলা ও কারবার আরম্ভ হইয়াছিল।৩৫

প্রয়োজনের তাগিদে গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই মরিয়া হইয়া অবিবেচিত কাজ করিত। ১৭৯৪ সালের ২৪ জুন গভর্ণমেণ্ট একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়া ঘোষণা করিল যে দেশের এবং সৈন্যদলের প্রয়োজনে সকল মুতন ফসল হুকুমদখল করা হইবে। জননিরাপত্তা কমিটির প্রতিনিধিগণ এই জুন মাসে তিনটি প্রদেশের সকল খাদ্যশস্য হুকুমদখল করিলে কমিটি উহা সমর্থন করিল। এই প্রকার দায়িত্বহীন এবং ঢালাও হুকুম-দখলের বিরুদ্ধে নভেম্বর মাসে কনভেনশান সভা প্রতিবাদ করিল।৩৬

গভর্ণমেণ্ট নিজেও আইনভঙ্গ করিত। একটি সাবানের কারখানা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়ন্ত্রিত হার অপেক্ষা বেশি মূল্যে সাবান বিক্রী করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। সর্বোচ্চ মূল্য আইনে বিক্রী করিবার ফলে ঠিকাদারগণের কখনও কখনও ক্ষতি হইলে গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিত।৩৭

১৭৯২ সাল হইতে কয়েক বছর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল। গভর্ণমেণ্ট হুকুমদখল করিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীকে খাওয়াইতেছিল কিন্তু প্যারিস এবং অন্যান্য বড় সহরে খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং চাষী এবং ব্যবসায়ীগণের নিকট হুকুমদখল করিয়া গভর্ণমেণ্ট বড় বড় সহরগুলিকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এইজন্য চাষের খরচ অপেক্ষা কম মূল্যে জিনিস-পত্র বিক্রী করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট চাষীকে বাধ্য করিয়াছিল। চাষীও তখন মরিয়া হইয়া চাপ এড়াইবার ফাঁক খুঁজিত। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইত। গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিত না।

সুতরাং সমস্যা ব্যাবস্থা ভাল না থাকায় একাধিক বিভাগ সৈন্যদের জন্য একই জিনিসের হুকুমদখলের দাবী জানাইতেছিল। গভর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রতিনিধিগণ হস্তক্ষেপ করিয়া এই প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিতেন। বর্ত্তমান বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টের সকল স্তরের কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রায় সকলেই নূতন লোক। রাজত্বে তাহারা বিরোধী দলে থাকিয়া শুধু সমালোচনাই করিতেন। তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না; বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর দায়িত্ব পাইয়া ঠেকিয়া শিখিতেছিলেন। কিন্তু যতই দোষ থাকুক তাহাদের প্রবর্ত্তিত হুকুম-দখল দেশের লোক এবং সৈন্যদের খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।৩৮

জিনিসপত্রের অভাব লাগিয়াই ছিল। উৎপাদন করিতে যে খরচ হইত তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রী করিতে গভর্ণমেণ্ট যতদিন বাধ্য করিত ততদিন চাষী মরিয়া হইয়া মাল ঘরে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। যাহাদের হাতে টাকা থাকিত তাহাদের অনেকটাই বাজারে পাওয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রয় করিত। যে সকল জিনিসের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাহাদের মূল্য কয়েক গুন বেশি হইত, বাজারেও শীঘ্রই অমিল হইত। দুধের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মূল্য চারগুণ বেশি হইয়াছিল।৩৯

ভোগ্য এবং খাদ্যবস্তু উভয়ের গুণ ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। মমীর নামে দুধ বিক্রী হইত। দামাসে কেনা হইত না। পোষাকের কাপড় অত্যন্ত খারাপ হইল। রুটির গুণের কথা আর না বলাই ভাল। দেশবাসী রুটির গুণাগুণ বিচার করা বন্ধ করিল। বাজারে গিয়া প্রায় প্রত্যেক জিনিস ক্রয় করিবার জন্য ক্রেতাগণকে লাইনে দাঁড়াইতে হইত। তাহারা দোকানদার-গনের অত্যন্ত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেন। জিনিসপত্র ক্রয় করিতে গিয়া দীর্ঘকাল লাইনে দাড়াইতে সকলেই বিরক্ত হইলেন। বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রেতাগণকে এই দুর্ভোগ পোহাইতে হইত।৪০

এই আইনের ফলে সংক্ষেপে বলা যায়: (১) দুই প্রকারের বাজারের আবির্ভাব হইল; একটি প্রকাশ্য এবং আইন সম্মত। অন্যটি গুপ্ত অর্থাৎ কালো বাজার বা চোরা বাজার। প্রকাশ্যবাজার ব্যবসায়ীগণ অতি খারাপ জিনিস কম পরিমাণে বিক্রী করিত। গুপ্ত বাজারে উচ্চ মূল্যে উৎকৃষ্ট জিনিস বিক্রী হইত। (২) সরকারী কর্ম্মচারীগণকে হুকুম-দখল করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলেও চাষীগণ তাহাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্য প্রায়ই গোপনে মজুত করিতে সক্ষম হইত। (৩) কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হইল। কারণ গভর্ণমেণ্ট নির্দিষ্ট

উৎপাদন-মূল্য অপেক্ষা উৎপাদন-খরচ বেশি পতিত।৪ প্রত্যেক ব্যবসায়ে দুই প্রকার লেনদেন হইত, প্রকাশ্য এবং গুপ্ত। গুপ্ত লেনদেনের পরিমাণ খুব বেশি ছিল। দুই প্রকার রুটি, দুই প্রকার মাংস, দুই প্রকারের প্রত্যেক জিনিস। উচ্চ মূল্য দিতে পারিবার জন্য ধনী সম্প্রদায় ভাল জিনিস গুপ্ত লেনদেনের মারফত পাইত। কাগজী মুদ্রায় নির্দিষ্ট আইন সঙ্গত মূল্য দিবার জন্য অন্যান্য শ্রেণীর লোকজন প্রকাশ্য বাজারে খারাপ জিনিস পাইত।৪১

এই আইন পাশ হইবার কিছু পরে শীতকাল আরম্ভ হইয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া যে শীত চলিল তাহা শতাব্দীর তীব্রতম। ১৭৮৮-৮৯ সালের প্রচণ্ডতা ইহার নিকট ম্লান। শীতের ফলে বহু জায়গায় জল জমিয়া এত শক্ত হইয়াছিল যে ফরাসী সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়িয়া নদী পার হইয়া সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দুর্গগুলির একাধিক বন্দর দখল করিতে পারিয়াছিল। এই বছর নানা কারণে দেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল। শস্য বুনিবার কিছু কাল পরে মনে হইল যে বেশ ভাল ফসল হইবে। কিন্তু প্রথমে খরা পরে বৃষ্টির জন্য সকল আশা ব্যর্থ হইল। ফসল মাড়াই করিবার লোকের অভাব যেমন ছিল তেমনি চাষীদের মধ্যে ফসল ধরিয়া রাখার মনোভাব ছিল। প্রতিদিন কাগজী মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইতেছিল; কোথাও কোথাও শতকরা দশভাগে নামিয়াছিল। এই অবস্থায় সর্বোচ্চ আইন অগ্রাহ্য করিবার মনোভাব সার্বজনীন হইল। চাষী যে সর্বত্র মিথ্যা কথা বলিত ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আইন অগ্রাহ্য করিবার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পৌরসভাগুলির পরোক্ষ সহায়তা ছিল। রোবস্‌পীয়ার-এর গিলোটিনের পর সন্ত্রাসের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। পৌরসভাগুলির কাজকর্ম পুরাদমে চলিতেছিল। রোবসপীয়ার-এর পতনের পর জাকোবাঁগণের উচ্ছেদ হইয়া নূতন নির্বাচনে মধ্যমপন্থীরা নির্বাচিত হইয়াছিল। তাহারা বিপ্লবাত্মক আইনগুলি অগ্রাহ্য করিতে সমর্থন করিত। সর্বত্র শাসনযন্ত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রাস বন্ধ করায় বড় পৌরসভা এবং সৈন্য বিভাগের জন্য হুকুমদখল ব্যর্থ হইল। ইহার জন্য প্যারিস সর্বাপেক্ষা বেশি ফলভোগ করিল। রোবস্‌পীয়ার-এর পতনের সময় (২৭শে জুলাই 9th Thermidor) প্যারিস কমিউন জনজেনশান আইন সভার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় ইহাকে নূতন গভর্ণমেণ্ট ভাঙিয়া দিয়াছিল। ইহার পর শহরের সরবরাহের তদারক ব্যবস্থা প্যারিস কমিউন-এর পরিবর্তে বাণিজ্য এবং সরবরাহ কমিশানের উপর বর্তাইল। ইহার ফলে প্রথমে সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অত্যন্ত দেরী করিয়া আদেশ জারী

করা হইতেছিল। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইল। যাহাও বা পাওয়া গেল, পরিবহনের অসুবিধায় প্যারিসে তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা গেল না; কারণ ঘোড়া অধিক হইল, মাল ভর্তি গাড়ী টানিবার কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং প্যারিস নিয়মিত সরবরাহ পাইল না। এই অবস্থার মধ্যে জ্বালানীর অভাব হইল। নদী খালের উভয় তীরে লোকজনের বাস সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ীগণ শীতকালে যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ সহরে আনিয়া মজুত করিতে পারে নাই। হাতে ক্ষমতা পাইয়া ক্ষমতাশীল দল তাহাদের শত্রু আকোর্ঘ্যাগণের উপর সকল দোষ চাপাইল। কারণ ক্ষমতা থাকিতেও তাহারা নাকি প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। সব দেশে সব কালে ব্যর্থতার জন্য পূর্বতন গভর্ণমেন্টকে দায়ী করা হয়। শত্রু পক্ষ বর্তমান গভর্ণমেন্টকে প্রতিবিপ্লবী বলিয়া নিন্দা করিয়া কৃষকগণকে উত্তেজিত করিয়া রটাইল যে তাহাদের কষ্টের ফসল ব্যবিলা এবং সরবরাহ কমিশনের গুদামে পচিবে। কারণ অনাহারে রাখিয়া জনসাধারণকে এই ভাবে রাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য করাই গভর্ণমেন্টের মতলব। সাধারণ লোকজন সরল। তাহাদিগকে বুঝান কঠিন নয় যে খাদ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হইলে সকলেই বর্তমান গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করা বন্ধ করিবে। এই মিথ্যা প্রচার চাষী বহু জায়গায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবিলা ও সরবরাহ কমিশনকে শস্য দেওয়া বন্ধ করিল। শত্রুপক্ষ ছোট পৌর সভা অঞ্চলে প্রচার কার্য শেষ করিয়া বড় পৌরসভা অঞ্চলে গিয়া বর্তমান দুঃখ দুর্দশার জন্য নূতন গভর্ণমেন্টকে দায়ী করিয়া প্রবল প্রচার কার্য চালাইল। তাহারা সফল না হইলেও সন্ত্রাসের রাজত্বের সময়ও রুটির এত অভাব হয় নাই তাহা বহু লোক স্বীকার করিল।৪২

১৭৯৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর গণপরিষদে প্রকাশ পাইল যে নিয়ন্ত্রণের ফলে বহু দালাল শ্রেণীর লোক অবস্থার উন্নতি করিতেছে। আরও প্রকাশ পাইল, এক এক স্থানে মূল্য এক এক প্রকার। যেখানে প্রচুর জিনিস তাহার নিকটে হয়ত ঐ জিনিসের ঘাটতি আছে। সর্বত্র বেচাকেনায় অনেক জালজুয়াচুরি ঢুকিয়াছে। কলকারখানায় বহু পরিমাণে উৎপন্ন কয়েক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিবার জন্য কাঁচামালের নিয়ন্ত্রিত মূল্য অনেক কম। এইজন্য এই প্রকার জিনিসপত্র তৈয়ারী করিয়া কারখানার মালিকদের খুব লাভ হইত। কিন্তু এই প্রকার উৎপন্ন জিনিস পত্রের মূল্য যদি নিয়ন্ত্রিত থাকিত তবে মালিকরা বেশি লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু কারখানার লাভলোকসানের

আর একটা দিক ছিল। কারখানায় উৎপন্ন অনেক নিয়ন্ত্রিত জিনিসের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং শ্রমিকদের জন্য খরচের হার ১৭৯৪ সালে অনেক বেশি হইয়াছিল। আইন পাশ হইবার পর প্রতিটি জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সৈন্যেলিক যুদ্ধ, এবং ক্রমাগত বেশি পরিমাণে কাগজী মুদ্রা ছাপা, এই তিনটি কারণে প্রতিটি জিনিসের মূল্য এক বছর ধরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু আইনে মূতন উৎপাদন ব্যয় বিচার করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্য লোকসান দিতে বাধ্য হইয়া মালিক কারখানা বন্ধ করিয়া দিল। বহু ব্যবসায়ীও ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিল। বিদেশী জিনিস আমদানী করিতে জলপথে পরিবহন খরচ টন প্রতি ১০০ ফ্রাঁ হইতে ৪০০ ফ্রাঁ এবং বীমা খরচ শতকরা ৫ বা ২ ভাগ হইতে ৩০ বা ৬০ ভাগ পর্যন্ত বেশি হইয়াছিল। সর্বোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট হইবার পর এই অতিরিক্ত খরচ দিয়া নির্দিষ্ট মূল্যে কিছুতেই লাভ রাখিয়া বিক্রী করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীরা বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ করিল। হুকুমদখল অত্যধিক হওয়ায় ইহার কোন শুভ ফল দেখা গেল না। আরও প্রকাশ পাইল যে নিয়ন্ত্রণমূল্য অগ্রাহ্য করিয়া সরকারী ও বেসরকারী ক্রেতা ক্রয় করিবার জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকায় দুর্নীতি ঢুকিয়াছে। সর্বোচ্চ মূল্য কম হওয়ার ফলে অত্যধিক ক্রয় হইতেছে কিন্তু ইহার ফাঁকে বহু আইন অমান্য হইতেছে।৪৩

জিনিস পত্র দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইবার জন্য প্যারিস এবং প্রধান প্রধান সহরগুলিতে বহু দোকান বন্ধ হইয়াছিল। অভিজাত এবং পুরোহিতগণ গিলোটিনের প্রথম শিকার হইয়াছিল। এইজন্য তাহাদের নিকট গিলোটিন ভীতির বস্তু হইল। বিপ্লবে ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের অবদান কম নয়। তাহারা প্যারিস এবং অন্যান্য জায়গায় বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল। এই কথা উল্লেখ করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ থিয়ের মন্তব্য করিয়াছেন যে বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য অবদান সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ আইন অবিশ্বাস এবং ভীতির সঞ্চার করিল।৪৪ মাথিয়ে বলেন যে এই আইন ছোট ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের (artisans) পেশা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বেতনভুক মজুরের পর্যায়ে নামাইয়াছিল। যে সকল কটিওয়ালা সরকারী সমর্থন পাইত তাহারা পৌর সভার কর্মচারী মাত্র হইল।৪৫

ঐতিহাসিক থিয়ের এই সময়ের মূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যবসাবাণিজ্যের একটি বেদনাজনক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বর্তমানে চাষের প্রয়োজনে চাষী কত খরচ করে

এবং পূর্ব্বে কত খরিত তাহা লিখিয়াছেন (এখানে চাষীর পূর্ব্বের খরচ দ্বিতীয় বন্ধনীর [ ] মধ্যে দেওয়া হইল।) চাষী লাঙলের জন্ত ৩০ ফ্রাঁ (টা ১৬'৫০) [৫০ সু=টা১'৩৭] গৃহভাড়ার জন্ত ৭০০ ফ্রা (টা ৩৮৫'০০) [১০০ ফ্রাঁ=টা ৫৫.০০] দিন মজুরের জন্ত ১০ ফ্রাঁ (টা ৫'৫০) [৫০সু=টা ১'৩৭] খরচ করে। ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দিবার জন্ত এই সময় বিদেশ হইতে আমদানী কাঁচা মালের উপর সর্ব্বোচ্চ আইন প্রয়োগ করা হইত না। দেশে ইহার দ্বারা যে মাল তৈয়ারী হইত তাহার উপর সর্ব্বোচ্চ আইন এইজন্ত প্রয়োগ করা হইত না। যদি হইত তবে তৈয়ারী মালের বাজার দর অপেক্ষা আট দশ গুণ কম মূল্য নির্দিষ্ট করিতে হইত। এই মাল বিক্রী করিয়া অসীম মুনফা হইত। সর্ব্বোচ্চ মূল্য আইন দোকানদার, যন্ত্র সাহায্যে অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদনকারী এবং চাষী সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। এজন্ত দোকান এবং কারখানাগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকিত। চাষী তাহার ফসল বিক্রী না করিয়া নিজে খাইত বা শূকর এবং মুরগীকে খাওয়াইত। ইহাতে তাহারা মোটা হইবে; অল্পকাল পরে বিক্রী করিলে অনেক লাভ। বিয়ের এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তখন মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে হয়ত সহজে জিনিসপত্র পাওয়া যাইত। কারণ এই সময় যাহারা পয়সাকড়ি দিয়া জিনিসপত্র কিনিত তাহারা প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ বাজার দরে খরিদ করিত; সর্ব্বোচ্চ আইন আশ্রয় লইত না। তখন ক্রেতার বাজার নয়, বিক্রেতার বাজার। হয় চড়া দাম দেও, নতুবা কিছুই পাইবে না। বাজারে যখন মালের অভাব থাকে তখন গভর্ণমেণ্টের হুকুমদখল দ্বারা তাহা পূরণ হয় না; অবাধ বেচাকেনাই একমাত্র প্রতিকার। সর্ব্বোচ্চ আইনের উচ্ছেদ হইলে এবং ব্যবসায়ী আমদানী মালের মূল্যের উপর বীমা এবং পরিবহন খরচ, মূলধনের সুদ এবং উপযুক্ত লাভ করিতে পারিলে বাজারে মালের অভাব হইবে না। তখন যে কোন দেশ হইতে ব্যবসায়ী মাল আমদানী করিবে।৪৬

জুলাই মাসে (5 Thermidor) প্যারিস কমিউন নূতন সর্ব্বোচ্চ দৈনিক মজুরীর হার ঘোষণা করিলে অসন্তোষ ফাটিয়া পড়িল। রোব্‌স্‌পীয়ার-এর পতনের দিন (9 Thermidor) হাতমিস্ত্রী এবং যোগলগণ কাজ বন্ধ করিবার জন্ত আলোচনা করিল। দৈনিক মজুরীর হার সংশোধনের দাবীতে গ্লাস ও প্রেত এ একদল মজুর শোভাযাত্রা বাহির করিল। রাত্রি বেলায় প্যারিস কমিউন সুধাই দৈনিক মজুরীর হারের দাবিত্ব বারের (Barer)-এর উপর চাপাইল।

কিন্তু "সর্বোচ্চ আইন জয়ী হোক" এই ধ্বনি ছড়াইয়া পড়িল, কিছুতেই রদ হইল না।৪৭

জুলাই মাসে (১৭৯৭) কাগজী মুদ্রার বাজার মূল্য শতকরা ৩৪ ভাগ ছিল। আগষ্ট মাসে হ্রাস পাইয়া ইহা ৩১ ভাগ, নভেম্বর মাসে ২৪ ভাগ, এবং পর বছর (১৭৯৩) ফেব্রুয়ারী মাসে ১৭ ভাগ এবং মে মাসে মাত্র ৭½ ভাগ দাঁড়াইল।৪৮

রোব্‌স্‌পীয়ার-এর পতনের পর নূতন শাসক গোষ্ঠি সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক ঠিক চালু রাখিতে পারিল না বা জিনিসপত্রের দাম কমাইতে পারিল না। এই জন্য অক্টোবর মাসে (১৭৯৪) সর্বোচ্চ মূল্য আইনের সংশোধন করিয়া ১৭৯০ সালে যে দাম ছিল তাহার উপর দুই তৃতীয়াংশ বেশি দাম দাবী করিবার অনুমতি বিক্রেতাকে দেওয়া হইল। ইহার পর আইন ভঙ্গের শাস্তি কম করা হইল। বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দিবার জন্য আমদানী মালের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইল।৪৯ তবে এই সুবিধা বা শিথিলতা শুধুমাত্র আমদানী করা কাঁচা মাল সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্য এবং উপনিবেশজাত সকল প্রকার জিনিসও এই সুবিধা পাইবে। ইহাদের উপর হুকুমদখল রদ হইল। সমুদ্রে লুট করা শত্রুপক্ষীয় যে সকল মালপত্র বন্দরে রাখা হইয়াছিল (এতদিন পর্যন্ত এই জিনিসগুলি অবিক্রীত ছিল) তাহারাও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইল এবং তাহাদের উপর হুকুমদখল চলিবে না, গণপরিষদ (Convention) আইন সভা এই দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। সুতরাং ব্যবসায়ীগণ এখন হইতে আমদানী মালের জাহাজ ভাড়া, বীমা খরচ আদায় এবং ইচ্ছামতো লাভ করিবার অধিকার পাইল, যদিও সীমিত অধিকার। একমাত্র সরবরাহ কমিশনকে হুকুমদখল আদেশ জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল তবে কোন জিনিসের সম্পূর্ণ পরিমান অথবা কোন প্রদেশের সম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য কমিশান গ্রহণ করিতে পারিবে না। জিনিসটির মূল্য, পরিমাণ, ছাড় করিবার সময় এবং গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া আদেশপত্রে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। নিকটতম জেলার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হুকুমদখল করিতে হইবে। তবে সৈন্যগণের খাদ্যাভাব ঘটিলে অথবা তাহারা দ্রুত কুচ করিয়া চলিলে কমিশন ব্যতীত একমাত্র সৈন্য বিভাগের প্রতিনিধিগণকে হুকুমদখল করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সর্বোচ্চ আইনের জন্য সৈন্যদের রসদ ইত্যাদির ব্যয় অনেক কম ছিল, গভর্ণমেণ্টের টাকাও বাঁচিত। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের অভাবের জন্য মানুষের দুর্গতির সীমা ছিল না। তবুও ১৭৯৪ সালের

শরৎকালে দাম বেশি হইলেও বাজারে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পাওয়া যাইত।৫১

কিন্তু অক্টোবর মাসের সংশোধিত আইন কিছুতেই সফল হইল না। ডিসেম্বর মাসে কৃষি এবং বাণিজ্য কমিটির এক অধিবেশনে গেরো(Garaud) প্রচলিত ব্যবস্থার উপর তীব্র আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিলেন অত্যধিক কাগজী মুদ্রা ছাপাইবার ফলে সাধারণ উচ্চমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বিশেষ বিশেষ জিনিসের উচ্চ মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া দেন। দাম মজুত করিবার বিরুদ্ধে আইনের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে এই আইনের জন্য নাগরিক তাহার স্বাভাবিক পেশা ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রচলিত সর্বোচ্চ মূল্য আইনের নিন্দা করিয়া তিনি দেখাইয়া দেন যে ইহার জন্য লোকজন বেশি খরচ করিতেছে। কারণ বেতন বা আয় মুদ্রাস্ফীতির জন্য বেশি, এ জন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বেশি। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকসান হওয়ায় ব্যবসায়ীগণ নূতন মাল বাজারে আনিতেছে না। হুকুমদখলের জন্য বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে গভর্নমেন্টের নিকট চাষী যে দরে গবাদি পশু বিক্রী করিতে বাধ্য হয়, নিজ প্রয়োজনে তাহাকে দুই তিনগুণ বেশি মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। এই জন্য চাষী পশুপালনে অনিচ্ছুক। এ জগতে কেহই লোকসান দিতে চায় না। তিনি আরও নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে সমাজের বর্তমান অবস্থায় সর্বোচ্চ মূল্য আইন ক্ষতিকর। ইহার উচ্ছেদের জন্য প্রস্তাব করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।৫২

গেরোর প্রস্তাব গণপরিষদে আলোচিত হইলে কয়েকজন সদস্য আরো মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু এই আইন সত্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা বুঝিতে পারিল। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় সদস্যগণের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল। তাহাদের ধারণা হইল যে ইহার জন্য আরও অরাজকতা সৃষ্টি হইয়া তাহাদেরই উচ্ছেদ ঘটিতে পারে। কারণ জনমত তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে। অধিকাংশ ভোটের জোরে গণপরিষদ ২৩শে ডিসেম্বর (১৭৯৪) সর্বোচ্চ আইন কার্যতঃ উঠাইয়া দিয়া দেশে খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দিল। তবে যে সকল হুকুমদখলের আদেশ আগেই দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি বহাল থাকিল। সৈন্য বিভাগের জন্য বাণিজ্য এবং সরবরাহ কমিটি বাজার দরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিবার অগ্রাধিকার পাইল। প্যারিস সহরে প্রতি পাউণ্ড রুটির মূল্য ৩সু নির্দিষ্ট রাখা হইল। কিন্তু ইহার উপর কোন প্রকার

নিয়ন্ত্রণ থাকিল না। বেশনের মাংসের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৪ সু নির্দিষ্ট হইল তবে খোলাবাজারে যে মাংস বিক্রী হইবে তাহার উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। খোলা বাজারে অবাধ বেচাকেনা চলিবে এবং ইহা আইন সঙ্গত হইল।৫৩

এই সময় গণপরিষদ আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। বাণিজ্য এবং সরবরাহ কমিটির নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া সরবরাহ কমিটি বা কমিশন Commission of Supplies) নাম হইল। পাঁচজন ডিরেক্টরের পরিবর্তে ইহাতে তিনজন ডিরেক্টর এবং দশ হাজার এজেণ্ট এর পরিবর্তে মাত্র কয়েক শত নিযুক্ত হইল। পরিচালনা ব্যবস্থার অধিকাংশ কাজ ঠিকাদারগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা এতদিন পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিবার অনুমতি পান নাই, এখন পাইলেন। খাদ্য দ্রব্যের অবাধ চলাচল এতদিন নিষিদ্ধ ছিল; কারণ ব্যবসায়ীরা ইহা নিয়া বিদেশে চলিয়া যাইত। এই নিষেধ এখন বাতিল করা হইল। এতদিনে লোকজন বুঝিতে পারিল যে বৈদেশিক বাণিজ্য অচল হইলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যও ভাল চলে না। আরও বুঝিতে পারিল যে বিদেশীরা সোনা বা রূপা না পাইলে কোন জিনিস বিক্রী করিবে না। দেশে মজুত খাদ্য মুদ্রার পরিমাণ কম নয়। ব্যবসায়ীরা বিদেশে মাল কিনিবার উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ টাকা পাঠাইবে সমমূল্যের জিনিসপত্র যাহাতে আমদানী হয় তাহার উপর গভর্ণমেণ্ট নজর রাখিল। বিদেশে আত্মসমর্পণকারী ব্যবসায়ীদের পকেট যাহাতে এই টাকায় না ভরে সেজন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল।৫৪

মাথা পিছু দৈনিক এক হইতে দেড় পাউণ্ড রুটি সরবরাহ করা হইবে, ইহাই আইন হইল। কিন্তু রুটির অভাব থাকায় কার্যতঃ আধ পাউণ্ডের বেশি দেওয়া হইত না। মাংসের খরচ ফেব্রুয়ারী মাসে (১৭৯৫) ২১৫০ বস্তা হইল কিন্তু আগের বছর প্রতি মাসে গড়ে ১৮০০-১৮৫০ বস্তার বেশি হইত না। লোক সংখ্যা যে বেশি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।৫৫

সর্বোচ্চ আইনের উচ্ছেদের পর দেখা গেল জানুয়ারী মাসের প্রথমেই বহু জিনিসের দ্বিগুণ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। ট্যুইলরি (Tuileries) রাজপ্রাসাদের (এখানে গণপরিষদের অধিবেশন বসিত) নিকট বহু শ্রমিক জড় হইয়া ইহার জন্য ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণকে দায়ী করিবার শাসেস্তা করিবার ভয় দেখাইল। গুজব শোনা গেল যে কুখ্যাত সাঁত আঁতোয়ান জেলা হইতে খাদ্যমূল্য হ্রাসের দাবীতে জনতা দল বাঁধিয়া গণপরিষদে যাইবে। হয়ত ইহাকে জোর করিয়া তাড়িয়াও দিতে পারে।৫৬

ডক্টর কবিদএর মতে সর্বোচ্চ আইনের দোষত্রুটি থাকিলেও ইহা চালু থাকিবার সময় ঘাটতির পরিমাণ ১৭৯৩ সালের ঘাটতির পরিমাণ অপেক্ষা কম ছিল। পরিমাণে কম হইলেও এই আইনের উচ্ছেদ পর্যন্ত লোকজন বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়মিত পাইত। তখন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। ১৭৯৫ সালে অভাব অনটন এবং সর্বনাশা ঘাটতির জন্য দেশের লোকের দুর্গতির সীমা ছিল না। ইহার জন্য সর্বোচ্চ আইনের উচ্ছেদ দায়ী। তখন দেশের অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সৈনিক অমল টাকা খরচ হইতেছিল। গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে এবং পরিণামে দেশের স্বার্থে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মূল্যনিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত ছিল। যুদ্ধের সময় যখন নৈতিক বল দৃঢ় থাকা উচিত তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ায় যাহাদের নিকট মজুত মাল ছিল তাহারা আরও লাভের আশায় মাল বিক্রী করিতে অস্বীকার করিল। যাহাদের টাকা ছিল তাহারা তখন বাজারে প্রয়োজনীয় যে মাল পাইল তাহাই ক্রয় করিয়া মজুত করিতে আরম্ভ করিল। ইহার পর বাজার হইতে মাল উধাও হইল। এই মজুত বিষয়ে ভোগ্য দ্রব্য এবং ভোগ্য দ্রব্য নয়, দুইয়ে কোন পার্থক্য থাকিল না। যদি শান্তি ফিরিবার পর গভর্ণমেণ্ট সর্বোচ্চ আইনের উচ্ছেদ করিত তখন দেশবাসীকে এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না।৫৭

আধুনিক কালের অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে বোরগু (Borgue) জেলায় খাদ্যাভাবের ফলে ১৭৯৪ সালের শেষে অনাহারে মারা পড়িত হইবে এই আশঙ্কায় অনেক গোলমাল আরম্ভ হইল। চাষী কাগজীমুদ্রা লইতে অস্বীকার করিল। কারণ ইহার ক্রয় ক্ষমতা অনেক কমিয়া যাওয়ায় প্রকৃত মূল্য অনেক কম। ভেরসাই-এ (বর্তমান প্যারিস পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত) এই প্রকার অশান্তি দেখা গেল। প্রত্যেক গোলমালের উৎপত্তি স্থল প্যারিস। এখানেও ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল (১৭৯৫) পর্যন্ত অনেক অশান্তি দেখা গেল। রুটির দাম কম করিবার জন্য জন নিরপেক্ষ কমিটি প্রদেশগুলিকে নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করিল।৫৮ ব্যবস্থা যাহাই প্রথমে থাকুক না কেন, প্যারিসে শীঘ্রই রুটির রেশান দৈনিক আট আউন্স হওয়ায় এখন অধিকাংশ নাগরিকের আদৌ অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য হইল। দেশের অন্যত্র অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। এপ্রিল মাসে (১৭৯৫) ভেরসাই-এ মাথাপিছু চার আউন্স রুটি এবং মে মাসে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে পীরেনীজ এলাকায় তিন আউন্স রুটি বরাদ্দ করা হইল।৫৯

ঐতিহাসিক তান (Taine) বলেন যে এই সর্বোচ্চ আইনের ফলে দেশের

লোক দুই দলে ভাগ হইয়া একদল অপর দলের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিল। অভাব হইলে কিছু লোক বেআইনি উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিবে ইহাতে কিছু আশ্চর্য নাই। প্রতিবেশীর সহিত অনেক সময় সদ্ভাব না থাকার জন্য তাহার সহিত অন্য প্রতিবেশীর মনোমালিন্য থাকে। সুতরাং অস্বাভাবিক সময়ে বেআইনি কাজ করিলে তাহাকে পুলিশের সাহায্য জন্য করা সম্ভব হইবে মনে করিয়া তাহার কাজকর্মের উপর নজর রাখা প্রায়ই অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। তবে তিনি ইহাও বলেন যে অন্য কয়েকটি কল্যাণজনক ঘটনার জন্য এবং এই আইনের উচ্ছেদের ফলে ১৭৯৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই।৬০

পাদটীকা

১। S. E. Harris : The Assignats, 142-3, 105.
২। Ibid. 148-9
৩। Ibid 149.
৪। Albert Soboul : The Parisian Sansculottes and the French Revolution 1793-94, 238
৫। S. E. Harris : The Assignats, 149-50.
৬। Ibid. 143.
৭। Albert Mathiez : The French Revolution, 352.
৮। Ibid. 345.
৯। Ibid 345-6
১০। Ibid 349,
১১। Ibid 353.
১২। Ibid 354.
১৩। S. E. Harris : The Assignats, 140.
১৪। Albert Mathiez : The French Revolution, 357.
১৫। S. E. Harris : The Assignats, 142-3
১৬। Albert Mathiez : The French Revolution, 397-8 ; J. M. Thompson The French Revolution, 481.
১৭। A. Thiers : The History of the French Revolution, III, 209
১৮। Henry E. Bourne, "Maximum Prices in France in 1793 and 1794" In The American Historical Review, XXIII, 1917,112
১৯। S. E. Harris : The Assignats, 150
২০। A. Thiers : The History of the French Revolution, III, 209-10
২১। S. E Harris The Assignats, 152-3.
২২ Ibid. 154

৯৩। Ibid. 153
৯৪। A Thiers The History of the French Revolution, III, 303
৯৫। S. E. Harris : The Assignats, 153.
৯৬। Ibid. 150
৯৭। A. Thiers The History of the French Revolution. III. 304
৯৮। Ibid. 305.
৯৯। Ibid. 304-5
১০০। S. E Harris : The Assignats, 150.
১০১। A. Thiers : The History of the French Revolution, III, 210
১০২। S. E. Harris : The Assignats 150, 119
১০৩। Ibid. IV, 22 In March 1794, Cambon announced an increase of 700'000 men in arms in the previous year. A total of $1\frac{1}{2}$ millions were under arms," Journals des Debates des Decrets, LVIII, 22, quoted in S E. Harris : The Assignats, 184.
১০৪। A. Thiers The History of the French Revolution, IV, 22
১০৫। S. E. Harris : The Assignats 15 ; Henry E. Bourne "Maximum prices in France in 1793 and 1794", 113.
১০৬। S. E. Harris The Assignats, 152.
১০৭। Ibid. 151
১০৮। Ibid. 151-2
১০৯। Ibid. 152.
১১০। Ibid. 153
১১১। A. Thiers The History of the French Revolution, IV, 21-2.
১১২। Ibid IV, 115-6
১১৩। Moniteur, XXI 793-7 quoted in S. E. Harris : The Assignats 154 ; A. Thiers : The History of the French Revolution, IV,22.
১১৪। Ibid. III, 105.
১১৫। Albert Mathiez : The French Revolution, 471
১১৬। A Thiers : A History of the French Revolution, IV, 119-20
১১৭। Albert Mathiez : The French Revolution, 509
১১৮। S. E. Harris : The Assignats 181, 186
১১৯। George Rude : Revolutionary Europe 1783-1815, 164.
১২০। A Thiers : A History of French Revolution, IV, 71

৫১। S. E. Harris : The Assignats, 154
৫২। Ibid, 146
৫৩। George Rude Revolutionary Europe : 1783-1815, 164 ; George Rude The Crowd in the French Revolution. 143-44 ; S. E. Harris : The Assignats ,146
৫৪। A. Thiers : A History of the French Revolution, IV. 121-2
৫৫। S. E. Harris The Assignats, 154
৫৬। George Rude : The Crowd in the French Revolution. 146.
৫৭। S. E. Harris : The Assignats. 155-6
৫৮। Ibid 155.
৫৯। H. A. Taine (tr) : The French Revolution, III, 377-94
৬০। M. Marion Histoire financiere/des la France depus : 1715, 3vols (Paris, 1910-21), II, 109, quoted in S.E. Harris : The Assignats,147
৬১। L. Blanc Histoire Socialiste de la Revolution Francaise (Paris, 1872) quoted in Ibid, 148.

মুদ্রণ শুদ্ধি

পৃঃ ১২১ লাইন ৬ এক স্থানে এই হইবে।
ঐ লাইন ২১ কানুয়ারী স্থানে জানুয়ারী হইবে।
১২২ লাইন ১২ এক স্থানে এই হইবে।
১২৩ লাইন ১ এক স্থানে এই হইবে।
১২৩ লাইন ২২ লেকলেক (Leclerc) স্থানে লেকলের্ক (Lecrec) হইবে।
১২৪ লাইন ১৩ সঙ্গায় স্থানে সংঘায় হইবে।
১২৬ লাইন ২৫ নিকৃষ্ট স্থানে নিকৃষ্টতর হইবে।
১২৮ লাইন ১ বহু স্থানে এই হইবে।
১৩১ লাইন ১০ মলো স্থানে মূল্যে হইবে।
.. ১৩২ লাইন ২৬ প্রকাশ্য বাজার স্থানে প্রকাশ্য বাজারে হইবে।

[এই প্রবন্ধের লেখক খড়্গপুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক]

"পোয়েটিকস্" ও ইতিহাসের যুক্তি

কার্তিক লাহিড়ী

সংঘটিত ও সম্ভাব্য ঘটনার বিবরণে ভিত্তিতে ইতিহাস ও কাব্যের পার্থক্য নিরূপণে অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্ত তাঁর ন্যায় (Syllogism) নির্ভর অবরোহ অনুমান অনুযায়ী সংগত নিঃসন্দেহে; যদিও এ কথা আমাদের বিদিত যে, অবরোহ পদ্ধতি সকল প্রকার জ্ঞানান্বেষণের একমাত্র আশ্রয় নয়। পক্ষান্তরে ন্যায় নির্ভর জ্ঞানের প্রধান অসুবিধা এই যে, যুক্তি বাক্য ত্রুটিপূর্ণ হ'লে সিদ্ধান্ত প্রমাদযুক্ত হতে বাধ্য। তাই ইতিহাস ও কাব্যের যুক্তিবাক্য নির্বাচনে অ্যারিস্টটলের পক্ষপাত প্রকট ব'লেই কাব্য তাঁর কাছে প্রশ্নাতীত মহত্তর বিষয় ও অধিক দার্শনিকতাময়, কারণ কাব্যের উক্তি সমূহ বহুপরিমাণে "সার্বিক" প্রকৃতির, ইতিহাসের উক্তি "বিশেষ" প্রকৃতিপ্রবণ। ফলে ইতিহাস যে কিঞ্চিৎ হেয় দর্শনের অভাবে, অ্যারিস্টটলের বিশদ ঘোষণা ব্যতিরেকে, মাত্র ইঙ্গিতে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। অতীত ঘটনার বিবরণ দান ইতিহাস—এ বক্তব্যে ইতিহাস ও দলিল দস্তাবেজের মধ্যে কোনও তফাৎ করা আমাদের পক্ষে মুস্কিল, তাই অ্যারিস্টটলের মতানুসারে ঐতিহাসিক ও নথি লেখকের কাজ এক—এমন কিছু ভাবা যুক্তিযুক্তও বটে। আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাস সংক্রান্ত অ্যারিস্টটলীয় মতামত অনেক প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক-এ সংক্রামিত অবশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চোলাই হ'য়ে। বিশেষতঃ উনবিংশশতাব্দীর ঐতিহাসিকদের তথ্যের প্রতি অতি উৎসাহে কি অ্যারিস্টটলের প্রভাব লক্ষিত নয়? এমন কি প্রত্যক্ষবাদীদের (পজিটিভিস্ট) তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ, ইতিহাস অতীতের দলিল—এই মনোভঙ্গীর পরিচায়ক। অন্যদিকে ইতিহাসের উক্তি সমূহ বিশেষ প্রকৃতির এ তত্ত্ব নানা অলিগলি পেরিয়ে "ইতিহাস মহাপুরুষদের জীবনী" এ হেন কার্লাইলীয় উক্তিতে প্রকট। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য তাই হেলা ফেলার বস্তু নয়, বরং তন্ন তন্ন আলোচনায় সেই মতামতের সত্যাসত্য নির্ধারণ আমাদের অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত, কারণ সেই আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারে সক্ষম ও পারদর্শী। সংঘটিত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ইতিহাসের কাজ, উক্তিটি আংশিক সত্য সন্দেহ

নেই, অন্তত আমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ইতিহাস সম্পর্কে এ ধারণা জন্মানো সম্ভব, এবং ইতিহাসের অবলম্বন যে অতীত ঘটনা—এ-বিষয়ে অনেকে একমত। তবু প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, অতীতের ঘটনাও অতীতে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার সমাহার কি এক বস্তু? অ্যারিস্টটল এ সংশয় সম্পর্কে নীরব, কিন্তু সংঘটিত ঘটনার বিবরণের অর্থ অতীতের যাবতীয় ঘটনার বিবরণ, এবং কালক্ষেপ না করে বলা সহজ, যাবতীয় ঘটনা লিপিভুক্ত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে পণ্ডিতী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস গ্রন্থে তার পরিচয় শোচনীয় ভাবে অনুপস্থিত। সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ-করা হয়ত নথি-লেখকের কাজ, যে কাজ যে কোনও শ্রেণীর ঐতিহাসিকের অনভিপ্রেত। কারণ সব ঘটনা ইতিহাস পদবাচ্য নয়। সেজন্য ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক ঘটনার যাচ বিচার এবং তথ্য নির্বাচন ইতিহাস-রচয়িতার প্রাথমিক স্তরের কর্তব্যের অন্যতম একটি, তাই অতি নিকৃষ্ট ইতিহাস পুস্তকেও ঘটনা নির্বাচনের স্বাক্ষর পরিলক্ষিত। তথ্য ও ঘটনার তাৎপর্যবহ নির্বাচন ঐতিহাসিক দক্ষতার পরিচায়ক, এবং এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও প্রকৃত তখনি, যখন ঘটনাগুলি কার্য-কারণের শৃঙ্খলে যুক্ত যদিও এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দৃষ্টিভঙ্গীই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনার মেল-বন্ধন শক্তি। নির্বাচন ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের ধারণা যে স্পষ্ট, তার প্রমাণ "পোয়েটিকস্"-এর হোমার প্রশস্তিতে লক্ষণীয়, এবং "ইলিয়াড", "ওডেসী"-র সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে হোমারের গল্প নির্বাচনের ফল, সে কথা অ্যারিস্টটলের পাঠকমাত্রেরই জানা। অথচ সেই জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাজ্ঞ পুরুষের ইতিহাসের প্রতি বিরাট সুলভ মনোভাব বিশেষ বিস্ময়ের। আসলে অ্যারিস্টটলের ইতিহাসের ধারণার ঐতিহাসিক মানক বাক্তি সম্পূর্ণ উহ্য থাকায় যত বিপত্তির উৎপত্তি। এবং ঐতিহাসিক যে নিছক কেরানী বা কারিগর নন, এ সত্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যদিও জানার কোনও উপায় নেই, তবু অ্যারিস্টটলের কাছে ঐতিহাসিক ও নথি লেখক যে সমমূল্যের—এমন ধারণা "পোয়েটিকস্" পাঠে বদ্ধমূল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, যদিও স্বীকার্য আলোচনার এক অসতর্ক মুহূর্তেই ইতিহাস কাব্যের প্রভেদের বিষয়টি উল্লিখিত, হয়ত বা কাব্যের বিষয় বিপদ করার জন্য ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজন। সেজন্য অ্যারিস্টটল নবম ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের মাত্র কয়েকছত্রে কাব্য ইতিহাসের তুলনামূলক বিচারে আগ্রহী, যদিও এমন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ হেন ফতোয়া জারি কিঞ্চিৎ নোচিত কিনা, সে বিষয়ে আমাদের মত অ-পণ্ডিতদের খটকা লাগা স্বাভাবিক। তথ্য নথিভুক্ত ও নির্ণয়করণ নিশ্চয়ই

ইতিহাসের পদ্ধতি, কিন্তু তথ্যমাত্রই ইতিহাস নয়, তথ্য ইতিহাসের উপাদান মাত্র, ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য ও কারণ সংগৃহীত ও নিরূপিত তথ্যের ভিত্তির উপর ইতিহাসের সৌধ নির্মিত। কিন্তু ভিত্তিকে সর্বৈব ভাবলে যেমন সৌধের সমগ্ররূপ আবিষ্কার করা অসম্ভব, তেমনি তথ্যকে ভক্তিযোগ্য বস্তু ভাবলে ইতিহাস লেখকের কলাকৌশল, এককথায় ঐতিহাসিক প্রকৃতি, সম্পর্কে ধারণা হওয়াও দুঃসাধ্য। উপাত্ত (data) অত্যন্ত স্বল্প হ'লে তথ্য নথিভুক্ত ও নির্ণয় কারণের পদ্ধতি ঐতিহাসিকের একমাত্র অবলম্বন নিঃসন্দেহে স্বীকার্য, কিন্তু তথ্য ঘটনার যেখানে প্রাচুর্য, সেখানে ঐতিহাসিক সংগৃহীত তথ্যের নির্বাচন ও মূল্যবিচারে তৎপর, কারণ সেই মূল্যবিচারের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক ঘটনার কার্যকারণ যোগসূত্র, ঘটনার ফলাফল নির্ধারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার্য, এবং এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তথ্য নির্বাচন, মূল্যবিচার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম এইজন্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় তিনি ইতিহাসের স্বরূপ প্রকাশে সক্ষম তাই ঐতিহাসিক নিজের গরজেই বিজ্ঞান ও শিল্পের পদ্ধতি আত্মসাৎ করতে বাধ্য, এ পদ্ধতিগুলির রাসায়নিক মিলনেই ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব। উপাত্তের স্বল্পতা হেতু ঐতিহাসিকের পক্ষে যে পদ্ধতি গ্রহণ স্বাভাবিক, সে পদ্ধতি অ্যারিস্টটল নির্দেশিত পদ্ধতি তা বলা বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলা বিধেয় যে, এ পদ্ধতি সভ্যতার প্রভাব পর্বে হয়ত স্বল্প বিস্তর কার্যকরী, কিন্তু মানব সভ্যতা সুস্পষ্টরূপ পেতে থাকলে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব এ পদ্ধতিতে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব, যেহেতু সভ্যতার নিয়ম অনুসন্ধানে তখন তিনি তন্ময়ী ছাত্র, এ তাঁর বর্জ্যতা। সামাজিক জীব হিসাবে তাঁর সম্মানের প্রশ্নও বটে। অন্তত হেরোডোটাস, থুসিডিডেস, জেনোফনের মত ঐতিহাসিকের আবির্ভাবের পর অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা শুধু নিরর্থকই নয়, ইতিহাস-রচনার পদ্ধতি উন্নত করার পথে বিঘ্ন স্বরূপ। 'ইতিহাসের জনক' হেরোডোটাসের তথ্য সংগ্রহে যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচয় নিহিত (সংবাদ সংগ্রহের জন্য গ্রীস ইজিপ্ট, ব্যাবিলনীয়া, সিরিয়া এবং দক্ষিণ সিথিয়া ভ্রমণ; বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও প্রশ্ন উত্তর লিপিবদ্ধ করা) সেই কর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের সত্য সন্ধানের পদ্ধতির সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য। এ-ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, সি-এম-বাওরার ভাষায়, "তাঁকে নিছক ইতিহাসের জনকই করে নি, তাঁকে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের জনক—ও করে তুলেছে।" থুসিডিডেস পদ্ধতি

আরও বিশদ : পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যুদ্ধ চলাকালে নানা টুকিটাকি লিখে রাখা, যুদ্ধের পর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ, নানা নথির পরীক্ষা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন ইত্যাদি বহু উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সচেতন প্রয়াসে অদ্যাপি তিনি ঐতিহাসিকদের কাছে নিষ্ঠা, শ্রম, সত্যান্বেষণের একজন আদর্শ পুরুষ। তখনও বিজ্ঞান গ্রীসে তখন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার অধীনে নীত, এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞানের অন্যতম শাখায় পরিণত। উপাত্ত সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নেবার হিপোক্রেটীয় (বিখ্যাত চিকিৎসক) পদ্ধতি নিশ্চিতভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিকট আত্মীয়। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকাশ তখন সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হওয়া বিচিত্র নয়, এবং থুসিডিডেস এর ইতিহাসে বিজ্ঞানের আরোহ প্রণালীর প্রভাব সুস্পষ্ট। যদিও এ প্রণালী অতি ক্ষীণ ভাবে হেরোডোটাসেও লক্ষ্যযোগ্য। থুসিডিডেসের রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সচেতনভাবে অনিশ্চিত ব'লেই তিনি আজও আধুনিক ইতিহাসের পথিকৃৎ রূপে গণ্য, এবং ঘটনাকে নিছক ঘটনা হিসাবে না দেখে মানুষের জীবনে তার তাৎপর্য কি, সেই আবেগ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এইসব প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতির থাকা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটলের পক্ষে ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ ধরতে না পারার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। "ঐতিহাসিক ও কবির পার্থক্য এও নয় যে একজন গদ্যে লেখেন, অন্যজন পদ্যে। হেরোডোটাসের রচনা পদ্যে লিখলেও তা ইতিহাস-ই থাকবে।" অ্যারিস্টটলের এ ধরণের উক্তি মোটেই নিশ্চয় নয়, বরং কিঞ্চিৎ কৌতুককর। আসলে উপরে উল্লিখিত ঐতিহাসিকদের অনুসৃত পদ্ধতির সঙ্গে অ্যারিস্টটলের মনোভঙ্গী বা পদ্ধতি কিছুই মিল নেই, যেহেতু অবরোহ এবং আরোহ পদ্ধতি জ্ঞানান্বেষণের পরস্পর বিরোধী দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ। অ্যারিস্টটল আরোহ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও অবরোহ তর্ক বিদ্যার প্রতি তাঁর আসক্তি সংস্কারের মত দুর্মর, এবং এ-কথা সকলের জানা যে বিশুদ্ধ গণিত ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুমান আরোহ মূলক, অবরোহ মূলক নয়। (রাসেল প্রণীত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) ফলে অ্যারিস্টটলের পক্ষে ইতিহাসকে সুনজরে দেখা অসম্ভব, তাই ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিকের কাজের পরিধি আরও সংকুচিত। নবম পরিচ্ছেদের অতীত ঘটনার বিবরণ দান ইতিহাস—সিদ্ধান্তটি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে পরিবর্তিত এইভাবে "ইতিহাস একটি ক্রিয়াকে নয়, একটি যুগকে, এবং সময়ের সেই নির্দিষ্ট বিভাগে এক বা অনেকের জীবনের

যাবতীয় ঘটনাবলীকে, যদি ঘটনা বিচ্ছিন্ন হ'লেও রূপ দেয়।" উপরের উদ্ধৃতি-তে ইতিহাসের সীমা যে নাম পরিচ্ছেদে বিধৃত ইতিহাসের গণ্ডী থেকে অনেক সংকুচিত ও সংকীর্ণতা অতি অনায়াসে প্রায় সকলের বোধগম্য। এই উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট যে, ইতিহাস একটি যুগে সংঘটিত ঘটনার নথিমাত্র, আমাদের পক্ষে এ নির্দেশ মান্য করা আত্মহননের সামিল। ঐতিহাসিকের এমন সাদা সরল দায়িত্বের কথা একমাত্র পরিহাস ছলেই উচ্চার্য।

॥ ২ ॥

'বিশেষ'-কে প্রকাশ করা ইতিহাসের প্রবণতা অথবা ইতিহাসের উক্তি নিচক বিশেষ প্রকৃতির অ্যারিস্টটলের এ মতেও ইতিহাসের চৌহদ্দি সমান সংকুচিত। এবং এটা ভাবা আমাদের পক্ষে অন্যায় যে, সার্বিক বা সামান্য প্রকাশের দিকে ঐতিহাসিকের কোন ঝোঁক নেই। বস্তুত, 'বিশেষ'-এর প্রতি ঐতিহাসিকের প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকলেও তাঁর ব্যবহৃত ভাষাই-এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবদিক দিয়ে পৃথক, এবং দু'টি বিশেষ ঘটনা, কিন্তু উভয়ই ঐতিহাসিকের কাছে যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত। এরকম বহু বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে দেখানো সম্ভব যে, ঐতিহাসিকের ঝোঁক সামান্য এর দিকে ও সমান বর্তমান। (এ প্রসঙ্গে E.H.CARR প্রণীত What is History পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কোনও ঘটনা মাত্র তার বিশেষত্বের জন্য ঐতিহাসিকের কাছে তাৎপর্যময় নয়, সেই বিশেষে সামান্য নিহিত থাকলেই তা বিচারের উপযুক্ত। ঐতিহাসিক বা ইতিহাস পাঠক উভয়েই ভিন্ন প্রসঙ্গের ঘটনাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে আসার উৎসুক, অন্যদিকে বিশেষ ও সামান্যর ভেদ রেখা টানা দুষ্কর, সেজন্য বিশেষ ও সামান্যর সম্বন্ধ নিরূপণ ঐতিহাসিকের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তথ্য সংগ্রহ ও সেই সংগৃহীত তথ্যের মূল্য বিচার ইতিহাস রচনায় এমন ওতপ্রোত জড়িত যে, অ্যারিস্টটলের বক্তব্য আমাদের সমর্থন করা দুঃসাধ্য, কারণ তাঁর কাছে ঐতিহাসিকের শুধু তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর আমাদের কাছে তথ্য সংগ্রহকারী ও ঐতিহাসিকের তফাৎ অতি বিস্তৃত; প্রথম জন আমাদের কাছে নকলনবিশী হিসাবে গণ্য, দ্বিতীয় জন দার্শনিক শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের সমকক্ষ। অর্থাৎ ইতিহাস রচনার জন্য কল্পনা বৃত্তির প্রয়োজন একান্ত আবশ্যক—আমাদের সহজ বক্তব্য তাই।

আবার "বিশেষ" এর অর্থ বিশদ না করার ফলে ইতিহাস বিশেষ প্রকাশ প্রবণ—এ উক্তির তাৎপর্য গ্রহণে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটায়, "কখনো কখনো অ্যারিস্টটল পদ গুলি (term) বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু প্রায়শই নির্বিচারে মেনে নেন;"

(গিলবার্ট ম্যারের ভূমিকা, পৃঃ ১২। বাইওয়াটার কৃত "পোয়েটিকস" অনুবাদ গ্রন্থ)। এই মেনে নেওয়ার জন্য নানা বিপত্তির জন্ম। অবশ্য এক্ষেত্রে বিশেষের অর্থ "অ্যালসিবিএদেস কি করেছিল, অথবা তার কি হয়েছিল।" এবং এই উদাহরণ থেকে ইতিহাস রাজারাজড়ার বা নীয়ের অথবা একজন বিশেষ এবং অসাধারণ ব্যক্তির কাহিনী, এ সিদ্ধান্তে আসা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, অ্যারিস্টটলে প্রদত্ত উদাহরণে তার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। অবশ্য উদাহরণ স্বরূপ অ্যালসিবিএদেসের উল্লেখ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ অ্যালসিবিএদেস (খ্রীঃপূর্ব ৪৫০-৪০৪) একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক সেনাধ্যক্ষ (যদিও পেলোপোনেসীয় যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা বিশ্বাস হন্তার) এবং অতীতের কৃতিত্ব-পূর্ণ কাজের সঙ্গে একজনের নাম যুক্ত করা গ্রীসীয় রীতি। সেদিক থেকে অ্যারিস্টটলের চিন্তা তৎকালে প্রচলিত ধ্যান ধারণায় সিক্ত সংগত রূপে, হয়ত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সহজ সরল, এবং মুষ্টিমেয় জ্ঞানী গুণী যোদ্ধার নির্দ্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে ইতিহাসে বিশেষের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ স্বাভাবিক। অ্যারিস্টটলীয় অধিবিদ্যায় যদিও 'সার্বিক' ও 'বিশেষ' স্বতন্ত্র, তবু 'সার্বিক' 'বিশেষ' এর উপর নির্ভরশীল সংজ্ঞাবাচক নাম ও বিশেষণের তাৎপর্য নিরূপণের সময় তা স্পষ্ট প্রকাশিত। কিন্তু এই মতটির (স্ববিরোধিতা পূর্ণ এক হিসাবে) কেবল কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ আমাদের মতে ন্যায্য নয়, ন্যায্য হ'তে গেলে এ প্রচেষ্টার সামান্য প্রক্ষেপও ইতিহাস আলোচনায় থাকা উচিত। দুঃখের বিষয়, অ্যারিস্টটল এ স্থলে সম্পূর্ণ উদাসীন। যে ব্যক্তির জ্ঞান একমাত্র বিশ্বকোষের সঙ্গে তুলনীয়, যাঁর উৎসাহ দর্শন, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি থেকে কাব্য, বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রসারিত। তাঁর পক্ষে সময় সময় কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞাত তত্ত্ব প্রয়োগ না করা আমাদের মতে সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।

ইতিহাসের 'বিশেষ' প্রকাশের প্রবণতা ও তৎসহ অ্যালসিবিএদেস-এর উদাহরণ বোধ হয়, ইতিহাস ব্যক্তি প্রতিভার দ্বারা পরিচালিত বা ব্যক্তি প্রতিভা ইতিহাসের সৃষ্টিশীল শক্তি—এমন মতের উৎসস্বরূপ, অবশ্য এ সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। হয়ত রেণেসাঁসে ব্যক্তির অভাবিত সাফল্য উক্ত অভিমত দৃঢ় করার পক্ষে অনুকূল, এবং পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক সেই সাফল্য লক্ষ্য করেই ব্যক্তি প্রতিভার অসাধারণত্বে অভিভূত, এবং য়ুরোপীয় মনীষার পুনরুজ্জীবনে লুপ্ত গ্রীক ঐতিহ্য পুনর্ব্বাসনের

আবেগ যে অসাধারণ, সে কথা আজ পণ্ডিতজন স্বীকৃত একটি অলঙ্ঘ্য সত্য। রেণেসাঁস এবং রেণেসাঁস পরবর্তী যুগে বিশ্ব ও জীবন মুমীনভাব জয়ের অন্যতম একটি কারণ, অ্যালবার্ট সোয়েৎজারের মতে, "অ্যারিস্টটল ও স্টোইক দর্শনের পুনরুজ্জীবনের প্রভাব।" (Indian Thought and Its Development, পৃঃ ৩)।

ইতিহাসে ব্যক্তি-প্রতিভা বা মহাপুরুষের স্থান সম্পূর্ণ গৌণ, এ কথা বলা বাতুলতা; কিন্তু ব্যক্তি প্রতিভা বা মহাপুরুষ ইতিহাসের নিয়ামকশক্তি—এ মন্তব্য নিশ্চয়ই যথার্থ নয়; "প্রায়ই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎ ভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারিদিকে আয়োজন অনেকদিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোটো বড়ো অনেকের যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।" (রবীন্দ্রনাথ: শিবাজী ও মারাঠা জাতি প্রবন্ধ, ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) যে মানুষ নিয়ে, সাধারণ অসাধারণ, ঐতিহাসিকের কারবার সে—মানুষ স্বয়ম্ভু নয়—দেশ কালে গণ্ডীবদ্ধ রক্তমাংসে সজীব, আর দেশ কাল ছিন্ন মানুষের কাহিনী কি সত্যি সম্ভব?

॥ ৩ ॥

"পোয়েটিকস্"-এর অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনায় অ্যারিস্টটলের বিবিধ মানদণ্ড প্রয়োগের বিষয়টি আমাদের প্রধান আপত্তির ক্ষেত্র। কাব্যের ক্ষেত্রে নির্বাচন স্বীকৃত, অথচ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেই নির্বাচন সম্পর্কে নীরবতা, অবিবিক্ষায় 'সাধিক' ও 'বিশেষের' সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা ও সেই চেষ্টার 'বিশেষ' এর সঙ্গে 'সাধিক'-এর যোগাযোগের অলাঙ্গিত্ব আবিষ্কার ইতিহাস আলোচনার সময় সম্পূর্ণ উহ্য রাখা তাঁর পক্ষপাতিত্বের পরিচয়; যদিও স্বীকার্য যে, কাব্য ও ইতিহাসের পার্থক্য বিচারে যে পদগুলি ব্যবহৃত (সাধিক, বিশেষ প্রভৃতি), সেই পদ গুলির অর্থ নিরূপণের সময় অ্যারিস্টটল "স্ববিরোধিতা ও বেখাভাসে নিমজ্জিত হন।" (ক্রোচে—ইস্থেটিক ইং অনুবাদ ডগলাস এইনসলি পৃঃ ১৬৯)। 'পোয়েটিকস'-এ সাধিকের অর্থ বিশ্লেষণেও স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। কাব্যের লক্ষ্য সাধিক, "যদিও এ লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য পাত্র পাত্রীর বিশেষ নাম দিতে হয়।" অর্থাৎ সাধিক কে বিশেষের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব উক্তিতে সেই ইঙ্গিত নিহিত, যদিও অ্যারিস্টটলের মতে তা অসম্ভব, কারণ "কোনও সাধিক পদ বিশেষের নাম হতে পারে না।" কাব্য ও ইতিহাসের দার্শনিকতার

তত্ত্বতম অবশ্য সার্বিক ও বিশেষ প্রকাশের উপর নির্ভরশীল, এবং এ-স্থলেও অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষণ আমাদের প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়, কারণ কাব্যের বিশেষ দ্বারা সার্বিক প্রকাশ করা সম্ভব, অথচ ইতিহাসে বিশেষের সে গুণ অবিদ্যমান, বিশেষের এই প্রকার ভেদ কেন, এ বিষয়ে ওঁর তুষ্টীম্ভাব পক্ষপাতিত্বের আর একটি নিদর্শন। গিলবার্ট মারের বক্তব্য ভিন্নভাবে ব্যক্ত হলেও সে বক্তব্য ক্রোচের মতের প্রায় অনুরূপ। পদগুলিকে বহু সময় মেনে নেওয়ার ফলে "তিনি এর দ্বারা বহু সময় প্রতারিত হন।" (বাইওয়াটার কৃত অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ১২)। বিভিন্নপদ গুলিয়ে ফেলার নজির অ্যারিস্টটলের অন্যান্য আলোচনায়ও প্রকট, সেজন্য এ দোষ ইতিহাস ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু "পোয়েটিকস্" এ কাব্যকে দর্শনের চেয়ে এবং ইতিহাসকে কাব্যের চেয়ে হেয় প্রতিপন্ন করার যে সূক্ষ্ম কৌশল অনুসৃত, সেই কৌশলে অনেক বিদ্বান আক্রান্ত হলেও আমাদের মত অ-পণ্ডিতদের মনে নানা সংশয় জাগা স্বাভাবিক, এবং সেই সংশয় উত্থাপন করে ইতিহাসের পদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকা রচনা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কারণ ভূমিকা পরবর্তী আলোচনার পক্ষে একটি নিশ্চিত পদক্ষেপ ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার মৌল প্রবর্তনা

(দ্বিতীয়াংশ)

নিখিলেশ গুহ

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকভাবে দীর্ঘ দুটি প্রবন্ধে আলোচনা করেন—প্রথমটি, বৈশাখ ১৩০১, প্রকাশিত হয় ঔপন্যাসিকের তিরোধানের পর ; দ্বিতীয়টি, 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, ছাপা হয় ঐ বছরেরই মাঘ-ফাল্গুন কোনো এক সংখ্যায়। এছাড়াও 'রাজসিংহ' বিষয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ এক সমালোচনা প্রণয়ন করেন কিন্তু তা মূলতঃ সাহিত্য নির্ভর। বঙ্কিম মনীষার নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু সত্তা কিশোর কবিকে কিভাবে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ আছে এই সব সূত্রে : 'বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপনার মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসারভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।'১২ 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর সর্বত্র বঙ্কিম নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল : 'কিন্তু বঙ্কিম এই গ্রন্থে অনাবশ্যক যে সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াজনক হইয়াছে।'১৩ উদ্দেশ্যগতভাবে—'প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাশ'১৪—প্রভেদ ছিল না অবশ্য, বরং সাধারণ নিশ্চেষ্টতার তুলনায় বঙ্কিমের উদ্যম রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্লাঘনীয় মনে হয়। 'তিনি আমাদিগকে অসন্তোষের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে সচেষ্টভাবে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে। তিনি আমাদের হাতে মুক্তাটি দিয়া যান নাই, দৃষ্টান্ত সহকারে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে "যদি মুক্তা চাও তো সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে।" খুব সম্ভবত আমরা নমস্কার করিয়া বলিব, 'আমাদের মুক্তায় কাজ নাই, আমরা সমুদ্রে ঝাপ দিতে পারিব না।'১৫

বঙ্কিমে, দুটি নিবন্ধ করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর ইতিহাস রচনার আদর্শ। 'বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল

বঙ্কিম লইতে পারিতেন। একদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ, একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব অন্যদিকে অতি পরিচয়জনিত অভ্যাস ও ও সংস্কারের অন্ধতা—যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।'১৬ ইংলণ্ডে সে সময় জীবনচরিতকারদের স্বর্ণযুগ।১৭ দ্রষ্টব্য, এই রীতির অন্যতম কুশলী এবং প্রবন্ধটি রচনার মাত্র চার বৎসর পূর্বে লোকান্তরিত, রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা যোগান : 'যথার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক মহত্ত্ব গল্পের আরম্ভের বাহিরে, তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী দ্বারাই বর্ণনসাধ্য। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলিত ইহা সত্য। কবিতার এই সঞ্জীবনী শক্তি আছে এবং গল্পের তাহা নাই এবং সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।'১৮ এই কবিত্বময় দৃষ্টির অখণ্ডতার অভাবে 'কৃষ্ণচরিত্র' রবীন্দ্রনাথকে স্থানে স্থানে পীড়িত করেছিল কিন্তু তিনি তার কারণ বিষয়ে অবহিত ছিলেন : 'যেখানে, তাঁহার দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সেখানকার জঞ্জাল সাফ করিবার জন্য তাঁহাকে কুঠার ধারণ করিতে হইয়াছিল।'১৯

জাতীয় উন্মেষের প্রথম পর্বে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ছিল উদ্বোধকের। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন : 'জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি : ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।'২০ প্রায় একই মর্মে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কী করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কী করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিত লোকের অনেক ভাবনা চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজ কর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না।'২১ 'সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই'২২—বঙ্কিমের অভিযোগ স্পষ্ট। সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় প্রসঙ্গে তিনি অসহিষ্ণু 'এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে সাহেবরা সেই মিনহাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন।

তাহা পড়িলে চাকরী হয়। বিশ্বাস না করিবে কেন?'২৩ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত ধীর কিন্তু মর্মস্পর্শী। 'পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদযোগ সেই উদযোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য—আমাদের প্রাণ।'২৪ লোকশিক্ষার মাধ্যমে ইতিহাসের জ্ঞানবিচরণের উৎসাহ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথে আত্যন্তিক। শেষোক্তজন অবশ্যই লালিত হয়েছিলেন হিন্দু মেলার আবহাওয়ায়। সঞ্জীবনী সভার প্রভাবে তাঁর চিন্তায় বিপ্লববাদ কতখানি স্থান পেয়েছিল বলা শক্ত২৫, কিন্তু আসর প্রতিষ্ঠাতা রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে পাই যেন তাঁরই পূর্বাভাস: 'দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না'।

তৎকালীন বাংলা দেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষণিকা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল, গূঢ়ভাবে। বিষ্ণু দের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য 'একদিকে যেমন পরাধীন প্রাচ্যদেশে রেনেসাঁস রিফর্মেশান হয় নি, তেমনি আমার ঐতিহ্য গর্বিত এবং বহুজন-বিস্তৃত এদেশে অসহিষ্ণুর আনন্দবিরোধী মনোভাবও প্রাধান্য পায় নি, পণ্যব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্র তখনও বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষস্থানে বসে নি।'২৬ উক্তিটি প্রযুক্ত হয়েছিল, 'কবিকাহিনী' প্রসঙ্গে, যেখানে 'হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত', বলার পরই কিশোর আবেগকে বিপর্যস্ত করে উৎপীড়নের রূপ।

স্বাধীন সে অধীনেরে দলিবার তরে
অধীন, সে স্বাধীনেরে পুজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল
দুর্বল, বলের পদে আত্মবিসর্জিতে!

ধনীনির্ধনের ভেদাভেদহীন যে সমাজ কবি কল্পনা করেন তার পুরোহিত পদে যাঁর স্থাপনা পাই তাঁর প্রতিচ্ছবি আমরা পরেও পেয়েছি, অনুরূপ প্রসঙ্গেই। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রথম মহির্ষিজীবনের সদনাতকে স্মরণে এনে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'তখন দেখতুম আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যূষের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর পূর্বাসা ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন এই শান্ত শুভ্র আবেষ্টনের সঙ্গে একাত্মীভূত।'২৭ কবিকাহিনীর পংক্তিগুলিতে মিল স্বতঃ প্রকাশ।

বিশাল ধবল ভাল, বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি, গম্ভীর মুরতি,
প্রশস্ত ললাট বেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হয় হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ দেব।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনায় প্রাদেশিকতার স্থান ছিল না। কৌতূহল প্রদ এই তথ্য। 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর আদি সমালোচনায় বঙ্কিম সৃষ্ট চরিত্রমাহাত্ম্যের প্রতিতুলনায় মধুসূদনের প্রতি যিনি প্রশ্ন রাখেন—'মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন'২৮—প্রথম উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের পুনর্মূল্যায়নে ব্রতী হন তিনিই। 'সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।'২৯ উপন্যাসটি বঙ্কিমের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ইতিমধ্যেই অবশ্য প্রচার—প্রতীচীর সমীকরণে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'তে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এই উক্তি : 'প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা।'৩০ 'সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের মিলন'৩১—পরদেশীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রবেশ করার তার প্রধান অবলম্বন ছিল, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য়। লোকেন পালিতের সান্নিধ্য বা হেনরি মরলির অধ্যাপনাপদ্ধতি তিনি কখনোই ভুলতে পারেন নি, অবিস্মরণীয়ভাবে চিত্রিত করেছিলেন সেই লাটিন শিক্ষককেও যার বোধ মত—'পৃথিবীতে এক একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব সমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু ভাবটা একই।'৩২ 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক'৩৩ প্রিয়নাথ সেন এবং চৌধুরীদ্বয়—আশুতোষ ও অক্ষয়কুমার—এই উপলব্ধির স্বাভাবিক সাথী ছিলেন।

অন্য এক ভাবেও য়ুরোপীয় দর্শন এসময়ে বাঙালী মানসে কার্যকরী ছিল। বঙ্কিম যেমন প্রায়ই কোঁত্-কে গ্রহণ ক'রে বক্তব্য বিস্তার করেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই ডারউইনএর অভিব্যক্তি বাদে জাগতিক সমস্ত উন্নতির কারণ পান। 'অভিব্যক্তিবাদকে প্রাণিজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? অভিব্যক্তিবাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? না কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই। আমরা যাহাকে

অভ বলি তাহা হইতে সে অভিব্যক্ত হইতেছে।...অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক অভ পরমাণু প্রাণ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক ক্ষুদ্রতর প্রাণ পূর্ণতর জীব হইতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক পূর্ণতর জীব (যেমন মনুষ্য) অপূর্ণতার হাত এড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।'৩৭

অভিব্যক্তিবাদ অনুগামী দৃষ্টি নিশ্চয়ই সমুখপ্রসারী, 'চিঠিপত্র' গ্রন্থের প্রবর্তকও তা-ই, কিন্তু তখনকার বাংলা দেশের পতিতাবস্থাই দায়ী করছিল অতীতে অনুবর্তন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সমালোচনা'-র প্রথম প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথকে এনে দেয় বঙ্কিমের কাছাকাছি। 'যখন বাহিরে রৌদ্রের খরতর তাপ আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না, তখন শিকড়ের প্রভাবে আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতন দেশ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারি। যখন সকল সুখ ফুরাইয়া গেছে তখন আমরা পিছন ফিরিয়া অতীতের ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া অতীতে যাইবার পথ অনুসন্ধান করিয়া লই। বর্তমানে যখন নিতান্ত দুঃখ নিতান্ত উৎপীড়ন দেখি তখন অতীতের মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে যাই।'৩৫ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মূর্তি আমার মনে যেমনি উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।'৩৬

কালানুক্রমিকভাবে এখানেই আলোচনা শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু 'জীবন স্মৃতির' শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থের মোড় ঘুরে যায়। 'সামাজিক বিশেষত্ববশত কোনো বাধা'৩৭(ক) অতিক্রমণের প্রেরণা যে কেবল তাকে সমবায়ের পথে ঠেলে দিচ্ছিল এ-তথ্যে সম্পূর্ণ সায় না দিয়ে, শিল্পীর আকুতির কথাও রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেন: 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার বাধিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ।'৩৭(খ) উনিশ শতকের দিশারী পুরুষদের কাহিনী থেকে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন। নূল প্রেরণাস্থল রামমোহন রায় প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে,-এমন: 'তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন

বিচ্ছিন্ন হয় নাই'। ৩৮ ব্রহ্ম ইস স্বরূপ আদর্শে রবীন্দ্রনাথ প্রণাম জানিয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেবের অবিচল মুর্তিতে। 'হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজে তিনি নব আশা, নব উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন।'৩৯ মহর্ষির শেষ জন্মদিনে প্রদত্ত এই ভাষণের সম্পূরণ যেন তাঁর প্রথম আত্মকথ্যে নিবেদিত অর্ঘের একাংশ। 'তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপর স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে এবং মুক্তকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।'৪০ ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাঁর পিতার অনুবর্তী। 'আমি কেবল সম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না।...যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল।'৪১ সমাজ প্রধানদের সম্মেলন কার্যকরী হবার সম্ভাবনা কম, বলেছিলেন বিদ্যাসাগর বাংলা পরিভাষা পরিষৎ সমিতির সভাপতির অনুরোধ প্রত্যাখান ক'রে। কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন উক্তির যাথার্থ্য। 'বঙ্কিমবাবু সভা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা।'৪২ বিরুদ্ধ প্রতিবেশে বিশিষ্ট চেতনার উন্মেষ 'কবি ও কোমল' এর মঙ্গলগীত রচনাতেই স্পষ্ট 'মানসী'র 'পরিত্যক্ত' কবিতার আত্মনির্ভরতা পৌরুষে আরো দীপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার প্রথম পর্বেই আমরা দেখি আভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতের পারস্পরিক টানাপোড়েন। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এর 'আত্মসংসর্গ' নিবন্ধে যেমন : 'আমাদের মন গোটাকতক ক্ষুধার সমষ্টি মাত্র। জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যের ক্ষুধা, আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত রহস্য।'৪৩ প্রচলিত বিশ্বাস ও পশ্চিমের দিক থেকে সঞ্চলন্ধ জ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন যেহেতু সেকালে অত্যাবশ্যক ছিল, কোনো সাধারণভাবে গৃহীত উত্তর ব্যক্তিগত প্রশ্নের চাপে মুটুচ ঠেকত না। জিজ্ঞাসুরা পথের সন্ধানে নেমে দেখতেন সহৃদয় কয়েক জনের সাহায্য ব্যতীত সাযুয্যের প্রত্যাশা অসম্ভব। উত্তরের জন্য নিজস্ব প্রতিভার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। গৌড়ীয় গবেষণায় অক্ষয়কুমার মৈত্রের উৎসাহ দেখে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ সখেদে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন : 'কিন্তু বাংলাদেশে যাঁহারা কোনো মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোক সঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের

অদৃষ্টে নাই।'৪৪ উনিশ শতকের চিন্তাতরঙ্গ সম্পর্কে আলোচনাকালে মনে রাখা দরকার সমাজের কোন কোটিতে তা আবদ্ধ ছিলো। সিদ্ধির ব্যক্তিগত এবং পারস্পারিক কৃতির অবধানে সিদ্ধান্ত তাহলে আরো স্থির হবে। আর বস্তুত বিশ্লেষণের এই মানদণ্ডেই রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের সমাধিফলকে সেকালের 'মর্নিং পোষ্ট' পত্রিকা নিচের ছত্র ক'টি উদ্ধৃত করতে চেয়েছিল ৪৫

'Tis in the advance of individual minds,
That the slow crowd should ground their expectation
Eventually to follow ; as the sea
Waits aye in its bed, till some one wave
of all the multitudinous mass extends
The empire of the whole, some feet perhaps
It leaves its fellows so long time ; thenceforth the rest
E'en to the meanest, hurry in at once,
And so much is clear gained.

নির্দেশিকা

রবীন্দ্র রচনাবলী (র. র.) পশ্চিমবঙ্গ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে অধিক প্রচলিত হওয়ায় উল্লেখ তাকেই বোঝাবে।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, র. র. খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৮৯৪

১৩। কৃষ্ণ চরিত্র, তদেব, পৃষ্ঠা ৯৩৪। বঙ্কিমের সঙ্গে তর্কে রবীন্দ্রনাথও সর্বত্র স্থৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি, দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যান ; ভবতোষ দত্ত ; রবীন্দ্র শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ, রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ'।

১৪। কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী খণ্ড, পৃষ্ঠা।

১৫। কৃষ্ণচরিত্র, আধুনিক সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৩০-৩১। ঐ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেন—'বঙ্কিম যেরূপে কার্লাইল্ লমার্টিন্ থুকিদিদীস্ প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন ; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি।'

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৮৯৬

১৭। In England a 'new biography' had been born soon after

1850, when the scientific spirit was gaining ground fast and Darwin, Huxley and Spencer had affected all thought. Realism was coming into fiction; sculptors ceasing to drape their statesmen in togas, were putting them into honest trousers. In biography the result of the new spirit was seen in such books as John Morley's **Voltaire**, his **Burke**, his **Rousseau** and his **Cobden**, works of a type not previously known in English. He abandoned chronological outlines—fixed his attention upon the inner man, and adopted oblique methods of portraiture. A rigidly critical attitude, avoiding all attempt at panegyric, permitted a keener insight. Froude in several brief biographies, notably his **Erasmus** and **Caesar** used a similarly incisive approach and drew a sharply-outlined portrait with great economy. These works were realistic without being irreverent or iconoclastic. —Quoted in **American Historians, A selection**, edited by Harvey Wish. 1962, pp. 413.

ডারউইন প্রসঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের আলোচনার উল্লেখ পূর্বে আছে, মরলি সম্পর্কে একটি মন্তব্য পাই 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে, 'একমাত্র মরলি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন।' আত্মশক্তি ও সমূহ, র. র. খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৭০৮।

১৮। কৃষ্ণ চরিত্র, আধুনিক সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৯৩১

১৯। ভূদেব, পৃষ্ঠা ৯৩৪।

২০। বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলী ২; পৃষ্ঠা ৩৩০

২১। ইতিহাস কথা, ইতিহাস র র খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৪৯০

২২। লোকশিক্ষা বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৩৭৭

২৩। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা; ভূদেব, পৃষ্ঠা ৩৩১

২৪। ঐতিহাসিক চিত্র, ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪৮২-৮৩

২৫। প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবনী সভায় দীক্ষাগ্রহনের কালে যে গানটি গেয়েছিলেন তাতে ছিল এমন পংক্তি 'যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল / তোমারি কাজ সাধিবে / যদিও এ আমি কলঙ্কে মলিন, / তোমারি নাম রাখিবে॥ / যদিও হে দেবী, শোনিতে আমার / কিছুই তোমার হবে না, / তবু ওগো মাতা, পারি তা ঢালিতে / এক তিল তব কলঙ্ক

কালিতে, / নিভাতে তোমার যাতনা ।।' ১৩১২ সালের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূজার দিন' (এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা / হাতে হাতে ধর গো) গানের তৃতীয় স্তবকের শেষাংশের মূল পাঠ'—আন বলির খড়্গ'—এবং ১৩১৪ বৈশাখ ৮ তারিখে রচিত 'সুপ্রভাত' কবিতাতে এই প্রস্তাবের জের দেখা যায়। দুটি রচনাই তখনকার কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। দ্রষ্টব্য :—'রবীন্দ্র চিন্তায় ভারতবর্ষ', প্রবোধচন্দ্র সেন, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ১১৭-১২৮।

২৬। রবীন্দ্র নাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, বিষ্ণু দে, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ২৯

২৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; চরিত্র পূজা ; র র খণ্ড ১১ ; পৃষ্ঠা ৩৭৯

২৮। মেঘনাদ বধ কাব্য ; সমালোচনা, র র খণ্ড ১৩ ; পৃষ্ঠা ৬০২

২৯। বউঠাকুরানীর হাট, সূচনা ; র র খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩

৩০। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি ; র র খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪০১

৩১। ছেলেবেলা র র খণ্ড ১০ ; পৃষ্ঠা ১৬৩

৩২। জীবন স্মৃতি ; ভূদেব ; পৃষ্ঠা ১৫

৩৩। ভূদেব ; পৃষ্ঠা ৯৯

৩৪। (জগৎ পীড়া ; বিবিধ প্রসঙ্গ ; র র খণ্ড ১৪ ; পৃষ্ঠা ৫১৮। এই প্রবন্ধের উল্লেখ না করলেও, এতে উদ্ধৃত টেনিসন এর' 'Flower in the crannied world'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধীপ্য দেখাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী 'গীতিমাল্য' আলোচনাকালে "তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ' এই শ্রেণীর কবিতা। ইহা হুইটম্যান বা এডওয়ার্ড কার্পেন্টার লিখতে পারিতেন। এ কাব্য এতোদূরদেশে জীবলীলার কাব্য।" (কাব্য পরিক্রমা ; অজিতকুমার চক্রবর্তী ; বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ১৪৬)।

৩৫। অনাবশ্যক, সমালোচনা ; পৃষ্ঠা ৩৮৩

৩৬। জীবনস্মৃতি : পৃষ্ঠা ১০১

৩৭ (ক)(খ)। ভূদেব ; পৃষ্ঠা ১২৩, ১২৪

৩৮। ভারত পথিক রামমোহন রায় , র র খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪২৩

৩৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃষ্ঠা ৩৬৮

৪০। ভূদেব ; পৃষ্ঠা ৪৭২

৪১। জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা ৪৮

৪২। ভগ্নহৃদয় ; পৃষ্ঠা ১০৫

৪৩। আত্মসংসর্গ, বিবিধ প্রসঙ্গ ; র. র. খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা, ৫৫৯

৪৪। ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ, ইতিহাস ; র র খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৭৯

৪৫। উদ্ধৃত দ্বারকানাথ ঠাকুর ; কিশোরীচাঁদ মিত্র, অনুবাদ বিজেন্দ্রলাল নাথ, সম্পাদনা, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, ১৯৬২, পৃষ্ঠা, ১৪৭

পুস্তক পরিচয়

১

স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জী। সঙ্কলক : শ্রীঅমলেন্দু দে ও শ্রীবিনয় ভূষণ রায়। ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি। প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮০ (জুলাই, ১৯৭৩)। অটো-প্রিণ্ট এ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস, কলিকাতা ৭০০০০৬। মূল্য ৮.০০। পৃষ্ঠা : ১০৭+ক-চ।

আলোচ্য গ্রন্থটি দেখে প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে জাগে তা হ'ল এই। ৮৮ বৎসর বয়সে সাধক ও জ্ঞান-তপস্বী যদুনাথের তিরোধানের (মে, ১৯৫৮) পর আজ ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কি করেছি বা করতে পেরেছি? তিন বৎসর পূর্ব্বে (১০ই ডিসেম্বর ১৯৭০) আচার্য্যের জন্ম শত বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে; উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবাংলায় আয়োজিত সভা সমিতিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছিল। যে এসিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহিত যদুনাথ ঘনিষ্ঠ ভাবে বিভিন্ন রকমে যুক্ত ছিলেন তাঁহারাও এক যৌথ সম্মেলনের আয়োজন ছাড়া আর কিছুই করেন নি। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে শ্রীনিশীথরঞ্জন রায় মহাশয় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করেন। ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত Bengal Past and Present এর একটি বিশেষ 'যদুনাথ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে। ইরাণ সোসাইটিও এক সভা আহ্বান করেন ও Indo-Iranica র এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রীনির্ম্মল কুমার খাঁর সম্পাদনায় 'শতদ্রুপা'র (মাঘ চৈত্র ১৩৭৭, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায়) আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়। শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু দ্বারা সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'তে (মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭, ষষ্ঠবর্ষ চতুর্থ সংখ্যায়) বর্ত্তমান সমালোচকের 'আচার্য্য যদুনাথের ইতিহাস দর্শন' শীর্ষক একটি মাত্র প্রবন্ধ বাহির হয়। কলিকাতার কয়েকটি বাংলা ও ইংরাজী দৈনিক কাগজের কিছু কিছু রচনায় আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়। 'The Statesman' এ ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর 'Columbus of Mughal History' (১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭০)

ও আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যদুনাথের মত বরেণ্য ঐতিহাসিকের জন্য আমাদের কি আর কিছুই করিবার ছিল না? কেবল মাত্র মহারাষ্ট্র সরকারের আরকিভ্‌স বিভাগ যদুনাথের স্মৃতিকল্পে ভীমসেন বুরহানপুরীর 'তারিখ ই দিলকুশা' ও 'হুক্কা ই দিলকুশার' ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (জানুয়ারী, ১৯৭২)। অবশ্য ১৯৭১ সালে ক্যালকাটা হিষ্টরিকাল সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে যদুনাথের সামগ্রিক রচনাপঞ্জী সঙ্কলন করবার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি তাহারই সুফল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের লেকচারার শ্রীযশোদেন্দু দে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়ভূষণ রায় মহাশয়ের কঠোর, আন্তরিক ও নিরলস যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই ইহার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে ডাফ্‌ ও এলফিনষ্টোন প্রভৃতি ভারতের আধুনিক বৃটিশ ঐতিহাসিকগণের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ শুরু হয়। মহারাষ্ট্র দেশে রাজওয়াড়ে (১৮৬৪-১৯২৬) ও বঙ্গে স্যার যদুনাথ (১৮৭০-১৯৫৮) ছিলেন এই বিরোধী আন্দোলনের প্রাচীনতম ও সর্বোত্তম পুরোধা। যদুনাথকে অনায়াসেই ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ ও বৃটিশ যুগের প্রথম পর্বে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার অনন্যরূপে ধরা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ও ইঙ্গ-ভারতীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন যোগসূত্র। র‍্যাঙ্কের মতই তিনি ঐতিহাসিক বিধি পদ্ধতি প্রণয়ন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূরি ভূরি পুস্তক রচনা করে যশোলাভ করেন। এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের গবেষণা পদ্ধতির সাথে আমরা সুপরিচিত,—যথা, মূল দলিল দস্তাবেজের ব্যবহার স্থান সমূহ পরিদর্শন; লিখিত সূত্রসমূহের ভাষা শিক্ষা; প্রামাণ্য বিষয় বস্তুর সত্যাসত্য যাচাই; খুঁটিনাটির সময় যথাযথ বিন্যাস; সুখপাঠ্যতা; রচনা শৈলী ও বিষয় পরিকল্পনায় ঐক্য সাধন।

কিন্তু যদুনাথের রচনাসম্ভারের সমৃদ্ধি ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমাদের কাহারও কিছু সঠিক ধারণা ছিল কি? এমন কি যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন বা মিশেছিলেন তাঁদেরও কি ছিল বা আছে? আলোচ্য গ্রন্থটী বিদ্বৎমণ্ডলীর সামনে এক নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ তুলে ধরবে। এখানে আমরা যদুনাথকে পাই শুধু ঐতিহাসিক হিসাবে নয়, এক সামগ্রিক সমাজ চেতনার মরমী ও মনস্বী

লেখক হিসাবে। সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, কলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি মানব জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের উপর তিনি আলোকপাত করেন। ইতিহাসের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে তাঁকে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে, তার বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে হয়েছে। তাঁর অর্দ্ধশতাব্দীরও কিছিদধিক ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা ভারতীয় ইতিহাস বিকাশে এক যুগান্তকারী ও বিপ্লবাত্মক অধ্যায়। তাঁর সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভার বিকাশ আমরা এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থের মধ্যে পাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে কূর্মের মত সুদীর্ঘ ৬৭ বৎসর (১৮৯১-১৯৫৮) ধরে তিনি যে অবিরাম অনুশীলন, প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও নিরলস পরিশ্রম করেন ও জীবনের শেষ পর্যন্ত যে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পারিবারিক শোক দুঃখের উর্দ্ধে উঠিয়া নিজের কাজ করে যান তা এক বিরাট তপস্যা বা সাধনারই সামিল। সেই তপস্যার ফসলের নমুনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এই নবীন সঙ্কলকবৃন্দ।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণ হচ্ছে এর শ্রেণী বিভাজনের পদ্ধতি। যদুনাথের রচনা গুলিকে এখানে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা, (১) প্রবন্ধ ও বক্তৃতা (পৃষ্ঠা ১-৫৩); (২) গ্রন্থ (পৃষ্ঠা ৫৫-৬৩); (৩) পুস্তক সমালোচনা (পৃষ্ঠা ৬৫-৮৩); (৪) ভূমিকা লেখন (পৃষ্ঠা ৮৭-৯৪); (৫) পরিশিষ্ট (পৃষ্ঠা ৯৫-১০১)। প্রত্যেক বিভাগের রচনাকে যথাসম্ভব আবার বিষয়ানুসারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গ্রন্থে সংযোজিত তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে যদুনাথ বিভিন্ন বিষয়ে ৫১৫ টী প্রবন্ধ, বিভিন্ন ভাষায় ৪৯টি গ্রন্থ রচনা ও ১৪৪টি গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা লিখে ৫৩ জন তরুণ লেখকদের বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও অনেক।

বিভাগ ১ ॥ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা : সংখ্যা—৫১৫

ক। ইতিহাস : মোট—২।

খ। ভারত :

১। সাধারণ, ২০; জীবনী, ২৯ ; ঐতিহাসিক তথ্য, ১৫ ; ঐতিহাসিক গবেষণা, ১৫ ; মধ্যযুগের শেষ পর্যায় (মুঘল যুগ), ২১ ; প্রাক—আওরঙ্গজেব, ৬; আওরঙ্গজেব, ২১ ; আওরঙ্গজেবের পরবর্তী কাল, ১৬ ; আসাম, ২ ; বাংলা, ৪৩ ; বিহার, ২ ; দিল্লী, ৫ ; বিদেশী ফ্যাক্টরী মিশন ও কর্মচারী সংক্রান্ত, ৩ ; মাদ্রাজ, ২ ; উড়িষ্যা, ৩ ; মারাঠা, ১২ ; শিবাজী,

৩১ ; শিবাজী—উত্তর অধ্যায় এবং বিদেশী মিশন ও কর্মচারী সংক্রান্ত, ৮ ; রাজপুত, ১৫ ; সামরিক ইতিহাস, ৪১ ; মোট—৩২৪ ।

৭ । ব্রটিশ শাসনের অধ্যায় : ব্রাটনের রাজা, ২ ; আঠারশ সাতান্ন, ২ ; ফরাসী কর্মচারী সংক্রান্ত, ১০ ; হায়দার আলি, ১ ; হায়দ্রাবাদ ও মহীশুর, ৫ ; শিখ, ২ ; টিপু সুলতান, ১ ; ওয়ারেন হেষ্টিংস, ১—মোট ২৪ ।

৮ । আধুনিক ইতিহাস : ২ , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ৬ কংগ্রেস, ১ ; শিক্ষা, ১৪ ; প্রবন্ধ আলোচনা ও সমালোচনা, ২৩ ; গোয়া, ৩ ; স্বাধীনতা, ৩ ; কাশ্মীর, ২ ; লাইব্রেরী, ২ ; ভাষা সমস্যা, ৮ ; এম, সি, সি, ২ ; জওহরলাল নেহেরু, ১ ; বঙ্গ বিভাগ, ২ ; বাংলার কৃষক, ১ ; রবীন্দ্রনাথ, ৮ , রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, ১৭ ; রামমোহন রায়, ২ ; উদ্বাস্তু সমস্যা, ১, স্মৃতিচারণ, ১৩ ; নবজাগরণ, ২ ; বিদ্যাসাগর, ১ ; মুসলমান সংস্কৃতি, ৯ ; ধর্ম, ১২ ; আমেরিকা, ইউরোপ ও পাকিস্তান, ৪ ; জাপান, ২ ; মোট—১৪১ ।

৯ । ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট প্রেরিত স্যার যদুনাথের পত্র ।

১০ । স্যার যদুনাথের বক্তৃতামালা : ২৩ : মোট—৩১৩ । [সংকলকদ্বয় এখানে স্যার যদুনাথের রচনার উপর ১৩টি মন্তব্য ও সমালোচনা সংযোজিত করেছেন । (পৃষ্ঠা : ৩২-৩৩)]

। বিভাগ : ২ ॥ গ্রন্থ :

বাংলা, ৬ ; ইংরেজী, ৩৫ ; হিন্দী, ৭ ; মারাঠী, ১ : মোট—৪৯ ।

বিভাগ : ৩ । গ্রন্থ সমালোচনা :

বাংলা ১১ ; ইংরেজী : ১০৫ ; হিন্দী : ৪ ; মারাঠী ১১ ; ফার্সী, ৩ ; পর্তুগীজ, ৩ ; পাঞ্জাবী, ১ ; উর্দু, ১ ; মোট—১৪৪ ।

। বিভাগ : ৪ । ভূমিকা :

বাংলা, ২০ ; ইংরেজী, ২২ ; মারাঠী, ৮ ; ফার্সী, ১, নেপালী, ১ ; হিন্দী ১ । মোট—৫৩ ।

॥ বিভাগ : ৫ । পরিশিষ্ট :

(এর মধ্যে সব মিলিয়ে ৫৩টী লেখা আছে)

বাংলা, ৫ : ইংরাজী, ২১ ; হিন্দী, ১৭ ; মারাঠি : ৬ ; [এর মধ্যে ইংরাজীতে লেখা চারটি অপ্রকাশিত রচনাও আছে]

তোপের নির্ঘোষের সঙ্গে তুলনীয় এই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি থেকে পাঠক যদুনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম, অপরিমেয় জ্ঞান পিপাসা, অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার, বহুমুখী প্রতিভা, ব্যাপক উৎসাহ, কৌতূহল ও আকর্ষণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারেন। তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু বাস্তবিকই বহু প্রসারিত-স্থানবিবরণ ও পরিসংখ্যান; জীবনী ইতিহাস শাসনতন্ত্র; অর্থনীতি প্রবন্ধ; ব্যাপক নিরীক্ষণ (Surveys); ধর্ম শিল্পকলা; স্থাপত্য লেখাসঙ্কলন (Corpus) ও সাময়িক ইতিহাস। যা কিছু তিনি স্পর্শ করেছেন তাই দ্যুতিমান হয়েছে। ইতিহাস চর্চা করলেও তিনি তাঁর প্রথম প্রিয় বিষয়, সাহিত্যকে ভোলেন নাই। এখানে আমরা তাঁকে দেখি শুধু অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক হিসাবেই নয়, সংবেদনশীল বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য প্রেমী হিসাবেও।

আলোচ্য তালিকাটি শুধু যদুনাথের রচনাবলীর ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য উদঘাটন করার জন্যই যে মূল্যবান তা নয়। একদা যে বিভিন্ন জার্ণাল, সাময়িক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্রিকাগুলি তাঁর বহুবিধ রচনা ও বক্তৃতার ভাষণে অলঙ্কৃত হয়েছিল ও যে সমস্ত প্রকাশন-সংস্থা তাঁর পুস্তকরাশি বিদগ্ধ সমাজে সহজলভ্য করেছে, ও যাদের মধ্যে কয়েকটি আজ বিস্মৃতির অতলে বিলীয়মান হয়ে গেছে তাদের নাম ও কিছু কৌতূহলপূর্ণ তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্যও ইহা বিশেষ মূল্যবান।

(ক) সাময়িক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি

১। ইংরাজী

Proceedings of the Indian Historical Records Commission: Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal; Prabuddha Bharat; Modern Review; Hindusthan Review; Indian Review; Bengal, Past & Present; Journal of Bihar & Orissa Research Society; Muslim Review; Islamic Culture: Calcutta Police Journal; Journal of Indian History; Indian Historical Quarterly: Bharat Itihas Samsodhak Mandala Quarterly; Journal of Hyderabad Archaeological Society; Science & Culture; Indo-Iranica; Journal of the University of Bombay; Birla Park Annual (Calcutta).

২। বাংলা :

ইতিহাস, বুলবুল, প্রভাতী, ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, নবনূর, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা), ভারত মহিলা, বেঙ্গল আর্কাল (পৃঃ ৮) শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী, শিক্ষক, মানসী ও মর্ম্মবাণী, দেশ, প্রাচী, সুহৃদ, বঙ্কিম প্রতিভা, উষা, অলকা, জাহ্নবী, মাসিক বসুমতী, নূতন পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যবিবরণ, কায়স্থ পত্রিকা, উত্তরা, রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বাঁশরী

৩। হিন্দী

বিশাল ভারত

৪। মারাঠী

ধনুর্ধারী, স্বরাজ্য, মহারাষ্ট্র সারদা।

খ। সংবাদ পত্র :

১। ইংরাজী

হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, ষ্টেটসম্যান, অমৃত বাজার পত্রিকা, সার্ভেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ইষ্টবেঙ্গল টাইমস্, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, অমৃতী প্রতাপ।

২। বাংলা

আনন্দ বাজার পত্রিকা, যুগান্তর।

গ। পুস্তক প্রকাশন সংস্থা :

১। বাংলা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ; মেদিনীপুর সংস্কৃত পরিষৎ।

২। ইংরেজী

এম. সি সরকার, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা ; এস সি সরকার, কলকাতা, এম. এন. সরকার, কলকাতা, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল (এ এস বি) ; পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ; বম্বে গভর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল প্রেস ; মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস (বম্বে) ওরিয়েণ্ট লংম্যানস, কলকাতা ; অক্সফোর্ড বুক অ্যাণ্ড ষ্টেশনারি কোঃ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; শ্রীপঞ্চাধেতী মাথরা মহানির্বানী বোস ব্রাদার্স, কলকাতা ; ডিপার্টমেণ্ট অভ্ আর্কাইভস (গভর্ণমেণ্ট অভ্ মহারাষ্ট্র, বম্বে) ; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (হোশিয়ারপুর) ; ইণ্টারন্যাশন্যাল বুক সার্ভিস্ (পুণা)।

৩। হিন্দী

হিন্দী গ্রন্থ রত্নাকর (বম্বে); শিবতলা আগরওয়ালা আণ্ড কোং, (আগ্রা), বানারসী দাস চতুর্বেদী (কলিকাতা); ভারত গৌরব গ্রন্থমালা (বম্বে) মধ্যপ্রদেশ হিন্দী গ্রন্থ একাডেমী।

যদুনাথের রচনা 'দি কেমব্রিজ হিষ্ট্রী অভ্ ইণ্ডিয়া'র (চতুর্থ খণ্ড) মত গ্রন্থের মধ্যেও মর্যাদার আসন পেয়েছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষানুরাগী সভা ও প্রতিষ্ঠান গুলি তাঁর রচনা প্রকাশের জন্য অত্যন্ত উৎসুক থাকিত এবং তাঁর কিছু রচনা সরদেশাই স্মারক গ্রন্থ, বি সি ল' স্মারক গ্রন্থ, জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রেসিডেন্সি কলেজ শতবার্ষিকী সংখ্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা এবং দেরাদুনের রোটারী ক্লাবের মেম্বারস বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই ভাবে আমরা আজও যদুনাথের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের 'রাশি রাশি ভারা ভারা' সোনার ফসল কুড়াচ্ছি। তাঁর যুগের গন্ধ এখনও আমাদের চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। শুধু বাংলা, মহারাষ্ট্র, এলাহাবাদ ও আলিগড়ে কোন কোন মহলে তাঁর পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞানের গভীরতা ও ইতিহাস রচনায় বিধি সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও উপহাসের গুঞ্জন শোনা যায়। (দ্রষ্টব্য, AL. Srivastava in Historians & Historiography in Modern India. Ed. by S. P Sen Calcutta, 1973 pp 141-2)। অভিমতের মিল না হইতে পারে। মিল না হইয়া বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু চরিত্র হনন অন্য ব্যাপার। যুগের সঙ্গে পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। একশ বছর আগেকার পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান পদ্ধতির মিল নাই। তাই বলে সেখানে কেউ Ranke, Mommsen, Bury বা Actonএর উপর দোষারোপ করে না।

কেহ কেহ অবজ্ঞাভরে বলেন যদুনাথ ফার্সী ও মারঠি ভাষা জানিতেন না। তাঁর 'শিবাজী' গ্রন্থে তিনি কোন কোন ভাষার লিখিত উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এই সাত কিম্বা আটটি ভাষার মধ্যে ফার্সী, মারাঠীও আছে। এই সকল ভাষা তাঁকে আয়ত্ত করতে হয় নিজের গবেষণার প্রয়োজন হিসাবে। যাঁরা যদুনাথের ফার্সী ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করব যেন তাঁরা জাতীয় গ্রন্থাগারে 'যদুনাথ সংগ্রহালয়ে' রক্ষিত বিবিধ ফার্সী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি গুলি নিরীক্ষণ করেন। বহু পাণ্ডুলিপি তিনি স্বহস্তে নকল করেছেন, পরিমার্জিত ও পরিশোধন করে যতি-চিহ্ন দিয়েছেন, অনুবাদ করেছেন। মৌলবীর সাহায্য তিনি এককালে (India of Aurangzib,

1901) নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী যুগে তিনি নিজেই নিজেকে সাহায্য করেছেন। তাঁর অনুবাদ সম্পূর্ণ ও যুগানুগ নাও হ'তে পারে কিন্তু গ্রন্থগুলির তথ্যের দিক থেকে কেউ ভুল পেয়েছেন কি? ঐতিহাসিকদের পক্ষে শুধু 'literal translation' বা আক্ষরিক অনুবাদে কতটুকু কাজ হয়? অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ হয় নাই বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কিন্তু যদুনাথ প্রধানতঃ ঐতিহাসিক, শুধু অনুবাদক নহেন। শুধু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক হলে তিনি অনুবাদকই থাকতেন, আর বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক হ'তে পারতেন না। আবার অনেকে বলেন যে তিনি শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন। গ্রন্থপঞ্জী হইতে এই অভিযোগের অসারতা প্রতীয়মান হবে।

আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে। যে যুগে যদুনাথের উন্মেষ তখন গবেষণার অর্থ ছিল কিছু বই থেকে চুরি [দ্রষ্টব্য যদুনাথের (A) Word to Research Workers in Indian History : Bengal Past & Present 1957 v 76.pp 1-5]। যদুনাথই প্রথম বিভিন্ন উপাদান থেকে মালমশলা নিয়ে বিশ্লেষণ করে ইতিহাস লেখার রীতি চালু করেন। তখন ঐতিহাসিকের প্রথম কাজই হল রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণ ভাবে লেখা। তিনি যে এই কাজ নিপুণ কারিগর হিসাবে সম্পাদনা করেছেন তা অবিসম্বাদিত। ইতিহাসের রাজপথ ঠিকমত তৈরী না হলে দুপাশের চর্যাগীতি উঠবে কি করে? সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি বাহুল্যের বিকাশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ৭০ বছর আগেকার ইতিহাস রচনা পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে তিনি যে নতুন পথ উন্মোচন ও সৃষ্টি করলেন সেই পথই অনুসরণ করে বর্তমানযুগে তাঁর উত্তর সূরীরা আরও নব নব পথ আবিষ্কার করলেন। ইহাই স্বাভাবিক। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপরও গুরুত্ব দেন। তিনি নিজেও দ্বিতিশীল জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন না। একথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। আমাদের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষদের তর্পণ দেওয়ার প্রথা আছে। পূর্ব্বসূরীদের অবদানও আমাদের মনে রাখতে হবেই। পথিকৃতের সম্মান ও মর্য্যাদা যদুনাথকে দিতেই হবে।

যদুনাথ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের ফলে আশা করা যায় তাঁর প্রতি এই ক্রমবর্দ্ধমান অবিশ্বাস, অবহেলা ও উপহাসের তরঙ্গ তিমিত হয়ে আসবে, ইতিহাস রচনার ইতিহাসে তাঁর ন্যায্য দাবী ও উপযুক্ত স্থান প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে ও তাঁর অবদানের যথার্থতা প্রতিপাদন করবে।

এক হিসাবে যদুনাথের জন্য এই তৎকালজিৎ কোনও প্রয়োজন নাই।

জীবদ্দশায় লোকে কি বলল তার প্রতি তিনি কোন দিনই ভ্রূকপাত করেন নি। যা সত্য বলে মানতেন তা লিখতে বা বলতে তিনি কোন দ্বিধা করতেন না। লোকের প্রশংসার জন্য তিনি কখনও অভিভূত হন নাই, তাঁর স্বকীয় নীতি বা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নাই। ইতিহাসের বিচারালয়ে যদুনাথ নিজেই যে তাঁর স্থান প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এই গ্রন্থপঞ্জীই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অতীতে যদুনাথের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল আংশিক মাত্র। ১৯৩৭ সালে ডঃ হরিদাস গুপ্তের সম্পাদনায় পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রথম খণ্ডে যদুনাথের রচনাবলীর যে তালিকটি সংযোজিত ছিল তা ছিল অসম্পূর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে তালিকাটি প্রকাশিত করেন সেটিও তাই। সে তুলনায় বর্তমান গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যাপক ও সামগ্রিক কেননা এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত যদুনাথের সম্পূর্ণ রচনার তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ইহা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত এই দুজন তরুণ সঙ্কলক পূর্ণ কর্তব্য চেতনায় এই কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। কেননা প্রকৃত কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিক ভক্তি ও সততা ছাড়া এই ধরণের গ্রন্থ সঙ্কলন করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ইহা নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করে ও ইতিহাসবেত্তা ও ইতিহাসানুরাগী মানুষের মনে ইহা স্থায়ী আসন লাভ করবে। একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে সঙ্কলকদ্বয় আসলে আচার্য যদুনাথের ক্রমে বিলীয়মান উদ্দীপনা ও মননশীলতার শেষ রশ্মিটুকু ধরতে পেরেছেন। নিস্বার্থ পরিশ্রমের সঙ্গে আধুনিক গ্রন্থাগারে প্রচলিত পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিরও প্রশংসনীয় সংযোগসাধনের ফলে এই সঙ্কলনের গুরুত্ব অমেয় ভাবে বেড়ে উঠেছে। এজন্য গবেষক ও উৎসাহী পাঠক উভয়ের কাছেই এই সঙ্কলন গ্রন্থটি সূত্র নির্দেশকারী গ্রন্থ হিসাবে অমূল্য হয়ে থাকবে। ইহা যে কেবলমাত্র বর্তমানযুগের অধ্যয়ন প্রেমী পণ্ডিতদেরই অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করবে তা নয়, আগামী দিনের অজ্ঞাত শিক্ষক ও ছাত্রদেরও এই প্রচেষ্টা, জ্ঞান-কোষ লিপ্সু আচার্যের সৃজনশীল সাহিত্য-সৃষ্টি, বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস রচনা ও সর্বোপরি সৎ, নিষ্ঠাবান কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সত্য যতই অপ্রিয় হোক না কেন সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার মহৎ আদর্শ অনুসরণ করবার প্রেরণা যোগাবে।

তবু এখনও অনেক কিছু বাকী রয়ে গেল। প্রথমটি হ'ল যদুনাথের অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশিত করা। দ্বিতীয়তঃ তাঁর লিখিত পুস্তক ছাড়াও আলোচ্য

রচনাপঞ্জীতে যে সমস্ত প্রবন্ধ, বক্তৃতাবাণী, পত্র, পুস্তক সমালোচনা, ভূমিকা ইত্যাদির হদিশ দেওয়া হয়েছে সেগুলির একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত করা। দুটি কাজই বহু সময়-সাপেক্ষ ও শ্রম-সাধ্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এই বরেণ্য ঐতিহাসিকের সমাজ চেতনা ও চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হওয়ার পক্ষে ইহা একান্তই অপরিহার্য্য।

জগদীশ নারায়ণ সরকার

২

ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্স—অমর দত্ত। মনীষা গ্রন্থালয়। দাম: ছয় টাকা

আজকাল ডিরোজিও সম্পর্কে অনেক বক্তৃতার সারাংশ কাগজে পড়ি, কিছু কিছু লেখাও দেখি। শ্রীযুক্ত অমর দত্তের বই পড়ার সুযোগ পেলাম। রচনা গ্রন্থপঞ্জী দেখে লেখকের শ্রমের সম্পর্কে আস্থা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সব সময় সমসাময়িক দলিল পত্র হয়ত পাওয়া যায় না কিন্তু সমসাময়িক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার তিনি সদ্ব্যবহার করেছেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে লেখক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। ডিরোজিওর, "প্রভাব সংক্রান্ত" ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখপত্র-পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, হিন্দু-পাইওনীয়ার ও বেঙ্গল স্পেকটেটর এর বক্তব্যের মূল্যবান সারাংশ তিনি দিয়েছেন। ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ অবদান সম্পর্কে লেখকের মূল্যবান মন্তব্যের উপযুক্ত সমাদর হবে আশা করা যায়।

নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

The box office is just a tenth part of our activities

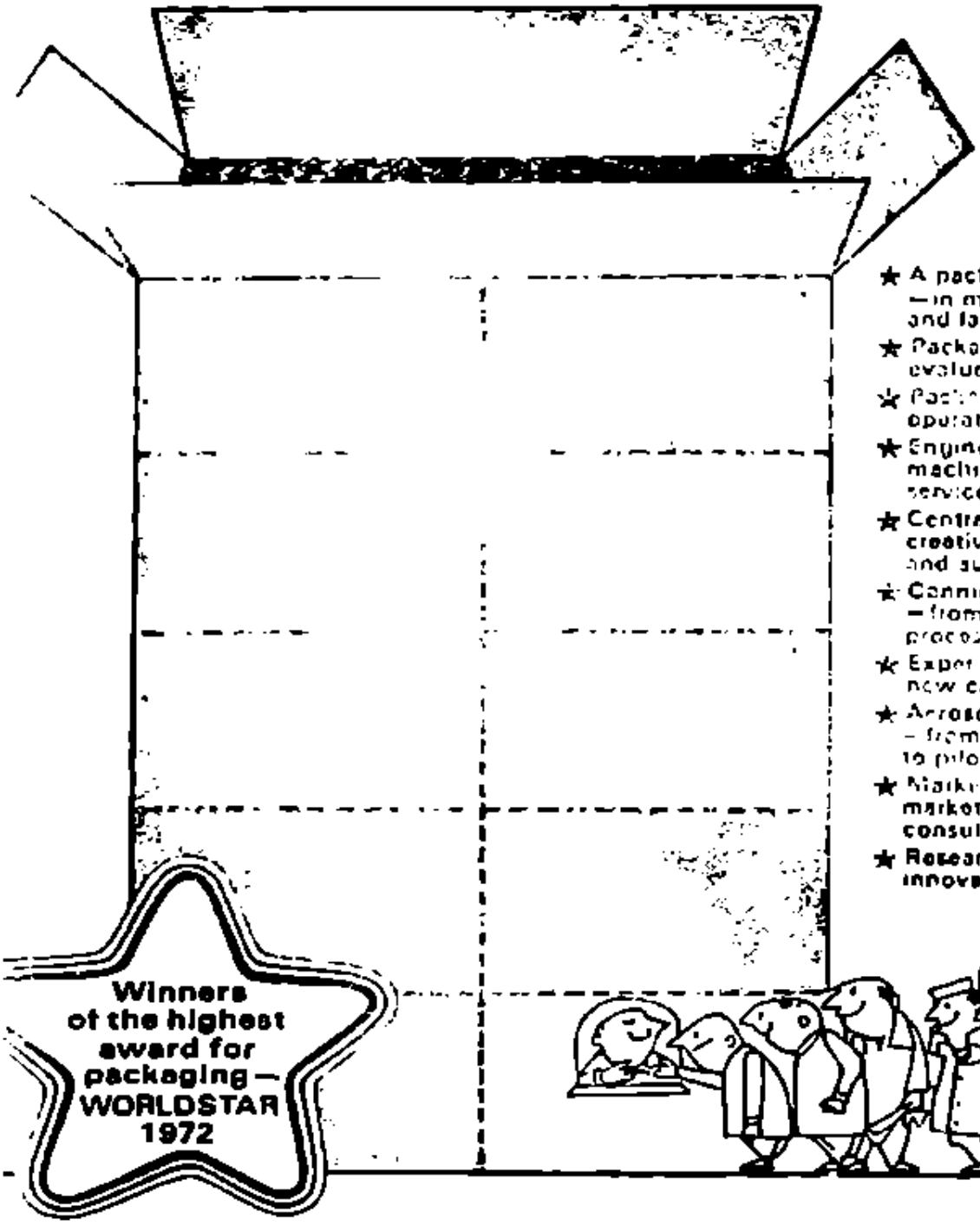

- ★ A package for every need — in metals, paper, plastics and laminates.
- ★ Package selection, development evaluation and testing.
- ★ Packaging machinery for operational efficiency.
- ★ Engineering services — from machinery adaptations to service engineering.
- ★ Central Design Service for creativity in packaging **shapes** and surface designs.
- ★ Canning Advisory Service — from cannery layouts to process control.
- ★ Experimental Kitchen for new canning concepts.
- ★ Aerosol Advisory Service — from product formulations to pilot facilities.
- ★ Marketing Services — from market intelligence to consultancy.
- ★ Research & Development for innovations in packaging.

Winners of the highest award for packaging — WORLDSTAR 1972

things are happening at Metal Box

...much more than metal boxes

ইতিহাস

৮ম খণ্ড] মাঘ-চৈত্র ১৩৮০ [৪র্থ সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(১৮)

রাজগৃহ থেকে ফিরে এলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯)। আসবার পর সবচেয়ে বড় কাজ হল পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে যে সব বাস্তুহারা কলকাতা এসেছিল তাদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে কিছুদিন আগে থেকেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। স্বাধীনতার প্রথম বলিদান পূর্ববঙ্গের অসংখ্য নরনারী, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু। যেভাবে এরা প্রথমে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রহৃত এবং পরে বিতাড়িত হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় একবস্ত্রে ভারতের সীমান্তে পৌঁচেছিল, তা চিরদিন স্বাধীন ভারতে কলঙ্ক ও নেহরু সরকারের চরম ঔদাসীন্য ও ও নিষ্ক্রিয়তার পরম নিদর্শনরূপে ভারতের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে। আর এই অবস্থা একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার ঘটেছে—কিন্তু ভারত সরকার চিঠিতে প্রতিবাদ জানান ছাড়া আর কিছুই করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ঠিক সেই নীতির অনুসরণ বা অনুকরণ করেন। দক্ষিণ কলকাতায় এই বাস্তুহারাদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়—আমি তার একজন সদস্য ছিলাম। লীলা রায়, মেঘনাদ সাহা এবং আরও কয়েকজন এর সভ্য ছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা বাহুল্য আমার নিজের দুটি অভিজ্ঞতার কথা শুধু বলব।

১৯৪৯ সনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাস্তুহারাদের দুর্দশা এবং তাদের

পুনর্বাসন সম্বন্ধে অনেক অভিযোগের কথা শুনে নিজে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য কলকাতায় এলেন। আমাদের সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন ; কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা সেটা বন্ধ করবার বহু চেষ্টা করেন। অনেক কষ্টে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া গেল। ১৭ই জুলাই সকালে আমরা দু'তিন জন পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি আরও দু'জন লোক সেখানে বসে আছেন—একজন গান্ধীজির পরম ভক্ত এবং বাংলা দেশের সুপরিচিত নেতা, দ্বিতীয়জন এক ভদ্র-মহিলা—তিনি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়া। এঁদের দু'জনের উপরেই বাস্তুহারাদের তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছিল। অবশ্য তাঁদের অধীনে আরও বহু তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং সরকারের টাকাও ব্যয় (অপব্যয় ?) হয়েছে যথেষ্ট ; অথচ সুব্যবস্থার অভাবে বাস্তুহারাদের দুর্দশার অবধি ছিল না। পণ্ডিতজীর কাছে আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে এসব অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতেই এঁরা তার প্রতিবাদ করলেন। আমি পণ্ডিতজীকে বললাম যে আমি জানতে চাই এই ভদ্রমহিলা কটি মেয়েদের ক্যাম্প নিজে দেখে এসেছেন। নেহরু তাঁর দিকে চাইলেন, তিনি মাথা নীচু করে রইলেন। তখন আমি বললাম যে সাক্ষাতের সময় মাত্র পনেরো মিনিট, এরই মধ্যে আমি কয়েকটি রিফিউজি ক্যাম্পে নিজে যা দেখেছি তাই আপনাকে জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমাদের সমিতির রিপোর্ট ছিল—তার সাহায্যে কোন তারিখে কোন ক্যাম্পে গিয়ে কি দেখেছি তার বর্ণনা করলাম। গান্ধীশিষ্য ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললাম যে এ বিষয়ে কতটুকু সংবাদ উনি নিজে জানেন বা খোঁজ নিয়েছেন তাও জানতে চাই। তিনি বললেন—আমি বহু ক্যাম্প দেখেছি—দুঃখ দুর্দশা আছে—কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি কয়েকটি ক্যাম্পের উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলাম—এদের সম্বন্ধে আপনি কি করেছেন ? অথচ এসব ক্যাম্পের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ তো আপনার কাছে পাঠান হয়েছে। তিনি বললেন তাঁর কিছু মনে পড়ছে না। আমি পণ্ডিতজীকে বললাম—আপনি যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে চান, তবে চলুন এখনই কোন নোটিশ না দিয়ে কয়েকটি ক্যাম্পে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব। এমন সময় পণ্ডিতজীর সেক্রেটারী এসে জানালেন যে আমাদের সাক্ষাৎকারের নির্দ্ধারিত সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। পণ্ডিতজী বললেন—না, আমার আরও অনেক কথা জানবার আছে। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। পণ্ডিতজী বললেন—আপনি যা যা

বললেন, এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে আমার সেক্রেটারীকে দেবেন। সেক্রেটারীকেও ডেকে তিনি সেকথা বললেন। বেরিয়ে এসে ঘড়ি দেখলাম—পনেরো মিনিটের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমি সেক্রেটারী ভদ্রলোককে বললাম যে সমিতির পক্ষ থেকে বিবরণ লিখে টাইপ করতে হবে, আজকের মধ্যে পেয়ে উঠব না—কাল কোন সময় কিভাবে এটা পাঠাব ? এই সব কথা বলছি এমন সময় পূর্বোক্ত ভদ্রমহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে বললেন—আপনারা যদি বলেন তবে আমি পদত্যাগ করতে রাজী আছি। আমি বললাম—আমার যা বলা কর্তব্য আমি তা বলেছি। এবার আপনার যা কর্তব্য তা আপনিই ঠিক করবেন ; আমার কিছু বলবার নেই।

এবারে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথাটি বলি। যখন দলে দলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লোক আসতে লাগল তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাদের মাথা গুঁজে থাকবার ব্যবস্থা করা। গত মহাযুদ্ধের সময় চাকুরিয়া লেকের ধারে আমেরিকান সৈন্যদের থাকবার জন্য অনেকগুলি টালি ও ইটের বাড়ি তৈরি হয়েছিল (তার কিছু কিছু এখনও আছে)। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব করলাম যে ঐ বাড়িগুলি উদ্বাস্তুদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রী রাজী হলেন না ; যুক্তি দেখালেন যে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসবে এটা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে। বললাম যে নীতির চেয়ে বাস্তব ঘটনা অনেক বড়। লোক দলে দলে দেশ ছেড়ে আসছে এবং আরও আসবে—এদের থাকবার ব্যবস্থাটা করাও শাশ্বত মানব-নীতির অনুমোদিত। আমরা টাকা পয়সা যেভাবে হয় যোগাড় করব, কিন্তু বাসস্থান যোগাড় করা শক্ত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই রাজী হলেন না।

এই প্রসঙ্গে অর্থ-মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলাম। কিন্তু তাঁরও নীতি ঠিক একই। তবে তাঁর একটি উক্তি পঁচিশ বছর পরে আজও আমার মনে আছে। তিনি আমার জেলারই লোক—যেখানে শতকরা সত্তর জন বাসিন্দা মুসলমান। আমি বলেছিলাম এ অবস্থায় যে-হিন্দুরা ওখানে থাকবে তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি অম্লান বদনে বললেন—হয় হবে। এর উপর টীকা অনাবশ্যক।

এ প্রসঙ্গ আর বাড়াব না। দীর্ঘকাল সংবাদপত্রে এবং সাময়িক পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি এবং প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছি যে হিন্দু-

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বিনিময় (exchange of population) ছাড়া এর প্রতীকারের আর কোনও উপায় নেই। দু'বছর আগে যখন বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্রোহ চলছিল এবং লক্ষাধিক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনও আমি এই মত ব্যক্ত করে সংবাদপত্রে লিখেছি এবং বলেছি এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ—বাংলাদেশ এখন ভারতবর্ষের সাহায্যপ্রার্থী—সাহায্য না পেলে তাদের উদ্ধার নেই। এ সময়ে যদি প্রস্তাব করা যায় যে সীমান্তের খানিকটা অংশ হিন্দুদের বসবাসের জন্য তারা ভারতকে ছেড়ে দেয় এবং তার বদলে পশ্চিম বঙ্গের যেসব মুসলমান বাংলাদেশে যেতে চায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে, তবে বাংলাদেশ তাতে মোটামুটি রাজী হতে পারে। কিন্তু এসব কথায় অন্য লোক দূরে থাকুক বাঙ্গালী রাজনীতিক ও পুরানো বিপ্লবী দলেরও সমর্থন পাইনি। তখন তারা সকলেই মনে মনে এই আশা পোষণ করছেন যে এইবার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন হল তা 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ'—অর্থাৎ আকাশে যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন বজায় থাকবে। এর জন্যে অনেক সভা সমিতি অনুষ্ঠান হয়েছে—আমাকে তাতে আমন্ত্রণ করতে এসেছে। আমি বলেছি—পাঁচটা বছর অপেক্ষা করুন। দু'একজন মন্তব্য করেছে—আপনি বিশ বছর চাকায় থেকেও এই কথা বলছেন? আমি বলেছি—আমি একুশ বছর চাকায় ছিলাম বলেই একথা বলছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী বন্ধুর ন্যায় পাশাপাশি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে, কিন্তু ভাই ভাই হয়ে এক বাড়িতে বা এক রাজ্যে বাস করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তা চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে—অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারের ভাব দূরের কথা প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্বও বজায় থাকবে না।

দু'-সাত মাস আগে (১৯৭০ সালের মাঝামাঝি) আমার বাড়ির খুব কাছেই একটি বাড়িতে ভূতপূর্ব প্রবীণ বিপ্লবীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে সেখানে অনেক আলোচনা হয়। আমার পূর্বোক্ত মত আমি যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থন করলাম। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেরই জন্ম পূর্ববঙ্গে। যে কয়েকজন এখনও পূর্ববঙ্গে বসবাস করছেন তাঁরা সকলেই আমার মতের সমর্থন করলেন। কিন্তু যাঁরা বহুদিন যাবৎ কলকাতায় আছেন এবং পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই তাঁরাই বিরুদ্ধ মত দিলেন যে হিন্দুদের বাংলাদেশেই বসবাস করা উচিত। তাঁদের ভাবটা মনে হল এই যে, যদি আমরা ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা আনতে

পেয়ে থাকি তবে মুসলমানদের কাছেন্যায্য অধিকারের দাবী জানাতে ও তা আদায় করতে পারব না কেন। আমি খুব বিনম্রস্বরে এর উত্তরস্বরূপ নিবেদন জানালাম যে আশা করি তাঁরা এবার বাংলাদেশে গিয়ে সসম্মান করবেন। সভার শেষে কুমিল্লাবাসী একজন প্রবীণ হিন্দু বিপ্লবী আমাকে বললেন যে তিনি আমার মত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং বাংলাদেশে যে-সব হিন্দুরা এখনও আছেন তাঁদেরও এই মত। কলকাতায় বসে যাঁরা আপনার বিরোধিতা করলেন তাঁরা দেশের খাঁটি খবর রাখেন না এবং দেখে নেবেন তাঁরা কখনও বাংলাদেশে ফিরে যাবেন না।

ইতিহাসের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মুজিবর রহমান যত চেষ্টাই করুন এবং সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভেদ বিলোপ করে এক জাতীয়তা স্থাপনের আদর্শ প্রচার করুন—হিন্দু-মুসলমান তুল্য অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে একত্রে বাংলাদেশে বসবাস করতে পারবে—এ আশা খুবই কম। মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্য মহৎ এবং তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গেই এই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হবেন—এ বিষয়ে আমি কোন সন্দেহ করি না। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান। সুতরাং তিনি যে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন ঘটাতে পারবেন—এরূপ আশা সুদূর পরাহত। অন্ততঃ দশ বছর না গেলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গে যে ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমানের চিরন্তন ঐক্য ও মিলনের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এর মধ্যেই তা বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে এসেছে। যে-সব হিন্দু এখনও বাংলাদেশে আছেন তাঁদের যে কজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে বাংলাদেশে হিন্দুরা মান সম্মান ও তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিয়ে থাকতে পারবে না। যদি তা সম্ভব হয় তবে সেটা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয় হবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কতদূর সম্ভব, অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির আলোচনা আবশ্যক।

পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর পঁচিশ বছর যাবৎ হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার বিস্তৃত কাহিনী আজও প্রকাশিত হয়নি। স্বনামধন্য বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) তাঁর "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তার যাথার্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ তিনি নিজে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেও জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ছিলেন এবং মৃত্যুর অল্প কয়েক

মাস আগে কলকাতায় এলেও আবার ঢাকায় ফিরে যাবেন এই সংকল্পই করেছিলেন। বিপ্লবীদের মধ্য তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি হিন্দুদের প্রতি মুসলমান সরকার ও সম্প্রদায়ের যে অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছে—তার জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরাই যে দায়ী এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে হয়তো উদাসীন ছিলেন; এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পরোক্ষ সহানুভূতি ছিল তথাপি মূলতঃ যে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের মুসলমানেরাই এ বিষয়ে যথার্থ অপরাধী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে কারণে তারা তখন হিন্দুদের দূর করে দিতে ব্যস্ত ছিল সে কারণ আজও বর্তমান আছে এবং বহুদিন পর্যন্ত থাকবে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ। অর্থাৎ হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই তাদের বাড়িঘর জমিজমা নগদ টাকা পয়সা সব অনায়াসে দখল করা যাবে, চাকরি বাকরি সম্বন্ধেও মুসলমানদের সুবিধা হবে ইত্যাদি। যে সব বাড়িঘর জমিজমা মুসলমানেরা দখল করেছে আজ মুজিবর রহমানের নির্দেশে তারা তা স্বেচ্ছায় বা সহজে ছেড়ে দেবে—এ আশা করা যায় না। কারণ মনুষ্যত্বের দাবিতে নিজের স্বার্থের দাবি বলি দেবে এরূপ মানুষের সংখ্যা সর্বদেশে সর্ব সম্প্রদায়েই খুব কম। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে এটা প্রত্যাশা করা যায় না। আইন করে শতকরা নব্বই জনের স্বার্থের হানিকর কোন ব্যবস্থা চালু করাও সম্ভব নয়। সুতরাং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকবে।

১৯৪৯ সনের কথা বলতে বলতে বর্তমানে এসে পৌঁচেছি; আবার ১৯৪৯ সনে ফিরে যাই। এই বছরে (১৯৪৯) পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে অনেক কমিটি ও কনফারেন্স হয়েছিল; তাতে আমি যোগ দিয়েছিলাম। East Bengal Minority Welfare Committee-র একাধিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছি। বিশেষ কোন ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। যতদূর খবর সংগ্রহ করেছি তাতে আবার বিশ্বাস বাস্তুহারাদের অশেষ দুর্গতি হয়েছিল এবং তার প্রধান কারণ সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা ও সততার অভাব। সরকারের যে টাকা খরচ হয়েছে তার অন্ততঃ অর্ধেক (সম্ভবতঃ বেশি) বাস্তুহারাদের দুর্গতি দূর করার জন্য ব্যয় হয়নি, কর্মচারীরাই আত্মসাৎ করেছে। আর কর্মচারীরা প্রকৃত কাজে খুবই উদাসীনতা দেখিয়েছে। কেবল কর্তব্য কাজে অবহেলা নয়, মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও তাদের এই কাজে উৎসাহ বা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তবে দুঃখের সঙ্গে সত্যের খাতিরে এর আর একটি দিক সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। যে সব বাস্তহারা বাঙালী এ দেশে এসেছিল তাদের চরিত্রবলের যথেষ্ট অভাব ছিল। দুর্দশা স্বীকার করে নিয়ে নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহ খুব কমই দেখা গেছে—অন্ততঃ আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তাই মনে হয়। বাস্তহারা একজনকে আমার বাড়িতে কাজ করতে নিযুক্ত করেছিলাম। সে একদিন কাজ করেই বাসনপত্র চুরি করে পালাল। স্বর্গীয়া লীলা রায় খুব পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে দুঃস্থদের, বিশেষতঃ মহিলাদের দুঃখ দূর করবার জন্তে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁকে একদিন বললাম যে আপনার ক্যাম্প থেকে আমার বাড়ির জন্ত একজন ঝাঁধুনী যোগাড় করে দিন। খাওয়া পরা, থাকা এবং মাসিক ২০/২৫ টাকা মাইনে—যে কোন জাতি হলেই চলবে। তিনি খুব খুশী হলেন, কিন্তু কয়েকদিন পরে আমাকে জানালেন যে আশ্চর্য্য ব্যাপার—যাকে যাকে বলেছি কেউ কাজ করতে রাজী হয়নি। তাদের উক্তি হচ্ছে—'আমরা কি পরের বাড়ি রাঁধবার জন্ত আইছি—দেশ ভাগ করলেন কেন—এখন আমাগো খাইতে পরতে দেওনের ভার আপনাদের।'

এর সঙ্গে তুলনার জন্তে পাঞ্জাবের বাস্তহারার একটি উদাহরণ দিই। এই সময় দিল্লী গিয়ে আমি এই ঘটনাটি দিল্লীর এক অধিবাসীর (অবাঙালী) মুখে শুনি। তিনি একজন পাঞ্জাবী বাস্তহারার মেয়েকে বাড়ির ঝি-গিরি করবার জন্ত নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়েটি বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে সব কাজই করত, কথা-বার্ত্তায় খুব ভদ্র, গৃহকর্ত্তা খুশী হয়ে তার মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি প্রাতর্ভ্রমণ সেরে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরে দেখেন যে বৈঠক-খানায় ঐ মেয়েটি খুব মন দিয়ে ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ছে। ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ইংরেজী জান? সে বললে—হাঁ। তারপর কথাবার্ত্তায় টের পেলেন যে মেয়েটি বি. এ. পড়ত, সেই সময় বুদ্ধা মা ও ছোট বোনকে নিয়ে পাঞ্জাব থেকে কোনমতে দিল্লীতে এসেছে, দু'তিন বাড়ি কাজ করে কোনমতে চালাচ্ছে। ভদ্রলোক তখন তাকে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্ত অনেক বেশী মাইনেয় নিযুক্ত করলেন।

অবশ্য দুটি একটি দৃষ্টান্ত থেকেই কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান উচিত নয়। তবে এই ঘটনাটি শোনবার পর আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি যে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তরা বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নানা রকমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে এবং মোটের উপর সেখানকার বাস্তহারা সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যেই মিটে গেছে। কারও

কারও মুখে শুনেছি যে ভারত সরকার নাকি এ বিষয়ে পূর্ববাংলার বাস্তহারাদের চেয়ে পাঞ্জাবী বাস্তহারাদের প্রতি অনেক বেশী সদয়তা দেখিয়েছেন এবং শীঘ্র ও সহজে তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে—এটাও তার একটা কারণ। এ সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য আমি জানি না তবে সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা দেখেছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এর কোন প্রতিবাদ করেছেন এবং পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের জন্য পাঞ্জাবী বাস্তহারাদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি তার দাবী করেছেন এমন কোন সংবাদ পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিম পাঞ্জাব কি মূল্য দিয়েছে সে সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব: "ছয় হাজার মৃত, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ গৃহচ্যুত ও বিতাড়িত; এক লক্ষ যুবতী ধর্ষিতা, অপহৃতা, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতা বা বিক্রীতা"। এই উক্তিটি ভুলতে পারি না। আর যখনই মনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এই মূল্য দিয়ে আমরা কি পেয়েছি?

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান ঃ একটি পরীক্ষা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

॥ অবতারণা ॥

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা গানের যুগ আবিষ্কার করেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এই গানের যুগ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত করেন।১ গদ্যভাষা যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন তার কোনো স্পষ্ট চেহারা বা স্বচ্ছন্দ গতি ছিল না। আড়ষ্ট, দুরূহ, জটিল, বহুস্তর গদ্যভাষার যুগে কবিতায় ও গানে বাঙালি মানসের প্রকাশ হয়েছিল ; আংশিক হ'লেও তা মূল্যহীন নয়। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে অসংখ্য গান লিখেছিলেন অসংখ্য কবি। গান ছিল সে-যুগের জন-সংযোগের প্রধান মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেকালের গানের বাণী ও সুর বাঙালির মনন ও জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার হওয়া দরকার।

অসংখ্য কবি ; অসংখ্য গান। এ-সব গানের নির্ভরযোগ্য সঙ্কলনের প্রচেষ্টা উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে জোরদার হ'য়ে ওঠে ; নানা কারণে তখন শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধের জোয়ার এসেছিল। কিন্তু তার আগেই বহু গীতকারের, বহু গানের, দুর্মূল্য দীপ্তি-সম্পন্ন বহু মণিমুক্তার কোন খোঁজ ছিল না। সংকলন, উৎকলন, যদিও বা হ'লো, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হ'লো না। সুর ও তালের উপরে জোর দেওয়া হ'লো ; কিন্তু গানের বিষয়বস্তুর নির্ঘণ্ট তৈরি হ'লো না।২ তার অভাবে আমাদের দেশের কথা-সাহিত্য, প্রাচীন কবিতা ও গান সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতিশ্রুতি বিপন্ন, অবহেলিত, এবং সম্ভবতঃ বিস্মৃত। বিষয় অনুসারে বাংলা গানের শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা করেন ব্রাহ্ম নেতা, সংস্কারক ও সাংবাদিক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় [১৮৪৫-১৯০৪]।৩ পরে বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'সঙ্গীতকোষ' [কলকাতা, ১৮৯৬] গ্রন্থে বাংলা গানগুলোর উনিশ রকমের শ্রেণী-বিভাগ করেন। তাতেও ছাপার ভুলে 'প্রণয়' ও 'বিরহ'-গীতি বাদ পড়ে যায়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রচলিত প্রেম-গীতির সংকলন 'প্রীতিগীতি' প্রকাশ করেন। বিপুল-কলেবর এই

সংকলনে নায়ক-নায়িকার বিশেষ বিশেষ মনোভাব, এবং তাদের প্রেমের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অনুসারে গানগুলো সাজানো আছে। বাংলা গানের অন্ত দুটি উল্লেখ-যোগ্য সঙ্কলন, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ' (কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, দুইখণ্ড), এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' (কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩১২)। দু'পরও বেশি বাঙালি-অবাঙালি গীত রচয়িতার পরিচয় এই দুটি গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের মধ্যকাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত গীত-সংকলনের সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি। "বটতলা"র প্রকাশকগণ এ-বিষয়ে খুবই তৎপরতা দেখিয়েছিলেন ; কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির সমৃদ্ধি বটতলার বইগুলোতে ছিল না ; কিন্তু ভুলে যাওয়া বাংলা গানকে মনে করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁদেরই বেশি।

গত শতাব্দীর তুলনায় এখন তো বাংলা গানের দুর্ভিক্ষ চলছে। এখন শুধু "আধুনিক গান", "রবীন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-নজরুল" সঙ্গীত, এবং কালেভদ্রে দু'চারটে "রাগ-প্রধান" গান হয় ; পল্লী-গীতি গাওয়া হয় সহরে সুরে। দু'চারটি সঙ্গীত-সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শুনবার জন্যে কিছু লোক রাত জাগেন। অথচ বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে অনেক রকমের গান উদ্ভাবিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিকশিত হয়েছিল কবি গান, পাঁচালী গান, ঝুমুর, তর্জা, চপ, টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, গজল্, খেমটা, 'পক্ষীর গান', ব্রাহ্মসঙ্গীত ; রামপ্রসাদী সুর ও বাউল সুর ওই সময়ে বিশিষ্ট, এবং সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। প্রাচীন গানের আধুনিক শিল্পী যে নেই, তা নয়। কিন্তু গানে যাকে "ডৌল" বলা হয়, সেই প্রাচীন গানের "ডৌল" আধুনিক গানে হয়তো থাকে না।

৷ ধর্ম-গীতি ও প্রেমগীতির সামাজিক পটভূমি ৷

পাদ্রি ওয়ার্ড তাঁর বইতে অনেক জায়গায় কৃষ্ণ-কীর্তন, কালী-কীর্তন ও পাঁচালীর উল্লেখ করেছেন।৪ কিন্তু এ-সব বিষয়ে তাঁর নাসিকা-কুঞ্চনের ফলে মূল্যায়ন খুবই বিঘ্নিত। পৌত্তলিকতা ও অশ্লীলতা ছাড়া বাংলা গানে ও যাত্রায় আর কিছু তাঁর চোখে পড়ে নি। ওয়াল্টার হামিল্টনের সাক্ষ্যের মূল্য কিছুটা মূল্য আছে। ১৮২০ সালে তিনি লিখেছিলেন :

> "Sometimes men amuse themselves singing hymns or love-songs accompanied by small drums ; but it is considered as very disgraceful for a modest woman to sing or play on any musical instrument. While rouring, the native boatmen

endeavour to lesson their fatigue by singing adventures of Krishna and Radha ; and it is among them that the only real melody is to be found, some of them greatly resembling the common Scotch and Irish airs."৫

তৎকালীন গান যে প্রধানতঃ ধর্ম ও প্রেম সম্পর্কে রচিত হয়েছিল, হ্যামিলটন্ তা লক্ষ্য করেছিলেন। ধর্ম ও প্রেম—এই দু'টি বিষয়ের উপরে মোটামুটিভাবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হরেক রকমের গান উদ্ভাবিত হয়েছিল। ওই সময়ের গানে ধর্ম ও প্রেমের যৌথ আধিপত্যের কারণগুলো বিচার করে দেখা যাক্।

ধর্ম ও প্রেমের উৎসার তো ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রাচীন (classical) সংস্কৃত সাহিত্যে ধর্ম ও প্রেমের ধ্যান-ধারণার বিচার করে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছিলেন, স্মৃতি এবং স্মার্ত-শাসিত সমাজের অবরুদ্ধ মানস মুক্তি খুঁজেছিল পৌরাণিক প্রেমকথার রস-সম্বন্ধ কাব্যিক রূপান্তরণে।৬ দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি 'সুভাষিতরত্নকোষ' নামক সংস্কৃত-সুভাষিত সংগ্রহের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে ধর্ম ও যৌনতার সমান্তরাল সংক্রামক হ'য়েছিল শুধু সামন্ত ও ধনী জমিদারদের আনন্দবিধানের জন্যে। দানিয়েল্ ইন্‌গল্‌স্ নামক মার্কিন অধ্যাপক অবশ্য কোশাম্বির এই মত মানতে রাজি নন্।৭

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং কোশাম্বির মত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কবিতা, গান যখন পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া হ'তে পারে না, তখন পৃষ্ঠপোষকদের রুচি, নীতি, এবং ইচ্ছার প্রভাব তার উপরে পড়বে, পড়েছে। প্রাচীন বাংলা গানের কথাই আলোচনা করা যাক্। যে-যুগে কবিগান, পাঁচালী, টপ্পা, আখড়াই, কিংবা হাফ আখড়াই উদ্ভাবিত হয়েছিল, সে-যুগের বিশেষ বিশেষ সামাজিক ঘটনার সঙ্গে এ-সব গানের সংযোগ ১৮৩২ সালেই দেখতে পেয়েছিলেন হুতোম প্যাঁচা। যখন তাঁর অনবদ্য ভাষায়, "মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজের প্রতাপ বেড়ে উঠল, কক্কিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলেন, গবো মুন্সী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলী রাজা হ'লো ...রামমুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকাতার কায়েত-বামুণের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হ'য়ে উঠলেন", তখন "হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কর্লে ; সহরের যুবক-দল গোখুরি, ঝক্‌মারি ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন, টাকা বংশ গৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন..."৮

ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী'তে হুতোমের সমর্থন আছে। ঈশ্বর গুপ্ত কবি, পাঁচালী, পক্ষীর গান ও আখড়াই গানের উদ্ভাবনায় রাজা নবকৃষ্ণের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।৯ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন, কলকাতার অভিজাত সমাজে 'বাঈ' নাচের প্রবর্তন হয়েছিল নবকৃষ্ণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায়।১০ টপ্পা-রচয়িতা এবং গায়ক রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) বহু রাজা, মহারাজা, দেওয়ান, জমিদার, মুৎসুদ্দি ও ব্যবসায়ীর সমর্থন, সাহায্য ও বন্ধুত্ব পেয়েছিলেন। সাময়িকপত্রিক টপ্পা-কার কালিদাস চট্টোপাধ্যায় অথবা কালী মীরজা ছিলেন বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচাঁদের সভাসদ্, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা গোপীমোহন ঠাকুরের পারিষদ্, এবং সম্ভবতঃ রামমোহন রায়ের সঙ্গীত-শিক্ষক।১১ সমকালীন গীতবিদ্ এবং টপ্পা-রচয়িতা রাধামোহন সেনদাস ১২২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেছিলেন 'সঙ্গীত-তরঙ্গ'। বইটি ছাপাবার জন্যে তৎকালীন কলকাতার শতাধিক বড়মানুষ তাঁকে সাহায্য করেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন একাধিক ইংরাজ। তাঁদের নাম বইটির ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে। ১২৫২ বঙ্গাব্দে বেনারসী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর—সেকালের জাতীয় সংহতির জীবন্ত প্রতীক—রাধাকান্ত দেব ও শতাধিক ধনী জমিদারের সাহায্যে ছাপিয়েছিলেন 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' নামক ভারতীয় গীত ও সুর সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি চার খণ্ডে ছাপা হয়। তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায়, একটি বিপুল তালিকায়, সাহায্য যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের নাম মুদ্রিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হ'য়েছে "নির্গুণ" ব্রাহ্ম গান, এবং "সগুণ" টপ্পা গান। সমকালীন রাজা-মহারাজাদের ধর্ম-গীতিতে প্রবল অনুরাগের একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, 'বাঙ্গালীর-গান'-এর "রাজা-মহারাজার গান" শীর্ষক অধ্যায়। এই অধ্যায়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র থেকে শুরু করে মহারাজ বিজয়চাঁদ পর্যন্ত ১৭ জন রাজা-মহারাজার গান সংকলিত হয়েছে। সব গানই রাজা-মহারাজারা লিখেছিলেন কিনা, জানা যায় না। তবে সমগ্র অধ্যায়ে কালীভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি সত্যি সত্যি তরঙ্গিণী হ'য়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু রংপুর জেলার কাকিনার রাজা মহিনারঞ্জন রায়চৌধুরী-রচিত গানে; তাঁর গানের বিষয়বস্তু সিরাজউদ্দৌলা, মিরণ, সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা, রামমোহনের মৃত্যু, দিল্লী ও কানপুরের সিপাহী-বিদ্রোহ, Sedan-এর যুদ্ধ (১৮৭০), বুলু যুদ্ধ (১৮৯৯), ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্য। মহিনারঞ্জনের বৈঠকখানা সম্পর্কে দুর্গাদাস লাহিড়ীর মন্তব্যটি চমৎকার; তিনি লিখেছেন:

"উহা বিলাসী রাজা-মহারাজাগণের অনুকরণে সজ্জিত নহে; তাঁহার

বৈঠকখানার দেওয়ালে, অর্দ্ধনগ্না বা নগ্নাঙ্গিনীর চিত্রের পরিবর্তে সুচিত্রিত মানচিত্রে সুশোভিত।"১২

মহিমারঞ্জনের অর্বাচীনত্ব এই নূতন রুচিবোধেই সুস্পষ্ট।

ধর্মবিষয়ক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত, টপ্পা, আখড়াই, পক্ষীর গান ও হাফ আখড়াই গানের উদ্ভাবনায়, এককথায় 'বৈঠকী' গানের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাসে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার 'নব্যধনী'রা ব্রাহ্মণ্য আচারের সমর্থক হ'য়ে পড়েন, সংরক্ষণশীল হ'য়ে ওঠেন, এবং অশ্লীল আমোদ-প্রমোদের দিকে ঝোঁক থাকলেও কখনো কখনো শিল্প-সাহিত্যে শালীনতার সমর্থক হন। অশ্লীলতা ও শালীনতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ সমকালীন গানে লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক সংশোধনের রূপরেখা, ১৮০০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টপ্পা-আখড়াই এবং "ওস্তাদি" কবিগানের ইতিহাস সুস্পষ্ট। বৈঠকী গানে অশ্লীলতার উৎসার দেখা যায়নি এ-সময়ে, যদিও পরবর্তীকালে বহু সমালোচক টপ্পা, আখড়াই, বা "ওস্তাদি" কবিগানকে "অশ্লীল" গান হিসেবেই বিচার করেছিলেন। লক্ষণীয়, স্বয়ং হুতোম প্যাঁচা আখড়াই ও হাফ আখড়াই গানের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখেন নি। অথচ পার্থক্য ছিল, এবং তা নেহাৎ কম ছিল না। ১৮০০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত কবিগানের কিছু কিছু নমুনা ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী'তে আছে; তাতে অশ্লীলতার সন্ধান করা পণ্ডশ্রম। গুপ্ত-কবি-সংকলিত "কবিগান" স্পষ্টতাবেই ছিল "ওস্তাদি" কবিগান।১৩ অথচ এ-কথাও ঠিক যে, "নবরঙ্গ-কুলপতি" নব্যধনীদের রুচি তখনো পর্যন্ত খুব মার্জিত ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে "প্রোথোক্তি ছেড়ের লেস্‌সা গান" শুনে সকলের "খল খল শব্দে হাস্য নির্গত" হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন।১৪

গানও শিল্পের ক্ষেত্রে যা ছিল সংশোধন, ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে তা হ'লো সংস্কৃতীকরণ। নব্যধনীরা সংরক্ষণশীল হয়ে উঠলেন। রাজা নবকৃষ্ণের হিন্দুয়ানির বিস্তৃত বিবরণ স্মরণীয়।১৫ স্বয়ং রামমোহন পৈতা ছাড়তে পারলেন না। দ্বারকানাথ ঠাকুর "একেশ্বরবাদ" মেনে নিলেন, "কিন্তু তিনি স্বীয় পরিবারে প্রচলিত পূজাদি কখনও তুলিয়া দেন নাই, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সে-সকল পূজা নিজেও পরিত্যাগ করেন নাই।"১৬ হুতোম প্যাঁচা নব্যধনী "পদ্মলোচন" সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> "পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুখোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাব্‌লেন; ব্রাহ্মণের পায় ধুলো খান; পা চাটেন; দলাদলির ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন .."১৭

॥ রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীত ॥

ধর্ম-বিষয়ক বাংলা গানের আলোচনায় শুরুতেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সাধন-সঙ্গীত উল্লেখ্য। কোনো কোনো ঐতিহাসিক রামপ্রসাদী গানে "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য" দেখেছেন; ভবতোষ দত্ত লিখেছেন, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরণের সূচনা করেছিল। প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, রামপ্রসাদ (১৭২০-১৭৮১)-এর সাধনায় ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা আভাসে দেখা গিয়েছিল।১৮

রামপ্রসাদের গানের দুটি বৈশিষ্ট্য এই আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রথমতঃ কালী সম্পর্কে নিতান্ত ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার প্রকাশ তাঁর 'সাধন-সঙ্গীত'-এ অত্যন্ত স্পষ্ট; এ-ধরণের স্পষ্টতা তাঁর আগে বাংলা কবিতায় বিরল। "শ্যামা" তাঁর গানে কাহিনীর নেপথ্যবর্তিনী নায়িকা নন; তিনি তাঁর "মা"। এই নূতন ধারণার কাব্যিক ও সাঙ্গীতিক রূপায়ণের অভিনবত্ব কবি ঈশ্বর গুপ্তকে মুগ্ধ করেছিল; তিনি রামপ্রসাদকে বাংলার "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" কবি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ভক্তি-ভাবের উন্মেষ, সংসারকে নিছক "মায়া" বলে অগ্রাহ্য করা, এবং কুটিল সাম্প্রদায়িকতা রামপ্রসাদী গানের বৈশিষ্ট্য নয়। সংসার সম্পর্কে রামপ্রসাদের উন্মীলিত দৃষ্টি তাঁকে সমকালীন জীবনের অনেক অভাব, দুঃখ, বঞ্চনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল; তাঁর সাধন-সঙ্গীতের মূল সুরটি গভীর দুঃখ-ব্যঞ্জক। তাঁর বহু গানেই সাংসারিক প্রসঙ্গ এসেছে, যেমন :

আমায় দেও মা তবিলদারী,
মন রে! কৃষিকাজ জান না,
ভবের আসা, খেলব পাশা,
এবার বাজি ভোর হ'লো,
মা গো তারা ও শঙ্করি।
আর বাণিজ্যে কি বাসনা,
তাই আমি অভিমান করি,
তুমি এই ভাল করেছ মা। আমায় বিষয় দিলে না;
আমি তোমার খাস তালুকের প্রজা,
আমি নই আটাশে ছেলে,
জানিলায় বিষয় বড়,

ওরে শমন। কি ভয় দেখাও।
মায়ের এমনি বিচার বটে,
আমি নই পলাতক আসামী,
এ-সংসারে ডরি কারে,
হয়েছি মা তোর ফরিয়াদী,
করুণাময়ী কে তোরে বলে দয়াময়ী
মা, আমার বড় ভয় হয়েছে,
মরি গো এই মনোদুখে
জানি গো জানি গো তারা, তোমার কেমন করুণা,
আমি তোর আসামী নইরে শমন—

ইত্যাদি প্রথম চরণযুক্ত গীতে রামপ্রসাদ জমিদারী পরিচালনা, চাষবাস, আইন-আদালত, এবং নিজের দারিদ্র্য বিষয়ে বহু কথা লিখেছেন।১৯ একটি গানে যম "কালেক্টর" রূপে বর্ণিত। অপর গানে শমন "ইস্তাহার পাট্টা" পেয়েছে।২০ সাধনালব্ধ আনন্দের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁর সাধন-সঙ্গীতে জীবন-যন্ত্রণার সুর খুবই স্পষ্ট। "মরি গো এই মনোদুঃখে...ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুখে," কিংবা, "করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী — কারো দুঃখেতে যাতায়া...আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ" প্রভৃতি গানে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিবরণ মর্মন্তুদ। কাব্যে কবির দারিদ্র্য-বর্ণনা নূতন নয়। পাবনা-অঞ্চলের কবি জীবন মৈত্র ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মাপুরাণ' নামক কাব্য লিখেছিলেন; তিনি নিজেকে "বেগারী ভিক্ষুক" রূপে বর্ণনা করেছেন; "কবির খাওয়ার কিছু নাই", একথাও তিনি লিখেছেন।'২১ কিন্তু রামপ্রসাদের মতো তিনি কারুর কাছে অভিযোগ, অথবা অভিমান করেন নি।

রামপ্রসাদী গানের পার্থিব প্রসঙ্গ কালী-সঙ্গীত রচনার আদিকে পরিণত হয়েছিল। সাময়িক শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা রাজা নরচন্দ্রের একটি গানে তালুক, জমিন্, বকেয়া, কাননগু, হস্তবুদ্, পাটোয়ারি, তহশিল্ মুহুরি, খাজাঞ্চি, নিলাম ইত্যাদি কথার ব্যবহার লক্ষণীয়, এ-ধরণের গান নিঃসন্দেহে রামপ্রসাদ প্রভাবিত।২২ উনিশ শতকে বিভিন্ন কবি রচিত বহু শ্যামা-সঙ্গীতেই বিষয়চিন্তা ও অষ্টরাত্রির কথা আছে; একজন কবি "চিন্তারাম চাপরাশী"র গৌরাঙ্গের বর্ণনা করেছেন।২৩ একজন কবি লিখেছেন :

"বিধি! তোমায় একবার যদি সশরীরে পাই রে,
চিরদিনের গায়ের জ্বালা মিটাইতে।
তেলা মাথায় তৈল ঢালা,
যে হাবা, তায় কর কালা!
বড়লোকের শাল দোশালা, আমার বেলা নাই রে!"২৪

অপর কবি সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চুরি করার সংকল্প করেছেন, কিন্তু বলেছেন :

"চুরি করব তোর পা দুখানি, তাও কি শিব নিয়েছে?"২৫

রামপ্রসাদ 'আগমনী' গানও লিখেছিলেন, এবং 'শিবায়ন'—জাতীয় কাব্যের কাহিনী-নিবদ্ধ ঘটনাটিকে তিনি নূতন কবিতায়, নূতন সুরে প্রায় নূতন করে সৃষ্টি করলেন। তাঁর পর থেকে 'আগমনী' হয়ে উঠল বিবাহিতা কন্যার বছরে একবার বাপের বাড়ী আসার গান। 'আগমনী'র শিব ভস্মাচ্ছাদিত, শ্মশানবাসী, দরিদ্র, এবং সম্ভবতঃ কুলীন। মা মেনকার মুখে স্বামীর দারিদ্র-বর্ণনা শুনে পার্বতীর অভিমান কোনো কোনো গানে বর্ণিত হয়েছে। 'আগমনী' গানে মাতৃ স্নেহের মধুক্ষরণ বাংলা কবিতার নতুন সম্পদ; অসংখ্য কবি 'আগমনী' লিখেছেন। এ-গানের মধ্যে বাঙালির জীবনে দুর্গাপুজার গুরুত্ব বোঝা যায়; একজন কবি লিখেছেন :

"সেই যে দশমী দিনে, কাঁদাইয়া দীন হীনে,
আসব ফিরে আশা দিয়ে গেছে বিদায়,
কত শত দুঃখ পেয়ে, আছি-মা, সে-মুখ চেয়ে,
আসিবি আনন্দময়ি! আনন্দে হেথায়...
বর্ষপরে হর্ষভরে, প্রবাসী আসিবে ঘরে,
সরমে আশার বধূ বদনটী লুকায়,
ছলেতে ছেলেরে নব বসন পরায়।"২৬

শেষ পর্যন্ত রামপ্রসাদী ভঙ্গিতে এমন সব গান লেখা হয়, যাতে বাঙালি-মানসের বিশ্বজনীন উদারতা অনুভবনীয়, যেমন :

"চাই মা আমি বড় হতে।
আমি আর পারি নে থাকতে বাঁধা, আমার অহং শৃঙ্খলেতে।
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে।
হবে তোমার পুত্র, আমি ক্ষুদ্র, সন্তানের, মা, লজ্জা তাতে"।২৭

মঙ্গলকাব্যের সাময়িকতা ও ক্ষুদ্র ঐতিহ্য থেকে রামপ্রসাদের তৈরি আঞ্চিকের মাধ্যমে শাক্ত-ঐতিহ্য এ-ধরণের বিশ্বজনীন রূপান্তরণের মধ্যে, সীমাবদ্ধ, সুসংস্কারাচ্ছন্ন, মধ্যযুগীয় বাঙালি মানসের ধীরে ধীরে সার্বজনীন সভ্যতা ও আদর্শের সঙ্গে সামুজ্য স্থাপনের আকাঙ্খা প্রতিবিম্বিত হয়েছে ; বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তর এ-ধরনের গানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ কবিগান ও আখড়াই গান ॥

বাংলা দেশের যে-সব জায়গায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ছিল (যেমন বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া, কালনা-কাটোয়া, শান্তিপুর-নবদ্বীপ, পানিহাটি-খড়দহ, খেতুরী-বহরমপুর ইত্যাদি), সে-সব জায়গায় নূতন বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব হয় নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বাইরে সহজিয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে ঐক্যসূত্র-স্থাপনের দিকেই ছিল সহজিয়া-ঝোঁক। বরং বলা যায়, কলকাতার নাগরিক পরিবেশে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, 'কবিগান' নামক নূতন বৈষ্ণব কবিতা ও গানের আবির্ভাব হ'লো।

কবি, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী গানের সাহিত্যিক মূল্যায়নের সঙ্গে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন, এ-সব গান "অশ্রদ্ধেয় এবং অশ্রাব্য"। কবিগানের কবিতা সম্পর্কে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের বিচার খুবই কঠোর হয়েছিল।২৮ অথচ না মেনে উপায় নেই, রাজা নবকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের আমলে কলকাতার নাগরিক কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট উপাদান ছিল কবি ও আখড়াই গান। কবি ও পাঁচালী গানের অসামান্য জনপ্রিয়তার ফলে গেরাসিম্, লেবেডফ্-এর বঙ্গীয় নাট্য-মঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।২৯

"শরদধিকার" ও "বসন্তাধিকার" নামক দু'টি পর্যায়ে, সময় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সুরে কবিগানে সখী-সংবাদ ও বিরহ প্রাধান্য পেত। গানের ভাববস্তু নেওয়া হয়েছিল বৈষ্ণব-কাব্য থেকে ; কিন্তু পদাবলীর আঙ্গিক কবিগানে ব্যবহার করা হ'লো না ; তার জায়গায় এলো চিতেন, পরচিতেন, মুকা, মেলতা, মহড়া, খাদ, দ্বিতীয় মুকা, দ্বিতীয় মেলতা, অন্তরা। কবিগানের এই ক্রমবিন্যাস কবে প্রথম হয়েছিল, তা বলা যায় না। পদাবলীর বিশিষ্ট সুর কবিগানে রইল না। সেখানে এলো "শরদধিকার"-এ বেহাগ, জয়জয়ন্তী, ভৈরবী ও বিভাষ, আর "বসন্তাধিকার"-এ সখী-সংবাদ ও বাহার-বসন্ত। তিওট, আড়া, ধামার, এবং কোনো কোনো' ওস্তাদি' কবিগানে ঠুংরি তাল চলতে লাগল।৩০

প্রাচীন কবিগান সম্পর্কে তিনটি সুনির্দিষ্ট কথা আছে।

প্রথমত: সুর ও তালের বিচারে 'ওস্তাদি' কবিগানের উপর সমকালীন "রঙ্গিন" হোরি-গান, কিংবা হোলি-গানের প্রভাব বিচার্য, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-সম্পদ, কিংবা আধ্যাত্মিকতা যেমন হোরিগানে দেখা যায় না, তেমনি কবিগানেও তা দেখা যায় না। হোরিগানের যে-সব দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাতে কথ্য হিন্দীর ব্যবহার স্পষ্ট ; ব্রজবুলির চিহ্নমাত্র সে-সব গানে নেই। ব্রজবুলির চিহ্ন কবিগানেও নেই ; হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি (১৭৪৯-১৮২৪), নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১), রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮), নীলু ঠাকুর (মৃত্যুকাল, ১৮২৫), এবং সমকালীন কবিয়াল লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস যে-সব কবিগান লিখেছিলেন, তাতে কথ্য ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।৩১ যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষে, এবং উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দুই দশকে, যে-সব 'ওস্তাদি' কবিগান রচিত হয়েছিল, সমকালীন টপ্পা-গান বা আখড়াই গানের মতো তার কাব্যিতা ও সুর উত্তর ভারতে প্রচলিত হোরি, টপ্পা, ঠুংরি গানের সুর ও কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল,—তবে কি ভুল হবে ? কবিগানের বিশেষণরূপে 'ওস্তাদি' কথাটি অনেকেই ব্যবহার করেছেন।৩২ ওস্তাদি নি:সন্দেহে হিন্দুস্থানী 'রঙ্গিন গান' থেকেই এসেছিল, এবং সে-বিচারে সমকালীন বাঙালি রুচিতে হিন্দুস্থানী প্রভাব নেহাৎ নগণ্য ছিল না।

দ্বিতীয়ত: 'ওস্তাদি' কবিগানের যুগে বাংলার গ্রাম ও সহরের মধ্যে বিশেষ কোনো দূরত্বক্রিয়া পার্থক্য ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষে কলকাতার যে-দুটি মানচিত্র এঁকেছিলেন রুদ্ বার্চন্ এবং আপজন্, তাতে কলকাতা সহরের গ্রাম্যরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।৩৩ সুরের ওস্তাদি সত্ত্বেও কবিগানে সম্ভবত: এই কারণেই "খেউড়" পর্যায়ে গ্রাম্যতার সংক্রাম সমকালীন শ্রোতাদের সমর্থন লাভ করে। টপ্পা-অঙ্গের আখড়াই গানে দেবর-ভ্রাতৃবধূর যৌন-সম্পর্কের ইঙ্গিত নি:সন্দেহে ছিল গ্রাম্য 'খেউড়' প্রভাবিত। কবিগানের কোনো কোনো পর্যায়ে "লহর" নামক গান গাওয়া হ'তো।৩৪ "লহর"-এর অশ্লীলতা সম্ভবত: অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে শান্তিপুর অঞ্চলে উদ্ভাবিত হয় ; "লহর" গাওয়া হ'তো টপ্পার ভঙ্গিতে। তবে একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই কবিগানের খেউড় ও লহর আগের চেয়ে সভ্য ও সংস্কৃত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সখী-সংবাদ ও বিরহের বাণীর সরলতা বিসর্জিত হয়নি ; রাম বসুর কোনো কোনো গান ভাষার বিচারে এতই আধুনিক যে, তা পড়লে চমক লাগে। একটি উদাহরণ :

মহড়া

"তোমার প্রেম হোতে প্রাণ, বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে।

পীড়িৎ হোলো আর ফুরালো, চোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে বসেছে।"৩৫

গানটি রাম বসুর রচনা ; অথচ এটি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি, তিনি তাঁর অন্য একটি গান, "গেল গেল, ফুল ফুল, যাক্ ফুল, তাহে নই আকুল", সম্পর্কে খানিকটা শ্লেষোক্তি করেছেন।৩৬

তৃতীয়তঃ, শোনা যায়, খেউড় পর্যায়ে কবিগানে সামাজিক প্রসঙ্গ তোলা হ'তো। কিন্তু সামাজিক প্রসঙ্গ-যুক্ত প্রাচীন খেউড়-এর নির্ভরযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে রাম বসুই প্রথমে আসরে বসে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়ার রীতি চালু করেন।৩৭ তারপর থেকে খেউড় আগে থেকে লিখে রাখার রেওয়াজ উঠে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হরুঠাকুর সম্ভবতঃ একটি প্রগলভ শ্লেষোক্তি করার ফলে রাজা নবকৃষ্ণের বিরাগভাজন হন। প্রমথনাথ মল্লিকের মতে কোনো কোনো কবিগানে পৃষ্ঠপোষকদের রূপগুণের বর্ণনা থাকত, যেমন :

"বাবু তো লালাবাবু, কোলকাতাতে বাড়ী।
যেগুন পোড়ায় নুন দেয় না, সে ব্যাটা তো হাঁড়ী।"

অথবা,

"মোষের ন্যায় মুন্সীবাবু, মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায়, চেহারাখানা ভালো॥"

এ-ধরণের গানে পুরানো ভাঁড়দের ভাঁড়ামীর ছাপ দেখা যায়। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস রচিত একটি গানে, "জগৎমান্য অগ্রগণ্য ঠাকুরে পিরালী দায়", এবং "বেতশুন্ধ নীলমণি হালদার" উল্লিখিত।৩৯

সংকলিত কবিগানে সামাজিক প্রসঙ্গ তেমন দেখা না-গেলেও, কবিদের অলিখিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে সামাজিক দুর্নীতির, ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটির, এবং অসামাজিক ব্যবহারের বর্ণনা তো থাকতই। বিদ্যাসাগর নাকি বলেছিলেন :

"বাঙ্গালাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম প্যাঁচার ন্যায় লেখক, এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।"৪০

"প্রাচীন" কবিগান এক সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন তাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে কবিগান লিখেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন

বসু। দুজন পণ্ডিতও কবিগান লিখতেন ; তাঁরা হলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এবং ভারাশঙ্কর তর্কবাচস্পতি।৪১

কবিগানের প্রাবাল্যের যুগেই রাজা নবকৃষ্ণের সভাগায়ক নুলুইচন্দ্র সেন এবং তাঁর ভাগনে নিধুবাবু ১২১২-১৩ বঙ্গাব্দে কলকাতায় আখড়াই গান সৃষ্টি করেন। সমকালীন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রুচিভেদের ফলে আখড়াই গান উদ্ভাবিত হয়। খেউড় ও লহর গানের টুন্‌কো সুর ও এ্যাবাতা বিদগ্ধ সঙ্গীত-শিল্পীদের সমর্থন পায়নি। বিদগ্ধ, কালোয়াতি আখড়াই গানের আবির্ভাব তৎকালীন কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। নিধুবাবু কলকাতার দু'টি "সংশোধিত" আখড়াই দল গঠন করেন। দুটি দলই ছিল "সখের দল"। আখড়াই গানে নিধুবাবু আদিরসের উৎসার কমিয়ে দিয়ে ভক্তিভাবা ব্যবহার করতে থাকেন, এবং আখড়াই-এর ঐকতান বাদ্যের যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করেন।

আখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের নিয়ম ছিল না। মনোমোহন বসু লিখেছেন : "প্রত্যেকটি দলের একটি ভবানী বিষয়, একটি খেউড়, একটি প্রভাতী, এবং মাঝে মাঝে অপূর্ব সাজবাদ্যেই রাত্রি কাটিয়া প্রচুর বেলা হইয়া পড়িত।"৪২

ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণিত আখড়াই গানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। প্রথমতঃ, আখড়াই গানের ভবানী-বিষয়, খেউড় ও প্রভাতী পর্যায়ে দুটি দলের দু'টি দু'টি করে মোট দু'টি গান হ'তো। রামনিধি গুপ্ত রচিত আখড়াই গানে দেখা যায়, ভবানী-বিষয়ে দুর্গার স্তব, এবং খেউড় ও প্রভাতী পর্যায়ে বেলানিতে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ আছে। এ-থেকে বোধ হয় সিদ্ধান্ত করা চলে যে, আখড়াই গানে শাক্ত এবং বৈষ্ণব গানের আলাদা আলাদা ভাববস্তুর নিষ্প্রভ ঘটানো হয়েছিল। সে-দিক্ থেকেও আখড়াই গানে প্রাগ্রসর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কবিগানেও কখনো কখনো "ভবানী-বিষয়" গাওয়া হ'তো।

দ্বিতীয়তঃ, আখড়াই গানের প্রাণ ছিল সাজের বাজনা। উচ্চাঙ্গ কালোয়াতি সুরে বাজানো হ'তো বেহালা, সেতার এবং ঢোল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা" নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বাঙ্গালি চুলির মতো ঢোল বাজাতে আর কেউ পারে না। আখড়াই গানের ঢোল বাজনার যে বর্ণনা গুপ্ত-কবি দিয়েছেন, তাতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবী অমূলক ব'লে মনে হয় না। আখড়াই অনুষ্ঠানে ঢোল বাজিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন বৈষ্ণব দাস, এবং বাগবাজারের রসিকচাঁদ গোস্বামী, যোড়াসাঁকোর "ছাটা বলাই", নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য ও রূপচাঁদ। বেহালা বাজিয়ে নাম করেন দোগাছকুঁড়ের পার্বতীচরণ বসু এবং

বাগবাজারের রাধানাথ সরকার। সেতার বাজনায় বিখ্যাত হয়েছিলেন মাধবচন্দ্র ঘোষ। কুলুইচন্দ্র সেন ও নিধুবাবু এ-সব বাজনা ছাড়াও ব্যবহার করেছিলেন তানপুরা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খঞ্জরী, সিটি, সপ্তস্বরা, জলতরঙ্গ, বীণা ও বেণু। কিন্তু আখড়াই গানে ঢোলের বাজনাই ছিল বিখ্যাত; উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় "অদ্বিতীয় বাদ্যকর" ছিলেন গোলাম আব্বাস্। তিনি আখড়াই-ঢোল শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। কুলুইচন্দ্র ও নিধুবাবু ছাড়া আরো দু'জন আখড়াই সুরকারের নাম করেছেন গুপ্তকবি। একজন যোড়াসাঁকোর দুর্গাপ্রসাদ বসু। অপরজন গোবিন্দ মালা। গরাণহাটায় ছিল তাঁর বাড়ী। গোবিন্দ মালা "রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্ম সভায় ব্রহ্ম সংগীত গান করিত।"৪৩

তৃতীয়তঃ, নিঃসন্দেহে বলা যায়, আখড়াই ছিল বৈঠকী গান। গানের মধ্যে কতটা কালোয়াতি থাকলে দু'টি গান আর অন্তর্বর্তী সাজ-বাজনা'য় রাত ভোর হ'য়ে যেতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ লোকদের জন্যে আখড়াই পরিকল্পিত হয় নি। আখড়াই ঠিক্ "জনসঙ্গীত" ছিল না।

নিধুবাবু ও কুলুইচন্দ্র সেনের আখড়াই গানের বিরাট সাফল্য দেখে উত্তর কলকাতার নব্যধনীরা পাথুরিয়াঘাটা, যোড়াসাঁকো, গরাণহাটা, শোভাবাজার, শ্যামপুকুর, নিমতলা ও রামবাগানে সখের আখড়াই দল গঠন করেন।

শেষ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গ আখড়াই গান লুপ্ত হয়ে গেল হাফ আখড়াই গানের আবির্ভাবে। নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও গ্রাম্য রুচির মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য রুচি জয়লাভ করল। নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন বাগবাজার নিবাসী দেওয়ান রামচরণ বসুর পৌত্র, "কন্দর্পকান্তি" মোহনচাঁদ বসু। তৎকালীন কলকাতার শ্রেষ্ঠ গায়ক ও নিধুবাবুর ঘরানার সুরকার মোহনচাঁদের খ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ১২৩৮ বঙ্গাব্দে কবিগানের অনুকরণে সৃষ্টি করলেন "হাফ আখড়াই গান"। হাফ আখড়াই ছিল কবিগান ও আখড়াই গানের সংমিশ্রণ মাত্র। কবিগানকে বলা হ'তো "দাঁড়া কবি," আর হাফ আখড়াই ছিল "বসা কবি"। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল "তবল ফুকা" নামক একটি ক্রম। এই গান মোহনচাঁদ প্রথমে গেয়েছিলেন বেছোবাজারের রামমোহন মল্লিকের বাড়ীতে, ১২৩৮ বঙ্গাব্দের ৯ই মাঘ, শনিবারের রাত্রিতে। নূতন গানের আবির্ভাবে পুলকিত একজন সংবাদদাতা 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এই অনুষ্ঠানের খবর দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে আনন্দিত মোহনচাঁদ "গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশানা তুলিয়া রাজ-পথে গমন করত স্বগৃহে গমন করেন"।৪৪

কিন্তু আখড়াই গানের অন্যতম স্রষ্টা নিধুবাবু হাফ আখড়াই গানের আবির্ভাবে খুবই দুঃখিত হন। তিনি নাকি বলেছিলেন :

"কি! আমার এত সাধের—এত অসীম বিদ্যাবত্তার পদার্থ যে আখড়াই, তাহাকে ঐ মূর্খ টা কিনা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া কবির গানে দাঁড়া করাইল, অমূল্য নিধি লইয়া বানরের গলায় পরাইল।"৪৫ হাফ আখড়াইয়ের মূল্য বিচারে নিধুবাবু ভুল করেন নি। শেষ পর্যন্ত এই গানের ভাব ও ভাষা খুবই অশ্লীল, এবং, বলতে দুঃখ হয়, সেই অনুপাতেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।৪৬ হুতোম-বর্ণিত "খোপা পুকুর" হাফ আখড়াই দলের নেতা 'মুখুজ্জেদের ছোটবাবু' ছিলেন "ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা" হাফ আখড়াই দলের দোহাররা ছিল "তেলী, চাকাই কামার ও চাষা-খোপা।"৪৭

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', 'মনোমোহন গীতাবলী', এবং 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রহের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থে হাফ আখড়াই অনুষ্ঠানের অনেকগুলো বিবরণ আছে। এ সব গ্রন্থে ১২০৮ থেকে ১৩২৫ পর্যন্ত শুধু কলকাতায় ১৯টি অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মদনমোহন মৈত্রের বাড়িতে 'বিধবা বিবাহ' সম্পর্কে হাফ আখড়াই গান গাওয়া হয়; এই অনুষ্ঠানে "ইতর ভাষা" ব্যবহার করা হয়নি।৪৮ অনুষ্ঠানের তারিখগুলি বিচার করে মনে হয়, সরস্বতী পুজা, দোল, চড়ক, দুর্গাপুজা ও জগদ্ধাত্রী পুজা উপলক্ষে হাফ আখড়াই গান গাওয়া হ'তো। এই সব পুজা উপলক্ষে অশ্লীল গান গাওয়া কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারী মতে বৈধরূপে গণ্য হয়েছে।৪৯ ষাটের দশকে এসে দেখা যায়, সরস্বতীপুজা কলকাতার ও মফঃস্বলের গণিকা-মহলে খুব বেশি প্রচলিত ছিল।৫০ আবার, অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যাতে বিশুদ্ধ ধরিনাম সঙ্গীত হাফ আখড়াই আঙ্গিকে গাওয়া হয়েছিল।৫১ কাজেই হাফ আখড়াই গানের অন্তর্নিহিত অশ্লীলতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

॥ পাঁচালী ও 'পক্ষীর দল'-এর গান ॥

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ধর্মগীতির একটি বড় অংশ পাঁচালী। পাঁচালী অনেকেই লিখেছিলেন, যেমন, লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ (অথবা গঙ্গারাম) নস্কর, ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১-১৮৭৬), দাশরথি রায় (১৮০৯-১৮৫৭), রসিক রায় (১৮২০-১৮৯২) জয়গোপাল রায় (১৮৩১-১৮৭৬), আনন্দ শিরোমণি (বঙ্গাব্দ-১২১০ খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৭)।

প্রাচীন পাঁচালী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত পাঁচালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সাধারণতঃ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আখ্যায়িকা প্রধান ধারাটিকে পাঁচালী বলা হ'তো। রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গল-কাব্য সমূহ এসবই গণ্য হ'তো পাঁচালী হিসেবে, 'কাব্য-কাহিনী' রূপে। কিন্তু উনিশ শতকের পাঁচালীর ঠিক কাব্য-কাহিনী ছিল না। নূতন ধরণের এই পাঁচালীর প্রবর্তক ছিলেন গঙ্গানারায়ণ নস্কর, যিনি নবকৃষ্ণের আমলে শোভাবাজারে বাস করতেন। সুশীলকুমার দে লিখেছেন, নূতন পাঁচালীর স্রষ্টারূপে গঙ্গানারায়ণের কৃতিত্ব কখন কখন স্বীকৃত হয়েছে।৫২ ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে "প্রসিদ্ধ পাঁচালীওয়ালা" রূপে উল্লেখ করেছেন, এবং পক্ষীর দলের কাছে গিয়ে ছড়া-কাটার ব্যাপারে পরাজিত হ'য়ে গঙ্গানারায়ণের "অম্বলচাকা ভোম্বলদাসের ন্যায় ফ্যা ফ্যা করিতে করিতে ছুটে" পালিয়ে যাবার বর্ণনাও করেছেন।৫৩

নতুন ধরণের পাঁচালীর লক্ষণ কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বিষয় বস্তু, প্রয়োগকলা, সুর ও বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির সঙ্গে উনিশ শতকের পাঁচালীকারদের সামুয্য স্থাপনের প্রচেষ্টার ফলে মধ্যযুগীয় পাঁচালীগানের রূপান্তরণ হয়।

পাঁচালী-লেখকদের মধ্যে দাশরথি রায় অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।৫৪ কিন্তু যদিও উচ্চাঙ্গ কালোয়াতি গানে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, তথাপি অনেকে তাঁকে ঠিক কালোয়াত হিসেবে গণ্য করেননি। ১৮৩৫ সালে রচিত 'সমাজকুচিত্র' বইতে কয়েকজন বাঙালি ওস্তাদের নাম করা হয়েছে, যেমন চুঁচুড়া নিবাসী রামচন্দ্র শীল, রামকানাই মুখোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হাটখোলার রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ভবানীপুরের ভোলানাথ চৌধুরী, শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী, বঁড়িশার চন্দ্রনাথ গুপ্ত, কলকাতার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু বাবু, কবিওয়ালা রাম বসু, হরু ঠাকুর, "ঠাকরুণ বিষয় গায়ক" রামপ্রসাদ সেন, "টপ্পাওয়ালা" নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক, এবং পক্ষীর দলের গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী ও ধীরাজ। সেতারবাদক হিসেবে আশুতোষ দেব, রাজনারায়ণ বশাক, সিঁদুরের শ্রীনাথবাবু (নবাববাবু) শিবচন্দ্র পাল, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র গোস্বামীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। মৃদঙ্গবাদক রাম চক্রবর্তী, কেশবচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চানন মিত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দাশরথি রায় সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"পাঁচালিওয়ালা দাশরথি রায় বড় মন্দ কবি ছিলেন না। তিনি উত্তম

গীত বাঁধতে পারতেন···তাঁহার উপরাগরসিকতা প্রবল দেখে গায়কদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা যায় নাই।"৫৫

প্রয়োগকলা, সুর, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ে দাশরথি পরিবর্তনশীল রুচির সঙ্গে যোগ রেখে পাঁচালী লিখেছিলেন। কিন্তু তবুও না মেনে উপায় নেই যে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, এবং সম্ভবতঃ তাঁর রক্ষণশীলতার প্রভাব পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য পাঁচালীলেখকদের উপরেও পড়েছিল। নৈতিক বিষয়ের উপর রচিত তাঁর দুটি পাঁচালীতে ('কালিরাজার উপাখ্যান ও চার ইয়ার', এবং 'বিধবা বিবাহ') রক্ষণশীলতার মনোভাব সুস্পষ্ট। 'বিধবা বিবাহ' পাঁচালীতে তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরে লিখেছেন: "হিন্দুর দেশে" বিধবা-বিবাহ হয় নি, হবে না। বরঞ্চ

"হাতের তেলোয় উঠবে লোম,
মুহ নিশিতে উঠবে লোম,
বাঘ ডাকিবে মুহু মুহু রবে।
শিমুল ফুলে হবে মধু
বসিবে কমলিনীর বধূ
হিজ্‌রের গর্ভেতে পুত্র হবে।"৫৬

সনাতন ধর্মে অনুরাগী দাশরথি 'কর্তাভজা' পালায় বারাকপুরের ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উপরে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন; "নেড়ানেড়ি" সম্প্রদায় নিন্দিত হয়েছে "স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব" পালায়। কতগুলো পাঁচালীতে নিধুবাবু ও শন্নি পিক্কার টপ্পা নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হয়েছে,এবং বহু পাঁচালীতে "বাবু" বাঙালির উপরে বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। লক্ষণীয়, পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় রচিত পাঁচালীতেও সামাজিক রক্ষণশীলতা সুস্পষ্ট।৫৭

দাশরথি রায় পৌরাণিক পাঁচালীতেও নিজের যুগকে টেনে বসিয়েছিলেন; "শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ" পালায় রামের আমলের মহিলাদের নাম দেওয়া হয়েছে "ক্ষান্তী, রান্তী, বিমলী, পাঁচী, পদী, মুংলি", এবং তাদের শাড়ীর নাম হয়েছে "বারাণসী, আমদানী, পটাপটি, জম্ম-এয়োস্ত্রী, নীলাম্বরী, বুটদারি, কেরেপ, লালকিনারী, মলমল"। দাশরথি বালুচর শাড়ীর উল্লেখ করেননি। "কক্মিনী-হরণ" পালায় বিবাহ-বাসরে ইংরাজি-বাজনা বাজানো হয়েছে।৫৮

দাশরথি-রচিত পাঁচালীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো গণিকাপল্লীর গণিকা-প্রেমের এবং গণিকাদের বর্ণনা। এ-সব পাঁচালী প্রকাশ্যে গাওয়া হ'তো। তবে

গণিকা-প্রশংসা তাঁর পাঁচালীতে নেই। লোকরঞ্জন শিল্প হিসেবে কবিগান ও হাফ আখড়াই গানের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ছিল পাঁচালী, এবং এই ব্যাপ্তির একটি কারণ ছিল উপমার ব্যবহার। বস্তুতঃ পাঁচালীর উপমা ও তাতে প্রচলিত প্রবাদের ব্যবহার পাঁচালীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ; এ-বিষয়ে দাশরথির কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।

পাঁচালীর নবরূপে আবির্ভাবের কালেই, সম্ভবতঃ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাজা নবকৃষ্ণের পারিষদ নিধুচন্দ্র ঠাকুর একটি "পক্ষীর দল" গঠন করেন। শোভা বাজারের একটি আটচালা ঘরে বসে পক্ষীর দলের মুসকদের গল্পিকা-লেখন, আড্ডা দেওয়া, এবং পাখীর বুলির অনুকরণে ছড়া-কাটা ও গান করার বিবরণ দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত।৫৯ পরে শিবনাথ শাস্ত্রী পক্ষীর দলকে গাঁজাখোর ও দুশ্চরিত্র যুবকদের দল হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।৬০ শোভাবাজারের পক্ষীর দলের অনুকরণে বাগবাজার, পৌ-বাজার এবং সম্ভবতঃ কলকাতার অন্যান্য পল্লীতেও এই দল গড়ে ওঠে। এক সময়ে শোভাবাজারের পক্ষীর দলের সঙ্গে নিধুবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত, এবং নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গুপ্তের মতে নিধুবাবু পক্ষীর দলে যুবকদের গান শেখাতেন ; উভয়ে বলেছেন, পক্ষীর দলের যুবকরা "ভদ্রসন্তান", "উপস্থিত কবি", '-উপস্থিত বক্তা"।৬১ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হুতোম লিখেছিলেন,

> "এখন আর পক্ষীর দল নাই,.....পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা আদরলা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙ্গা ও টাকার খাকৃতিতে নবনরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন....."৬২

কিন্তু ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'ক'নের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে' নামক প্রহসনে, অনৈক "রায় মহাশয়"-এর সেজো ছেলে একটি পক্ষীর দলে "গুগ্‌গো টুনটুনি" নামে পরিচিত ছিল বলে লেখা হয়েছে। তাছাড়া, এ-সময়ে রূপচাঁদ পক্ষী গীতরচয়িতা ও গায়করূপে খুবই নাম করেছিলেন।

হাফ আখড়াই গানের বিপুল জনপ্রিয়তার ফলে পূর্বের পাঁচালীগান ও পক্ষীর-দলের গানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল। হুতোম লিখেছেন :

> "পাঁচালি ছোট কেতার আফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশির ভাগ....."৬৩

অর্থাৎ, কখনো কখনো পাঁচালী হাফ আখড়াই গানের মতো গাওয়া হ'তো, তবে

সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটা হতো। অথচ পাঁচালীগানের ক্রমবিন্যাসে ঠিক হাফ আখড়াই-এর অনুরূপ দেখা যায় না। সত্যি সত্যি হুতোমের সময়ে পাঁচালী কিভাবে গাওয়া হ'তো, তা জানার উপায় নেই।

পক্ষীর দলের আদিম গান ও তার সুর অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে উড়িষ্যা থেকে কলকাতায় 'বলঙ্গা'য় আগত গৌরহরি দাস মহাপাত্রের পুত্র রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র ওস্তাদ-কালোয়াতদের কাছে গান শিখে "কতকগুলি ভদ্রসন্তান"-সংগঠিত "পক্ষীর জাতিমালা নামক সখের পাঁচালীর দল"-এর নেতৃত্ব লাভ করেন। রূপচাঁদের জন্ম হয়েছিল ১২২১ বঙ্গাব্দে। ১২৯৩ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন।

"পক্ষীর জাতিমালা"কে সখের পাঁচালীর দলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে; তা থেকে বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোনো একটা সময়ে আদিম পক্ষীর দলের সঙ্গীত-ঐতিহ্য পাঁচালীর অনুষঙ্গে নতুনভাবে গঠিত হয়, এবং এ-বিষয়ে হয়তো রূপচাঁদই পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর গানের কলাকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, আশুতোষ দেব, রমানাথ ঠাকুর, নিধুবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত এবং আরো কয়েকজন সঙ্গীত-রসিক বড়মানুষ তাঁকে "পক্ষীরাজ" উপাধি দিয়েছিলেন।৬৪ লক্ষণীয়, পূর্বে উল্লিখিত 'সমাজকুচিত্র' বইতেও রূপচাঁদ "ওস্তাদ" গায়করূপে স্বীকৃত হয়েছেন। বাংলাগানের আসরে পুরানো খাঁচের যে-সব গান প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল, তাদের বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেন রূপচাঁদ। তিনি নিজে "পাঁচালী হাফ আখড়াই.....রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল, যাত্রা, অপেরা, চপ, কবি, হেঙ্রা, গাজনের সঙের গান, হেঁয়ালী" প্রভৃতি লিখে-ছিলেন।৬৫ "পক্ষী" উপাধি ছিল বলে রূপচাঁদকে "পাঁজাখোর" বলে উড়িয়ে দেওয়া একেবারেই ঠিক্ হবে না।

রূপচাঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দাশরথি রায় প্রভৃতি পাঁচালীকারদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট মিল ছিল। রূপচাঁদও রক্ষণশীল ছিলেন। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত কবি ও পাঁচালীগান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয়, কারণ এক সময়ে সহরের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালি ও গ্রামের লোকদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব দেখা গিয়েছিল, তার একটি বড় কারণ ছিল পাঁচালী জাতীয় গানে, কবিগানে "ঘোর কলি"র বর্ণনা, এবং সনাতন হিন্দুধর্মের লোপ পাওয়ার বিবরণ। এ-সম্পর্কে পরে কিছু কিছু তথ্য দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে তখন কালীকীর্তন, "চণ্ডীর গান", দুর্গাভক্তি ও গঙ্গাভক্তি মূলক গান, কৃষ্ণলীলার গান, চপকীর্তন, তরজা, ঝুমুর, শুক-শারালী ও কৃষ্ণ-শারালী

প্রভৃতি গান গ্রামে ও নগরে প্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদ রচিত কালীকীর্তনের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেছিলেন পাদ্রি ওয়ার্ড।৬৬ দুর্গাভক্তি ও গঙ্গাভক্তির গানের দলের কিছু কিছু বিবরণ হুতোমের কোনো কোনো নক্‌শায় আছে, "চণ্ডীর গান" সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> "জগা খাঁকুরা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নেই ; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতিদুর্লভ হয়েছে।"৬৭ পৃ. ১১৭

একজন ঐতিহাসিকের মতে হাফ আখড়াই গানের আগেই "মুসলমান কবি"রা তর্জাগান তৈরি করেছিলেন ;৬৮ এ-গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল ; তবে প্রশ্নোত্তরে পৌরাণিক চরিত্রসমূহের ও ঘটনাবলীর বিবরণ ঢোল-সহযোগে গানে পরিবেশন করা তর্জাগানের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে নটনপায় প্রকাশিত "তরজাগান", "তরজা-সংগ্রহ" যে-দু'চারখানা বই চোখে পড়েছে, তাতে সমসাময়িক ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ নেই। রামায়ণ-মহাভারত, এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানই তর্জার বিষয়বস্তু ছিল। কোনো কোনো তর্জার ভাষা অত্যন্ত অশ্লীল। ঝুমুর গান রাধাকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রায় গাওয়া হ'তো। এই এক ধরণের গান, যার উৎপত্তি হয়েছিল সাঁওতালি গান থেকে।৬৯ বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে এখন থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তা ছিল ; একটি ঝুমুর দলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বিখ্যাত 'কবি' উপন্যাসে। ঝুমুর আর কৃষ্ণ-ধামালীর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। কোনো কোনো পর্যায়ে ঝুমুর এবং কৃষ্ণ-ধামালী অত্যন্ত অশ্লীল ; এই অশ্লীল গীত গাওয়ার বিবরণও 'কবি' উপন্যাসে আছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে দেবতার সম্মুখে একরকমের ঝুমুর অথবা ধামালী গাওয়া হ'তো।৭০ হয়তো তা ছিল কৃষ্ণ-ধামালী। পীতাম্বর দাস সংকলিত 'ঝুমুর-সঙ্গীত', এবং উনিশ শতকের শেষার্ধে সংকলিত 'ঝুমুর-রসমঞ্জরী' নামক গ্রন্থে যে-সব ঝুমুরের নমুনা আছে, তার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা। 'ঝুমুর-রসমঞ্জরী' প্রকাশ করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত ঝুমুর-গায়ক ভবপ্রীতানন্দ ওঝা ; তাঁর রচিত কিছু গান এ-বইতে ছাপা হয়েছে। গঙ্গাভক্তিমূলক গানের বই 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে।৭১ উনিশ শতকের মধ্যভাগেও যে বাঙালির গঙ্গাভক্তি কত প্রবল ছিল, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় অর্ধেন্দু কুমার গাঙ্গুলী রচিত 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' নামক গ্রন্থে। তাঁর প্রপিতামহ

বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী বিক্রমপুরের বাইখা গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন গঙ্গাতীরে বাস করার জন্যে। তিনি লিখেছেন :

> "তখন (অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে) বড়বাজারে রাজপুতানা থেকে ব্যবসায়ীদের আগমন হয়নি। এই অঞ্চলে বসবাসকারীর বেশীর ভাগ ছিলেন তখন দুই শ্রেণীর বাঙালী। এক শ্রেণী হোল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গঙ্গাতীরে বাস করে নিত্যগঙ্গাস্নান করবার জন্য স্থায়ী বাসিন্দা। এঁদের বহুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের মন্দির।.....
>
> বড়বাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসিন্দা ছিলেন শেঠ ও বসাক মহাশয়রা .....৭২ (পৃ. ৪)

এই বিবরণ থেকে মনে হয়, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী জাতীয় গানের একটি বাস্তব ভিত্তি ছিল ; "অন্তর্জলী যাত্রা"র বিবরণেও গঙ্গার মহিমা ভালভাবে বলা আছে।

চপ-কীর্তনের একজন প্রধান গায়ক ছিলেন মধুকান, অথবা মধুসূদন কিন্নর (১২২৫-১২৮০) ; তাঁর রচিত 'চপ-সঙ্গীত' গ্রন্থে চপগানের পরিচয় পাওয়া যায় ; চপগানও রাধা-কৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে রচিত হয়েছিল। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, মধুকান "গানের সুরে কাহারও অনুকরণ করেন নাই—স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" চপগানের উপর পাঁচালীর প্রভাব লক্ষণীয়।৭২ক

॥ বাংলা গানে ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাববস্তু : : ব্রহ্ম-গীতি ও বাউলগান ॥

কবি, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, পক্ষীর দলের গান, তর্জা, হুমুর, বাবালী, চপ এসব প্রাচীন গানে শিব, দুর্গা, গঙ্গা, গণেশ, এবং রাধাকৃষ্ণ, অথবা বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণ প্রাধান্য পেয়েছেন। কিন্তু সর্ববর্ধর্মসমন্বয়ের ধারণা যে ছিল না, তা বলা যায় না। এসব গানে শিব-শক্তি এবং রাধাকৃষ্ণ সমভাবেই সম্মানিত হয়েছেন ; এসব গান থেকে এই সত্যই উৎসারিত হয় যে, বাঙালি সাম্প্রদায়িকতার ভক্ত ছিল না।

কালীসাধক রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তন লিখেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর উপাস্য দেবতা এবং কৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি। "মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গাবারাণসী",—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আনুষ্ঠানিক তীর্থযাত্রা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না।

ধর্ম-সমন্বয়ের ভাববস্তুর অসাধারণ সম্প্রসারণ ঘটেছিল ব্রাহ্মগানে।

ব্রাহ্ম-গীতির প্রথম রচয়িতা সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন রায়। তাঁর গানের

নূতনত্ব ছিল অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তায়, তালে কিংবা সুরে নয়। বাংলা গানে পিতৃপ্রতিম ব্রহ্মের স্তব একেবারেই নূতন ধারণা।

ব্রাহ্মসঙ্গীতের আদিপর্বে ভক্তি ও আবেগের ভাব কম ; বরং আত্মমালোচনার ভাব থেকে উৎসারিত সামাজিক সংশোধনের চিন্তা ব্রাহ্মগানের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কবি বা পাঁচালী জাতীয় গানেও সামাজিক চিন্তা অনুভবনীয় ; কিন্তু ব্রাহ্মগীতের "সংশোধনবাদ" সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি-সঞ্জাত।

রামমোহন রচিত "মনে কর শেষের সেদিন অতি ভয়ঙ্কর" গানে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের অবস্থান বর্ণনাটি চিত্তাকর্ষক। ধর্মের গানে apocalyptic vision নূতন নয় ; রামপ্রসাদ এবিষয়ে একাধিক গান লিখেছিলেন। তবে রামমোহনের বর্ণনা অত্যন্ত বিশ্বধর্মী। বিশেষ ভাবে এই গানটির ভাব পরে অনেক বাউলগানে দেখা গিয়েছিল।

ব্রাহ্মগীতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক ও পার্থিব সৌন্দর্যের বর্ণনা। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবী বহু ব্রাহ্মগানে প্রশংসা পেয়েছে।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ কবি হাফেজ্-এর কবিতার ভক্ত ছিলেন। জগন্মাতার প্রতি ভক্তি ও ব্যক্তিগত ভালবাসার যে-উচ্ছ্বাসে রামপ্রসাদ সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলেন, জগৎপিতার প্রতি সে-ধরণের ভক্তি ও ভালবাসা ব্রাহ্মগীতেও অনুভব করা যায়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার একটি প্রার্থনার সময় "ফরাসিস্ ব্রহ্মবাদী ফেনেলন মহাত্মার রচিত", এবং রাজনারায়ণ বসু অনূদিত একটি স্তোত্র পাঠ করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> "এই স্তোত্র পাঠের পর দেখিলাম যে, অনেকে ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন.....পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।"[৭৩]

ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাবের উচ্ছ্বাসে চোখের জল পড়া দেবেন্দ্রনাথের কাছে নূতন মনে হয়েছিল ; হয়তো তারপর থেকেই ভাগবৎ-প্রীতির নিদর্শনরূপে সেবার আদর্শ ব্রাহ্ম আন্দোলনে বড় হয়ে উঠল। তারপর থেকেই ঐতিহাসিকের ভাষায় ব্রাহ্ম আন্দোলন হয়ে উঠল "Less intellectual and more spritual in temperament"।[৭৪]

ব্রাহ্ম আন্দোলনের সমধর্মী চিন্তাধারার প্রভাব সামান্য ছিল না। টপ্পা-কার রামনিধি গুপ্ত "ব্রহ্ম-সংগীত" লিখেছিলেন ; "ব্রহ্ম-সংগীত" লিখেছিলেন দাশরথি রায়, রূপচাঁদ পক্ষী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১২৪১-১২৮২)। রামনিধি, দাশরথি

রায়, রূপচাঁদ, প্যারীমোহন আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হয়েও ব্রাহ্মগান লিখেছিলেন। ব্রাহ্ম না-হয়েও ব্রাহ্মগান লিখেছিলেন হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), এবং তাঁর শিষ্য, ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত রচিত গানে যে সামাজিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়, পাঁচালী গানে প্রকাশিত সামাজিক চিন্তার সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিল না ; অথচ প্যারীমোহনই লিখেছিলেন :

"কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে ?
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মস্‌জিদে কি চার্চে, মন্দিরে ?
লণ্ডনে মার্কিণে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্মা বেঙ্গলে বোম্বে-হিন্দুস্থানে ?
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্মাণ্ডে, কি অন্য বাহিরে ?
তিনি 'কর্তা', কি 'গৌরাঙ্গ', নানক আল্লাহ্‌, যীশু,
কালী, কি কানাই, বসু-শিশু-বাসু ?
কে বলিতে পারে, পরেন কোন বাস, তাঁর কোঁচা, কি প্যাণ্টালুন্‌, ইজেরে
উল্লাস ?
ব্যালে কি বাকলে, গুড়ুক কল্কে, কৌপীনে কি কাষায়বরে ?
বেণুবীণা বোলে, খনকে কি খোলে, তোপে কি তাউসে, জয়ঢাকে ঢোলে ?
লেড়ানেড়ী দলে, বাউলের পালে, শিঙ্গা কাঁড়া কাঁশী কাঁসরে ?"[১৫]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' (কলিকাতা, ১৩৬৪) নামক গ্রন্থে দেখা যায়, উনিশ শতকে বহু বাউল অসংখ্য বাউল গান লিখেছিলেন। 'বাউল' চিন্তাধারার বিস্তৃত আলোচনার জায়গা এটা নয় ; তাই এ-যুগের বাউলদের মধ্যে যিনি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ বাউলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, সেই লালন শাহ্‌ ফকিরের চিন্তাধারা ও গান সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যায়।

লালন শাহ্‌ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[১৬] রামমোহন, লালন ও রবীন্দ্রনাথের সাময়সমিকতা লক্ষণীয়। বাউল লালন যে-ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে মানব-প্রীতিই ছিল সে ধর্মের মূল কথা। তিনি বলেছিলেন :

"বিভিন্নতা করিও না জাতি ধর্ম বলে।
আলেয় অধর সেই দয়াময় সাই
সৃষ্টিস্থিতি জুড়ে তাঁর জাতি গোত্র নাই।[১৭]

তিনি বলেছিলেন :

"ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় আত্মা'র নির্ণয়,
তাহলে সকল ধর্মেই তাঁরে পাওয়া যায় ।৭৮

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখে ব্যথা পেয়ে লালন লিখেছিলেন :

"যবন-কাফের ঘরে ঘরে,
তনে আমার নয়ন ঝরে,
লালন বলে মারিস কারে, চিনলি নে মনের ধোঁকায় ।৭৯

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনায় তৎকালীন বাউল-ধর্ম-সাধনার ও বাউল সঙ্গীতের কোন স্থান নেই। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, বাউলদের মধ্যে ধর্মীয় অনাচার ও তাদের নিরক্ষরতা সম্পর্কে একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'অনাচার' কথাটির অর্থ তো আপেক্ষিক, এবং সব বাউলই এ ধারণাও তো ভুল। লালন ফকির্ নিরক্ষর ছিলেন না।৮০ পরবর্তীকালে হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ), দীন বাউল (গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকান্ত পাঠক (১২২৮-১২৯৮) প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত "বাউল" গান লিখেছিলেন।

এঁদের মধ্যে সব দিক থেকেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন হরিনাথ মজুমদার। কুষ্টিয়াখালী পল্লীনিবাসী হরিনাথ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে (১২৬৩-১২৮৮) "গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা" নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, জমিদারদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন, আঠার-উনিশটি কৌতূহলদীপক বই লিখেছেন, "ফিকিরচাঁদ কবি" নাম নিয়ে বাউলের দল গঠন করেছেন, বাউলগান লিখেছেন। তাঁর বাউলের দলে যোগ দিয়েছিলেন অক্ষয় সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী। দীনেন্দ্রকুমার রায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মীর মশার্‌রফ হোসেন তাঁর সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন।৮১ একসময়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গে হরিনাথের গান সমাদৃত হ'তো। এই দলের প্রথম বিখ্যাত গান

"ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী, সত্যপথের সেই ভাবনা"

মুখে মুখে রচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।৮২

ফিকিরচাঁদের গানে স্বাভাবিক ভাবেই ধনীদের বিলাস ও আড়ম্বর, বাবুগিরি, লাম্পট্য, অসাধুতা কঠোর ভাষায় সমালোচিত হয়েছে ; কিন্তু তাতে কোথাও "হিন্দুর" নিয়ে বাগাড়ম্বর দেখা যায় না। এই পরিবেশের প্রভাব অক্ষয়কুমার

মৈত্রের রচিত ইতিহাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "যবন, যবন, যবন" করে একদল হিন্দু লেখকের চিৎকারে যখন কান পাতা দায় হয়েছিল, তখন অক্ষয়কুমারই সিরাজ-উদ্-দৌলার ঐতিহাসিক পুনর্বাসনের জন্যে কলম ধরেছিলেন।

দীনবাউল, অথবা পাবনার গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাউলগান লিখে বিখ্যাত হন। Apocalyptic চিন্তার অপূর্ব প্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচিত দুটি গানে; মন্বন্তরোত্তর অবস্থার এমন আশ্চর্য বর্ণনা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে দুর্লভ। একটি গানের প্রথম চরণ:

"বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চ'লে?"

অপর গানটির প্রথম চরণ:

"ওরে ম্যাড়া! ভবের ভ্যাড়া। তোরে একদিন ভুগতে হবে
তোমার চেতা ছাতি, চিতার উপর চিৎ হয়ে পড়ে রবে॥"৮৩

দীনবাউলের গানেও গোঁড়ামির চিহ্নমাত্র নেই। দক্ষিণ বিক্রমপুরের কৃষ্ণকান্ত পাঠক, পাঠক হিসেবেই নাম করেন; কিন্তু তাঁর রচিত কিছু বাউলগানও প্রচলিত ছিল; তিনি সুর ও পদলালিত্যের জন্যে খ্যাতিলাভ করেন। পরে কৃষ্ণকান্তের সুর রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত কৌলিন্য-প্রথা বিরোধী গানগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে শিয়ালদহ-নিবাসী মুন্সী মেহেরুল্লা হোসেন সর্বধর্ম-সমন্বয় বিষয়ে গান লিখেছিলেন। কলকাতার "পণ্ডিত সমাজ" তাঁকে "কালী-প্রসন্ন" উপাধি দিয়েছিলেন। সুফী ধর্মের প্রভাব তাঁর গানে বিশেষভাবেই অনুভব করা যায়। গানের ভণিতায় তিনি 'কালী' ও 'কালীপ্রসন্ন' নাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানের ভাব ও ভাষা অত্যন্ত বিদগ্ধ। একটি গানের শেষ চরণ:

"কালী কহে সত্য বটে,
কেন রে মন তুই বেড়াস ছুটে?
সে বিরাজ করছে সর্বঘটে,
সময় হলে দেখবি তাঁরে।"৮৪

উনিশ শতকেই বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবগান লিখেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'বাঙলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) নামক গ্রন্থে ১২১ জন বাঙালি মুসলমান কবি রচিত গীত এবং তাঁদের পরিচয় আছে। একটি গানে "শ্যামরায়" মূর্শিদরূপে বর্ণিত হয়েছেন; মুসলমান কবিদের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবদৃষ্টির এই রূপান্তর খুবই কৌতূহলজনক। রওশন ইজদানী নামক গবেষক লিখেছেন: "অনেক মুসলমান গীতকার যেমন হিন্দুয়ানী

রূপকে গান করেছে, অনেক হিন্দু বাউলও তেমনি মুসলমানি মতে রচনা করেছে।"৮৫ তিনি মোমেনশাহীর "মুর্শিদি", "মারফতী" ও "বাউল" গান প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন। সেকালের সর্বধর্মসমন্বয়ের চিন্তাধারা যে শুধু বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, লালন-গীতি, মুন্সী মেহেরুল্লাহ হোসেনের গান, এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের গান তার বড় প্রমাণ।

আবার সত্য কথনের খাতিরে একথাও বলতে হয় যে, উনিশ শতকে রচিত কিছু কিছু বাউলগানে কট্টর হিন্দুয়ানীর প্রকাশ দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে কোনো এক সময়ে হাওড়া-শিবপুরে একটি "বাউল সম্প্রদায়" গঠিত হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের কোনো কোনো গান অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গীতরত্নমালা' (১৩০৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। একটি গানে ব্রাহ্মধর্ম ও তার ফলের বর্ণনা এইরূপ :

ক. কত গন্ডগোল, ব্রাহ্মে শাস্ত্রে বেদান্তমত করে খাল।
খ. বিধবার বে' হয়ে গেছে, সাগরে ধরেছে হাল।
লেগে বটের গাছে আমের আঁঠা, ফলবে তাতে ভুঁই কাঁঠাল।
গ. হিন্দু-মুস্লিম আদান-প্রদান, হয়েছে ধর্ম-বহাল।
ছেলের নাতামহ করিমুল্লা, পিতামহ শিবপাল॥
ঘ. যত চাষার ছেলে, ব্রাহ্ম হ'য়ে, ভুলেও তারা ধরে না হাল।
ক্রমে মর্‌চে ধরে, ঝরে ঝরে, পড়তেছে লাঙ্গলের ফাল।৮৬

গানটি বাউল-গানের আঙ্গিক অনুসারেই রচিত; কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটি বাউল নয়। বাউল-গানের আঙ্গিকে কিছু মজার গান লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত; একটি গানে কৃষ্ণ-প্রেম 'প্রেম-খিঁচুড়ি', অপর গানে তা "মশারি", এবং অপর একটি গানে কৃষ্ণপ্রেম "খাসা গুড়ুক"।৮৭

সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় 'সঙ্গীত-কোষ'-এ। "নগর সংকীর্ত্তন" অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৩০৫ সালের দোল পূর্ণিমা তিথি হইতে কলিকাতায় হরিনামের অপূর্ব বন্যা আসিয়াছিল। প্রতি পল্লীতে পল্লীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছে। মহামহোৎসব হইয়াছে..." এই সব কীর্তন তৎকালীন যে-সব সম্প্রদায় রচনা করে, তাদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তালিকায় চৌত্রিশটি হরিসভার বিবরণ আছে। হাটখোলা থেকে হালতু পর্যন্ত এই সব হরিসভার বিবরণ খুবই কৌতূহলজনক।৮৮ বর্তমানে মাদ্রাজ সহরের সংগঠিত হরিভক্তির ও হরিকীর্তনের একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন মার্কিন পণ্ডিত

মিল্‌টন্‌ সিঙ্গার।৮৯ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে কলকাতার এ-সব হরিসভারও হয়ত একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রমাণ :

১. রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৩৪২) পৃ. ১৭০-৭১ ; অনাথকৃষ্ণ দেব, 'বঙ্গের কবিতা' (১৩১৭) পৃ. ৮০ ; D. C. Sen, *History of Bengali Language and Litrature* (1911), P. 715 ; S. K. Do, *Bengali litrature in the Nineteenth Century* (1962), Part I, সুকুমার সেন, 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০)।

২. লোক সাহিত্য এবং লোকগীতির বিষয়-নির্ঘণ্ট অথবা Motif-Index এর প্রণালীর জন্য দ্রষ্টব্য Stith Thomp Son, *Motif-Index of Folk Litrature* (Helsinki, 1932-1936) ; V. Elwin, *Myths of Middle India* (1949), pp. 507-529 ; *Tribal Myths of Orissa* (1954), pp. 649-77.

৩. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' (১৮৮৮) ১ম খণ্ড।

৪. W. Ward, *A view of the History, Litrature, and Mythology of the Hindoos* (London, 1822), Vol. II, pp. 475-478 ; Vol. III, pp. 300-301.

৫. W. Hamilton, *Description of Hindostan* (Delhi, 1971), Vol. I, p. 104.

৬. S. N. Dasgupta and S. K. De, *History of Classical Sanskrit Litrature* (C. U. 1947) Intro, pp. 39-40.

৭. *Subhasitaratnakosa* (H.O.S.) P. Lx ; D.H.H. Ingalls. *Sanskrit Poetry* (H.U.P) (1968), pp. 45-46.

৮. 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজ চিত্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃ. ২১-২২।

৯. 'কবিজীবনী' (ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৫৮) দ্রষ্টব্য।

১০. N. N. Ghose, *Memoir of Maharaja Nubkissen Bahadur*, (1901), p. 186.

১১. 'বাঙালীর গান', পৃ. ৩০১।

১২. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৩. 'বঙ্গের কবিতা', পৃ. ৩০৬।
১৪. 'কবিজীবনী', পৃ. ১৪৩-১৪৯।
১৫. N. N. Ghose, প্রাগুক্ত, Ch. 1, 2, 3, 4, 6; E. Leach & S. N. Mukherjee, *Elites in South-East Asia*, pp. 33-78.
১৬. 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' (১৯৬২), পৃ. ২৭৬-৭৭।
১৭. "ঘতোম প্যাঁচা", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
১৮. 'কবিজীবনী', অবতারণা, ১৫-১৬ পৃ.; প্রবোধচন্দ্র সেন, "রামপ্রসাদ,", 'আনন্দবাজার পূজা সংখ্যা' (১৩৬১)।
১৯. 'বাঙ্গালীর গান', পৃ. ১-৫৩।
২০. তদেব, পৃ. ১৩, ২৭।
২১. পঞ্চানন চক্রবর্তী 'রামেশ্বর রচনাবলী' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১) পৃ. ২৩৩-২৩৪।
২২. 'বাঙ্গালীর গান', ৪৫৮।
২৩. অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, 'সঙ্গীতরত্নমালা' (১৩০৩), পৃ. ৩৮৭।
২৪. বৈকুণ্ঠচরণ বসাক, 'বিশ্বসঙ্গীত' (১৩শ সং), ৩৯১ পৃ.।
২৫. অমৃতলাল বসু সম্পাদিত 'বীণার ঝঙ্কার' (১৩২০) পৃ. ৯৫।
২৬. 'সঙ্গীত কোষ', পৃ. ১২২৮।
২৭. অমরেন্দ্রনাথ রায়, 'শাক্ত পদাবলী' (১৯৬১), পৃ ১২৬-২৭।
২৮. 'বঙ্কিম রচনাবলী' (সাহিত্য সংসদ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৩, ৮৮৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোক সাহিত্য', "কবিসঙ্গীত" দ্রষ্টব্য।
২৯. 'বঙ্গীয় নাট্য শালার ইতিহাস', ৪র্থ সং, পৃ. ৬; 'বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার' (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১), পৃ. ৬।
৩০. গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' (১ম খণ্ড, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩১. 'কবিজীবনী' দ্রষ্টব্য। দ্রষ্টব্য কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৩০১); প্রফুল্ল পাল, 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান', (ক. বি. ১৯৫৮)।
৩২. 'বঙ্গের কবিতা', ৩০৬; মন্মথলাল মিশ্র, 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান' দ্রষ্টব্য।
৩৩. *Frontier*, May 10, 1073, pp. 12-15; vide, B. Ghosh, "Calcutta—The City of Renaissance", Article No. VI.

৩৭. 'বঙ্গের কবিতা', পৃ. ৩০১।

৩৪. 'কবিজীবনী', পৃ. ২৩৯।

৩৬. ভদেব, ২৪১ ; 'লোকসাহিত্য', পৃ. ৮০-৮১ ; অথচ রবীন্দ্রনাথ রাম বসুর 'মনে রইল সই মনের বেদনা'' গানটি গাইতে ভালবাসতেন। এই গানটির স্বরলিপির জন্য দ্রষ্টব্য : 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১৩৬২, কার্তিক-পৌষ, পৃ. ১৬৭।

৩৭. 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৩০১) বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৩৮. প্রমথনাথ মল্লিক, 'কলিকাতার কথা' (নবাকাণ্ড), পৃ. ৮৩।

৩৯. শিবরতন মিত্র, 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪৬।

৪০. ভোলানয়রার দুটি পদ এখনও শোনা যায়, যথা : ''আমি সে ভোলানাথ নই। আমি নয়রা ভোলা, ভিয়াই খোলা, বাগবাজারে রই ॥, এবং, ''কি করে তুই বলি—জগা, ভাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারদিকেতে বাঁশের বন। কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ড কোথা বা তোর রাধা' কুণ্ড, সামনে আছে মূলো কুণ্ড ক'রগে মূলো দরশন।'' দ্রষ্টব্য : 'নব্যভারত'-(১৩১৪, জ্যৈষ্ঠ) পৃ. ৭০।

৪১. রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, 'প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনচরিত' (২ সং), পৃ. ৩৮ ৩৯, ৪৭-৫০ ; শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত (বঙ্গাব্দ ১৩০০) দ্রষ্টব্য।

৪২. 'মনোমোহন গীতাবলী', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৮৮৭), পৃ. ।/০ ''সাজ'' কথাটি ফার্সি। অর্থ, concert।

৪৩. 'কবিজীবনী', ''রামনিধি গুপ্ত'' দ্রষ্টব্য। পৃ. ১১৩।

৪৪. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড, ১৩৪০), পৃ. ২০৮-২০৯।

৪৫. 'মনোমোহন গীতাবলী', পৃ. ৷৶০।

৪৬. 'বিশ্বসঙ্গীত', পৃ. ৪০৯-৪০।

৪৭. 'হুতোম প্যাঁচা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৪৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বিস্মৃত দর্পণ' (১৩৭৮), পৃ. ৪৯-৫০।

৪৯. 'বিশ্ব সারতন্ত্রম্', (পৃ. ৩৭-৩৮, ৪১, ৪৮) এবং 'গন্ধর্বতন্ত্রম্', পৃ. ৩৮ ; রসিক-মোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৫০. 'হুতোম প্যাঁচা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৫১. 'সঙ্গীতকোষ', পৃ. ৭৮৮ ; ''কালীঘাট আর্য্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন'' দ্রষ্টব্য।

৫২. S. K. De, প্রাগুক্ত, পৃ. 441।
৫৩. 'কবিজীবনী', পৃ. ১৩১ ; ৪৩৪
৫৪. S. K. De, প্রাগুক্ত, পৃ. 441-445 ; হরিপদ চক্রবর্তী 'দাশরথি রায় ও তাঁহার পাঁচালী' দ্রষ্টব্য।
৫৫. 'হুতোম পাঁচা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২, ১৬৬-৬৭।
৫৬. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', (ক. বি.), পৃ. ৬৬০।
৫৭. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য' (১৩৭১), পৃ. ৭৩।
৫৮. 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৩-৮৪।
৫৯. 'কবিজীবনী', পৃ. ১০৫-১০৬।
৬০. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', (১৯৫৭) ,পৃ. ৫৬।
৬১. 'কবিজীবনী', পৃ. ১০৫, ১৩১ ; 'শ্রীতত্ত্ব' (১২৭৫), পৃ. ।৶০।
৬২. 'হুতোম পাঁচা,' প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৬৩. তদেব, পৃ. ৩৫।
৬৪. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৪সং), পৃ. ৯৫২-৫৪।
৬৫. তদেব।
৬৬. Ward, op cit.
৬৭. 'হুতোম পাঁচা', পৃ. ১১৭।
৬৮. গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস', পৃ. ৮।
৬৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক সাহিত্য' (২ সং), পৃ. ১৯৭-২০০।
৭০. 'কবিজীবনী', অবতারণা, পৃ. ৩৭।
৭১. 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৬১ ; এই বই ১২৩১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
৭২. 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃ. ৪।
৭২ক কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) কৃষ্ণযাত্রাকে খুব জনপ্রিয় করে তোলেন। দ্রষ্টব্য N. K. Chattopadhyay, *The yatras or the Popular Dramas of Bengal*, (London, 1882)।
৭৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
৭৪. *History of Bengal* (o. u.), p. 570.

৭৫. 'গীতরত্নমালা', ৭১১-১৩।

৭৬. 'পূর্বপাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ', মৈত্রেয়ীদেবী সম্পাদিত (কলি., ১৯৭০): এস, এম, লুৎফর রহমান, 'লালনশাহের জীবন কথা' দ্রষ্টব্য।

৭৭. ঐদেব, পৃ. ২৭৩।

৭৮. ঐদেব, পৃ. ২৭৪।

৭৯. ঐদেব, পৃ. ২৭৫।

৮০. ঐদেব, পৃ. ২৫২-২৫৩।

৮১. "হরিনাথ মজুমদার", সাহিত্য সাধক চরিতমালা (তৃতীয় খণ্ড) এবং অনন্তর সেন, 'কাঙাল হরিনাথ' (১৩২০) দ্রষ্টব্য।

৮২. সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ঐদেব, পৃ. ৩১।

৮৩. 'বাঙালীর গান', ৮৫৫-৫৬ ; প্রথম গানটির স্বরলিপি : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'বাংলার লোকসংগীত' (বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, ১৩৬৮), ১ম খণ্ড, পৃ ৫৮।

৮৪. হরিশ্চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'সঙ্গীত তানসেন' (১২৯১), এই গ্রন্থে বেলায়েৎ হোসেনের ১২০ গান সংকলিত হয়েছে।

৮৫ দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত 'পূর্ব-বাঙলার লোক সংস্কৃতি' (১৯৭১), পৃ.৪৬ ।

৮৬. 'গীত রত্নমালা', পৃ. ৭৯৪-৯৫

৮৭. ঐদেব ১১৪, ৭৯৪ পৃ. 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী', ৭১২ পৃ. 'সঙ্গীত কোষ' পৃ. ৬৭৫।

৮৮. 'সঙ্গীত কোষ', পৃ. ৭৫১-৮০০।

৮৯. C. Leslie ed. Anthropology of Folk Religion, (Vintage Books, 1960), pp. 105-166.

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

১৭৬২-১৮১৯

সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের নবজাগরণের উষায় বাংলার ভাগ্যাকাশ নানা জ্যোতিষ্কের সমাবেশে উদ্ভাসিত। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সরকারি কাজের সূত্রে এসেছেন মানবতাবাদী পণ্ডিতকুল, এসেছেন নিপীড়িত মানুষের উদ্ধারের আশায় ধর্মযাজকের দল, আর এদের সংগে যুক্ত হয়েছেন দেশীয়সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়ের কিছু মনীষী। নবজাগরণের ইতিহাস সশ্রদ্ধভাবে মনে রেখেছে এঁদের সকলকে। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে জোন্স, কেরী, কোলব্রুক, হেয়ার, ডাফ্, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নাম। কিন্তু চিন্তাধারার বলিষ্ঠতায়, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতায়, পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষতায় ও মানবপ্রেমের মহৎ আদর্শে সমুজ্জ্বল একটি পণ্ডিতগোষ্ঠিও আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সময়; কোন বিস্তারিত আলোচনা এঁদের সম্বন্ধে পাওয়া যায় না, যদিও নবজাগরণের সূচনায় এঁদের অবদান মোটেই নগণ্য নয়। দারিদ্রের জন্য এঁরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা শ্রীরামপুর মিশনে চাকুরী গ্রহণ করেন অতি অল্প বেতনে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন এঁদের সহায়তায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা করে। এইসব পণ্ডিতদের সুতীক্ষ্ণ লেখনীই সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তা-বোধের বীজ রোপন করে। যুগনায়ক রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বের পাশে এঁরা অহেতুক বেশী ম্লান হয়েছেন পরবর্তীকালের অবহেলায়। তাই এঁদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এই সব পণ্ডিতদের অবদানের সঠিক বিবরণ না জানলে উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হবে না।

এই সব পণ্ডিতের মধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন সর্বপ্রথম। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

"At the head of the establishment of pundits (at the college of Fort William) stood Mrityunjoy, who although a native of Orissa, usually regarded as the Boeotia of the country, was a colossus of

literature. He bore a strong resemblence to our great lexicographer (Dr. Johnson) not only by his stupendous acquirements and soundness of his critical judgement but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of Sanskrit classics was unrivalled, and his Bengali composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour."

মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এই উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্মলগ্নে তাঁর চেয়ে বেশী অবদান আর কারুর ছিল বলে মনে হয় না। গদ্যাবনাময় বাংলা গদ্যের তিনিই যথার্থ প্রথম রূপকার। প্রকৃত দরদী শিল্পীর পরিচয় তাঁর মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু এই মহামনীষীর বিস্তৃত পরিচয় আজও আমাদের অজ্ঞাত। এর চেয়ে ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে?

১৮০১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগ দেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরী ছিলেন এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। কেরী সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এই বিভাগেরও পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এখানে অধ্যাপনার কাজ সুরু করার পর কেরী দেখেন শিক্ষাদানের সবচেয়ে বড় অন্তরায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব। কলেজের কর্তৃপক্ষকে এই অসুবিধার কথা জানিয়ে কেরী তাঁর পণ্ডিতদের বাংলায় পুস্তক রচনার জন্য উৎসাহিত করেন এবং রচয়িতাদের পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা করেন। কেরী ও কলেজের অনুপ্রেরণায় রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, হরপ্রসাদ রায় ও কালীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা গদ্য সাহিত্যের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। বইটি সংস্কৃত বত্রিশ সিংহাসনের বাংলা অনুবাদ। বাংলা বত্রিশ সিংহাসন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হয় এবং মৃত্যুঞ্জয় দুইশত টাকা পারিতোষিক পান। বইটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে কেরী বলেন,"

"Mrityunjoy, the head Pundit of the College, has translated from the Sanskrit language into the classical Bengali Prose the Buteesee Singhasan.....They are works of considerable merit and such as deserves remuneration."[২]

সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর সমকক্ষ সংস্কৃত পণ্ডিত সে যুগে খুব অল্পই ছিলেন।[৩] ১৮০১ হ'তে ১৮১৬ পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার

সংগে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু এখানে খ্যাতি বাড়লেও আর্থিক উন্নতি বিশেষ হয় নি। সেজন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি তাঁকে কোর্ট পণ্ডিত হবার আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন নি। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ামের চাকুরী ত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টে যোগদান করেন। তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণে কাউন্সিলকে সুপারিশ করার সময় কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চ প্রশংসা করে বলেন,

"In point of learning very few are his equals and no one with whom I have any acquaintance exceeds him."৪

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার্ উইলিয়ম ম্যাক্‌নটেনকে হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে সাহায্য করার কাজে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় ম্যাক্‌নটেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে ওঠেন। ধনী হিন্দুদের মকদ্দমাপ্রিয়তা তাঁকে বিশেষ ব্যথিত করে। ক্ষোভের সংগে তিনি বলেন, "ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিম কোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে অন্য কিছু দেখি নাই" ।৫ সুপ্রিম কোর্টে অবস্থান কালে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য হিন্দুশাস্ত্র বিচার করে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান দেওয়া। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকমাসের ছুটি নিয়ে তিনি উত্তরভারতে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন এবং ফেরার পথে মুর্শিদাবাদের নিকট ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সমাচার দর্পণে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দেখা যায় ১৯এ জুন, ১৮১৯এর সংখ্যায়,"……পরে আটমাস হইল (মৃত্যুঞ্জয়) সুপ্রিম কোর্টের সাহেবদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থ দর্শনে গিয়া কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া বাটি আসিতেছিলেন, পথে বোং মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।"৬ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর এই তিরোধান যেমন সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে তেমনি তাঁর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহেও দেখা দিয়েছে প্রচুর অসুবিধা।

মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। যুগাচার্য্য রামমোহন বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা এই মতবাদ প্রচার করে অনেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি অবহেলা বা উপেক্ষা দেখিয়ে রামমোহনের গৌরব বা যশবৃদ্ধি করা যায় না। তিনি বাংলা লেখা আরম্ভ করার

অনেক আগেই গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় এবং তিনি যখন লেখা আরম্ভ করেন তখন তাঁর সামনে এই সব রচনার নিদর্শন ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা লেখা সুরু করেন ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁদের বইগুলি ছিল বিদেশী ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইগুলি সে যুগের শিক্ষিতমহলে বিশেষ সাড়া জাগায়। কিছু বই-এর চাহিদা এতো বেশী হয় যে কয়েক বছরের মধ্যে দু'তিনটি সংস্করণ বেরিয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন এই লেখকগোষ্ঠির সর্বপ্রধান। মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁর সহযোগী পণ্ডিতবৃন্দের রচনায় বিষয়বৈচিত্র্য শিরোধার্য, বর্ণনার সরসতা, রচনা শৈলী প্রভৃতি যা প্রকাশিত হয়েছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। গদ্য সাহিত্যের রীতিনীতির কোন আদর্শ এদের সামনে ছিল না। নিজেদের মৌলিক চিন্তাধারা, সাহিত্য চেতনা ও পাণ্ডিত্যের ওপরই এঁদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় ও অন্যান্যদের বাংলা গদ্য-সাহিত্য রচনার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

১ নং তালিকা (৭)

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা

	গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রথম প্রকাশ	অন্যান্য সংস্করণ
১।	বত্রিশ সিংহাসন	উপাখ্যান	শ্রীরামপুর ১৮০২	শ্রীরামপুর ১৮০৮, ১৮১৮ লণ্ডন ১৮১৬
২।	লিপিমালা	সমাজবিজ্ঞান	১৮০৫	—
৩।	হিতোপদেশ	উপাখ্যান	১৮০৮	শ্রীরামপুর ১৮১৪
৪।	রাজাবলী	ইতিহাস	,, ১৮০৮	১৮১৪
৫।	বেদান্ত চন্দ্রিকা (ইংরাজী অনুবাদ সহ)	ধর্ম	কলিকাতা ১৮১৭	—
৬।	প্রবোধ চন্দ্রিকা (রচনা ১৮১১)	সাহিত্য	শ্রীরামপুর ১৮০৩	শ্রীরামপুর ১৮৪০, কলিঃ মিশঃ ১৮৬২

২ নং তালিকা (৮)

অন্যান্য পণ্ডিতবৃন্দের রচনা

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রথম প্রকাশ
উইলিয়াম কেরী	নিউটেষ্টামেন্ট	ধর্ম	শ্রীরামপুর ১৮০১
	ওল্ডটেষ্টামেন্ট	,,	১৮০১
	কথোপকথন	কাহিনী	১৮০১

	ইতিহাসমালা	,,		১৮১২
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত	জীবনী		১৮০১
	লিপিমালা	পত্রগুচ্ছ		১৮০২
গোলোক নাথ শর্মা	হিতোপোদেশ	উপাখ্যান	,,	১৮০২
তারিণী চরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট	কাহিনী	কলিকাতা	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়				
	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য জীবনচরিত	জীবনী	শ্রীরামপুর	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্সী	তোতা ইতিহাস	কাহিনী		১৮০৫
রামকিশোর তর্কচূড়ামনি	হিতোপদেশ	উপাখ্যান		১৮০৮
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা	কাহিনী		১৮১৫

এই লেখকগোষ্ঠির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাই ছিল সর্বোত্তম এবং বহু সম্ভাবনাময় বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব বার্তা জানা যায় তাঁরই লেখার মধ্যে। ১৮০২ হতে ১৮১৭ মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর জীবনাবসান যদি অকালে না হোতো, তবে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি সে সময় আরও বেশী হোতো। তিনি ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক এবং প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ছিল তাঁরই সবচেয়ে বেশী। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপোদেশ' এই দুটি পরিচিত গল্পের সংকলন। দুটিই সংস্কৃত হতে অনুবাদ। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য্য ও যতি চিহ্নের কম ব্যবহার বই দুটি পাঠের অসুবিধা ঘটালেও সরলতা ও সাবলীল সহজ ভঙ্গির জন্য পাঠক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। দাম্পত্যাবলীতে প্রাচীন ভারতের রীতিনীতির সংগে তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটিও সংস্কৃত হতে অনুবাদ। 'রাজাবলী'তে কলির সুরু হতে ইংরাজ অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় ইহাই প্রথম মুদ্রিত ইতিহাস; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং জনপ্রিয়তার জন্য পরে এর আরও কয়েকটি সংস্করণ হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজাবলী'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন।১০ পাঠ্য পুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হলেও ভাষার সরলতা ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতার জন্য বইটি সকলের কাছেই সুখপাঠ্য হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পৌত্তলিকতা বিরোধী গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয় ইংরাজী অনুবাদ সহ বেদান্ত চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন। পুস্তকে

গ্রন্থটিতার নাম না থাকলেও স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে জানা যায় ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা।১১ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর জীবদ্দশায় পুস্তকটী প্রকাশিত হয় নি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হতে বইটী প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে এর অনেকগুলি সংস্করণও বাহির হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রবোধ চন্দ্রিকার একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে।

মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্ভাগ্য সাহিত্য সমালোচকদের সকলে তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সমালোচকগণ মৃত্যুঞ্জয়ের পণ্ডিতী ভাষার উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে প্রবোধ চন্দ্রিকা হতে যে অতি সমাসবদ্ধ বাক্যের উল্লেখ করেছেন মৃত্যুঞ্জয় তা উদাহরণরূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর নিজস্ব রচনায় ঐরূপ সমাসবদ্ধ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।১২ সমালোচকদের এরূপ ভুলের জন্য বহুদিন পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠকমহলে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা ছিল।১৩ পরবর্ত্তীকালের সমালোচকরা কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সঠিক মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রন্থের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন এবং সাহিত্য সাধক চরিতমালায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ব্রজেনবাবু বলেছেন, "বাংলা গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি (মৃত্যুঞ্জয়) বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন।"১৪ তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয় বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী এবং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ উক্তি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।১৫ গ্রন্থের প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বলেন, "তিনি (মৃত্যুঞ্জয়) যেমন একদিকে সাধুভাষার আদি লেখক, অপরদিকেও তিনি তেমনি চল্‌তি ভাষার আদর্শ লেখক।..... এ ভাষা সজীব, সতেজ, সরল, সচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতিমুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্র জড়তা নাই, এবং এ ভাষা সাহিত্য রচনার উপযোগী।"১৬ পরবর্ত্তীকালের সমালোচকগণ স্বাধীনভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার বিশ্লেষণ করে তাঁর সাহিত্য স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেন নি। বিশেষ করে তাঁর প্রবোধ চন্দ্রিকার প্রশংসা করে ডাঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন,

"Indeed Probodh Chandrika exemplifies one important aspect of the development of prose style in this period and brings into clear

relief the long continued struggle between the plain and the ornate style out of which is evolved modern prose."

ব্রজেনবাবুর মত তিনিও বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির পূর্বাভাষ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে দেখেন এবং বলেন,

".....his narrative style, though sanskritised, often assumes an ease and dignity reminding one of the later style of Vidyasagar."১৭

সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, 'মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে সাধুভাষা ও সংস্কৃত-রীতির প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়।'১৮ ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গ্রাম্য জীবনের এমন অনাবৃত বলিষ্ঠ মূর্তি অন্যত্র নাটকীয় কলাকৌশল একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।.....প্রবোধ চন্দ্রিকায় রুবাণীর যে মর্মান্তিক দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মত প্রাণস্পর্শী বর্ণনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠির দুয়ের কথা, বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যে মিলিবে না।"১৯

বিভিন্ন দিক দিয়া বিশ্লেষণ করে তাঁর রচনার মূল্যায়ন করলে দেখা যায় বিস্ময়কর উৎকর্ষতা এবং বিভিন্ন রীতির সমন্বয়ের সার্থক প্রয়াস। বিভিন্ন গদ্যরীতি নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দেন নি, দরদী সাহিত্যশিল্পীর গভীর মনন বোধও প্রকাশ করেছেন। তিনি শিশু-ভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বোধ হয় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাই নিরিখুলভ মনোভাবে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল ভবিষ্যত অনুগামীদের হাতে তুলে দেন। সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী সংস্কৃতকে যে প্রাধান্য দেবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষে খাঁটি বাংলা রীতির সার্থক রূপদান করা ও আরবি, ফার্সী প্রভৃতি ভাষাকে উপেক্ষা না করার ঔদার্য্য দেখানো সত্যই বিরাট মহত্বের পরিচয়। সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে যুগে, বিশেষ করে তাঁর জীবিতকালে, তাঁর সমকক্ষ যে কেউই ছিলেন না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টার আসনে তাঁকে বসাতে দ্বিধা হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় সে যুগের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের নাটোরে তিনি শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসার পর হতেই তাঁর পাণ্ডিত্যের ও শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কলকাতায় প্রভাবশালী পণ্ডিত সমাজ গড়ে ওঠেনি। নবদ্বীপ, নাটোর,

কৃষ্ণনগর, গুপ্তিপাড়া, খানাকুল প্রভৃতি স্থানেই তখন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাস করতেন। হিন্দু সমাজের শাস্ত্র বিধান এই সব অঞ্চল হতেই হোতো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও কলকাতার বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায় গড়ে ওঠার পর হতেই বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা উপার্জনের আশায় কলকাতায় আসতে থাকেন এবং কলকাতায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ গড়ে ওঠে। এই সব পণ্ডিতদের প্রথম দলেই মৃত্যুঞ্জয় নাটোর হতে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতার পণ্ডিত সমাজের সর্বাধিপতির আসন লাভ করেন। সে সময়ে এদেশে ন্যায় ও স্মৃতি চর্চার প্রাধান্য পাওয়ায় বেদের চর্চা বিশেষ সীমিত হয় এবং রামমোহনের প্রচেষ্টাতেই বেদচর্চা আবার প্রসার লাভ করে। সে সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ও বেদচর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বাগবাজারের বাসগৃহে বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনার কথা রামমোহন তাঁর 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকায় একস্থলে উল্লেখ করেছেন, "..... ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে.....।২০ রামমোহনের এই উল্লেখ হতেই বোঝা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাটীই ছিল কলকাতার শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থল। উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের চতুষ্পাটির বিষয় যা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে চতুষ্পাটিতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত।২১ বেদান্ত ও উপনিষদে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বত্রিশ সিংহাসনের' মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বই-এ এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ".....তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপার সাক্ষী পাদহীন অথচ সর্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্বশ্রোতা....."২২ এই উদাহরণ হতেই বোঝা যায় রামমোহনের আগেই মৃত্যুঞ্জয়ের বেদচর্চার প্রসারে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বেদান্ত চন্দ্রিকার মধ্যেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দেয়। বেদান্তচন্দ্রিকা মাত্র আড়াই শত খণ্ড মুদ্রিত হয়েছিল বলে সে যুগে বহুল প্রচারের সুযোগ পায় নি। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামক পুস্তিকায় রামমোহন বইটির সমালোচনা করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে বেদান্ত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বেদান্ত চন্দ্রিকার সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়।২৩ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার

'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' নামক যে পুস্তকটি প্রকাশ করেন তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের ও অবদান ছিল অনেকখানি। ক্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এ সম্পর্কে লেখে,

"……The Sankhya Provuchana has also been published by them in Bengali; but for the translation the world is indebted to Mrityunjoy and Ramjay Turkulankar the late and the present chief pundits of Supreme Court"[২৪]

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতির জন্যই তাঁকে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। মৃত্যুঞ্জয় এ কাজে বিশেষ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন বলেই বিচারক ম্যাক্‌নেটনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। কোর্ট পণ্ডিত হিসাবে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রবিচার দেখিয়েছেন 'সতীদাহ প্রথা' বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে। সতীদাহ প্রথা যে শাস্ত্রের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে নয় তা তিনি তিরিশটি এই প্রথা অনুমোদনকারী শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করে সুস্পষ্টভাবে দেখান।

শিক্ষক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের বিস্তৃত পরিচয় যদিও জানা যায় না, তবুও তাঁর চতুষ্পাঠির যে খ্যাতি ছিল তা রামমোহনের রচনায় নামোল্লেখের নজির দিয়েই জানা যায়।[২৫] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের যে সূনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। কেরীর মত বহুভাষাবিদ পণ্ডিত তাঁর পরপ্রান্তে বসে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন ও তাঁর প্রশংসায় কেরী ছিলেন পঞ্চমুখ। শুধু পাণ্ডিত্যের জোরেই যে তিনি কেরীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তা নয়, শিক্ষকতাগুণের দ্বারাও তিনি কেরীকে মুগ্ধ করেছিলেন।

সেই ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার যুগে সমাজ শাসক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠির অভ্যন্তরে থেকে মৃত্যুঞ্জয় সমাজের পাশবিক রীতি নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা করেন নি। যদিও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে সংস্কারের কোন আন্দোলনের সূচনা করেন নি, তবু ধর্মসম্মত সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে তাঁর অভিমত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন। হিন্দু সমাজের পাশবিক প্রথা সমূহের অবসান করার জন্য মিশনারীদের যে প্রচেষ্টা ছিল তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। শাস্ত্রীয় অভিমত সংগ্রহে তিনি তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য অবদান তাঁর "সতীদাহ" প্রথা বন্ধ করা বিষয়ে। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা সে যুগে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল। রামমোহনের পূর্বেই ১৮১৭ সালে তিনি এই মত দেন। 'সতীদাহ প্রথা' বন্ধ করার জন্য

বিশনারীরা বহু পূর্ব হতেই জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা সুরু করেন। এঁদের চাপেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাস্ত্রীয় অভিমত সংগ্রহে আগ্রহী হয়। সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুঞ্জয়কে নির্দেশ দেয় এই প্রথা অনুমোদনকারী শাস্ত্র বিচার করে তাঁর অভিমত জানাতে। তিনি ৩০টি বিভিন্ন শাস্ত্র বিচার করে দেখান কোন শাস্ত্রই এই প্রথাকে অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলে নির্দেশ দেয় নি। তাঁর মতে এর চেয়ে আমরণ বৈধব্যব্রত পালন অনেক বেশী শ্রেয়।

তিনি ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন গোষ্টির সংগে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক সমস্ত কাজের সংগেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্কুল বুক সোসাইটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রসারে তিনি ছিলেন সবিশেষ আগ্রহী। তাই তাঁকে হিন্দু কলেজের কর্মপরিষদের সদস্যরূপেও দেখা যায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে দুচারটি কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে তার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ জানা যায় নি। এরূপ একটি কাহিনীর বর্ণনা এখানে দিচ্ছি। "জন্মস্থানের (মেদিনীপুর) প্রথানুসারে মৃত্যুঞ্জয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াও প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যাদির পরে পলাণ্ডু পান্তাভাত আহার করিতেন। ছাত্ররা ভয়ে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিত না—অন্যান্য পণ্ডিতদের নিকট গিয়া এই বিষয় তর্কালঙ্কার ? (বিদ্যালঙ্কার)-কে বলিতে বলিল।...পণ্ডিতেরা সাজিয়া গুজিয়া একদিন মৃত্যুঞ্জয়ের বাসায় গেলেন ; কথা তুলিলেন যে দ্বিজাতির পক্ষে শাস্ত্রে পলাণ্ডু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মৃত্যুঞ্জয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, "আপনিত পেঁয়াজ দিয়া প্রত্যহ পান্তাভাত খাইয়া থাকেন'। মৃত্যুঞ্জয় তাহাও স্বীকার করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত হইয়া, শাস্ত্র জানিয়া ও মানিয়া এমন কর্ম্ম করেন কেন ? তিনি বলিলেন, 'কি কর্ম্ম ?' পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'পলাণ্ডুভক্ষণ।' মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, 'আমি পলাণ্ডু ভক্ষণ করি তোমাদিগকে কে বলিল ?' 'এইমাত্র আপনি বলিলেন—প্রত্যহ পেঁয়াজ দিয়া পান্তাভাত খাই।' 'কিন্তু পেঁয়াজ যে পলাণ্ডু এটা তোমরা কিসে বুঝিলে ?' তখন পণ্ডিতমণ্ডলী মাথা চুলকাইতে লাগিল।'[২৬] কাহিনীটি কতটা সত্য তা জানি না, তবে তিনি যে যুক্তিহীন বিচার মানতেন না, তা সহজেই তাঁর সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল এবং স্বমর্য্যাদার প্রতি বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং সেজন্যই ধনী সম্প্রদায়ের কোন গোষ্টির (রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম সাক্ষাতকারের বিবরণ জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মৃত্যুঞ্জয়ের যোগদানের পূর্বেই উভয়ের পরিচয় হয়েছিল এবং কেরী তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি। কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে মৃত্যুঞ্জয়কে নিযুক্ত করার জন্য কেরী সুপারিশ করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিভা বিকাশের সহায়তায় কেরীর দান অতুলনীয়। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, সংস্কারহীন যুক্তিবাদী উদার মনোভাব, সামাজিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করার আগ্রহ, গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ প্রভৃতি সকলই যে কেরীর সাহচর্য্যের ফলেই হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। এক কথায় কেরীই মৃত্যুঞ্জয়কে আবিষ্কার করেন এবং সাধারণের কাছে তাঁকে প্রকাশ করেন। আবার সংস্কৃতের প্রতি কেরীর গভীর অনুরাগ এবং সংস্কৃত আশ্রয়ী ভাষাধারার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা মৃত্যুঞ্জয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। কেরীর সমগ্র বাংলা ও সংস্কৃত রচনার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে কেরীর বাংলা 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'র প্রধান রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বলেই অনুমান করা হয়। 'কথোপকথন' সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, "ইহার (কথোপকথনের) যত্রতত্রই দেশীয় লেখকের স্পর্শ পাওয়া যায়—এই দেশীয় ব্যক্তিটি মৃত্যুঞ্জয় হতে পারেন। কারণ এই যুগের রচনার মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ই দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া সাধারণ বাঙ্গালীর দুঃখদুর্ভর ভাবনা কামনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।"[২৭] সম্প্রতি কেরীর 'ইতিহাসমালা' সম্পাদনা করে ফাদার শুভিয়েন বলেছেন, 'রচনাকালে কেরী এমন একজনের সাহায্য পেয়েছেন যিনি—কেরীর সম্ভবতঃ নিজেরই অজান্তে সত্যিকার সাহিত্যিক ছিলেন।'[২৮] কোন জায়গায় উল্লিখিত না হলেও এই ব্যক্তিটি যে মৃত্যুঞ্জয় তা সহজেই অনুমান করা যায়, কারণ মৃত্যুঞ্জয়ই সে সময় কেরীর সবচেয়ে ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন এবং সে যুগে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যেই প্রকৃত সাহিত্য চেতনার বিকাশ দেখা গিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের সমসাময়িক যুগে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রামমোহন। রামমোহন যুগের সূচনাতেই হয় মৃত্যুঞ্জয়ের তিরোধান। ১৮১৩ হতে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তাঁরা একত্রে কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। বহু বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের পথ প্রদর্শক ও অনুপ্রেরণাদাতা। রামমোহন ভাবের গভীরতা, ভাষার শব্দ সম্পদ, বাক্য বিন্যাসের উন্নতরীতির দ্বারা নিত্য বাংলা গদ্য সাহিত্যকে যথেষ্ট উন্নত ও গৌরবান্বিত

করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ আদি গ্রন্থকারদের সহায়তা পেয়েছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ) গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক হিসাবে রামমোহনের নাম করা যায় না। তিনি বলেছেন, "নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে একথা স্বীকার করা কঠিন যে রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক।"২৯ তিনি মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন উভয়ের ভাষার তুলনামূলক বিচার করে দেখিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা রামমোহন অপেক্ষা কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয়।

এদেশে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করার প্রবর্তক বলে রামমোহন সুবিদিত এই প্রথা বন্ধ করার জন্য তাঁর মহান প্রচেষ্টা ও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু এ ব্যাপারেও রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়ের অনুগামী এবং মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ হতেই তিনি এ ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছিলেন এ কথা বললেও বোধ হয় ভুল হয় না। এই কুপ্রথার প্রতি রামমোহনের বিরোধী মনোভাব বহু পূর্ব হতে থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ সম্পর্কে কিছু করেন নি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নানা শাস্ত্র বিচার করে মৃত্যুঞ্জয় এ প্রথাটি শাস্ত্র সম্মত নয় বলার পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ লেখেন। এদেশীয়দের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও মৃত্যুঞ্জয়ই প্রথম বলেন সহগমন শাস্ত্রানুযায়ী অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয়। এই ব্রতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা রামমোহন এখান হতেই পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে E. D. Potts বলেছেন," **This finding (the finding of Mrityunjoy that Sati had no Shastric authority) was greatly strengthened in 1818 when the brilliant brahmin reformer and scholar, Rammohan Roy, probably influenced by Vidyalankar's big pronouncement, publicly but belatedly entered the ranks of the abolitionists."**৩০

পরবর্তিকালে রামমোহন তাঁর ইংরাজী পুস্তিকায় সহমরণ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমত উদ্ধৃত করেন।৩০(ক) বেদান্তচর্চা ও মূর্তি পূজা বিষয়ে উভয়ের মত ছিল কিন্তু পরস্পর বিরোধী। রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে মৃত্যুঞ্জয় লেখেন বেদান্ত চন্দ্রিকা। রামমোহন তার উত্তর দেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামক পুস্তিকায়। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র বিচারে মৃত্যুঞ্জয় সে সময় ব্যস্ত থাকায় তিনি তখন কোন উত্তর দেন নি এবং তারপর তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এবিষয়ে আলোচনা ওখানেই শেষ হয়।

প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর পরবর্তীকালকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি, কারণ তিনি হিন্দুধর্ম বিশ্বাসকে নস্যাত করে অন্ধভাবে পাশ্চাত্যভাব ধারা অনুকরণের আদর্শ প্রচার করেন নি বা গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্নের মত ধর্মের দোহাই দিয়া কুপ্রথাকে সমর্থন করেন নি। তাই গোঁড়া সমাজ বা আধুনিকতাবাদী কারোও দলভুক্ত হন নি। তবে তাঁর ভাবধারণা, সাহিত্যাদর্শ প্রভৃতি অনেকেই পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন রীতিনীতির যে পরীক্ষা তিনি গদ্যের সেই শৈশবে সুরু করেন তার পরিপূর্ণসার্থকরূপ দেখা যায় বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে গভীর মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা দেখা যায় তা তাঁর পূর্ববর্তীযুগে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যেই দেখা গিয়েছে। ধর্ম ও সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই বিদ্যাসাগর ধর্মের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যেও ঠিক এরূপ প্রয়াস ছিল। অশাস্ত্রীয় প্রথা ও অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েও ধর্মের আশ্রয় তিনি ত্যাগ করেন নি। **Potts** তাই বলেছেন, **"Not only did he (Mrityunjoy) remain unconverted after sixteen years of intimate contact with Carey but also he was a foremost Public defender of the then orthodox Hinduism."**৩১

মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে সবচেয়ে দুঃখের কথা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না ওড়িয়া ছিলেন এবিষয়ে বিতর্কের সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও জর্জ স্মিথ মৃত্যুঞ্জয়কে ওড়িয়া বলে বর্ণনা করেছেন।৩২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁকে ওড়িয়া বলে উল্লেখ করেছেন।৩৩ রামমোহন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয়কে ভট্টাচার্য্য বলেছেন। নবজীবন পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ সম্বন্ধে অনেকটা আলোকপাত করেন।৩৪ তিনি বলেন যে তিনি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করেছেন তাঁর পৌত্র বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয় মেদিনীপুরের যে অংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই অংশ তাঁর জীবদ্দশায় উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে বাংলা ও ওড়িয়া দুইভাষাই প্রচলিত ছিল।

তিনি উভয় ভাষাই জানতেন। ফলে বিদেশীদের পক্ষে তাঁকে ওড়িয়া বলে মনে করা কিছু অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীসরকারের এই বক্তব্যের পর হয়তো কোন প্রশ্ন থাকতো না, যদি না তাঁর প্রবন্ধে কয়েকটি মারাত্মক ভুল দেখা যেতো। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের উপাধি বিদ্যালঙ্কারের জায়গায় তর্কালঙ্কার লিখেছেন। তিনি লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মারা যান ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি আরও বলেছেন বিদ্যাসাগরের সংগে মৃত্যুঞ্জয়ের আলাপ পরিচয় ছিল, অথচ বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় মারা যাবার ১ বছর (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না জানা পর্যন্ত এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা শক্ত।

উল্লেখ পঞ্জী

১। Marshman J. C., Life and times of Carrey, Marshman and Word. I (1859) p. 180.

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ—সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ৩ (১৩৫৩) পৃ. ১৩

৩। কেরী, ম্যার্শম্যান, রামকমল সেন প্রমুখ অনেকেই তাঁকে অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বর্ণনা করেছেন।

৪। বন্দ্যো:, ব্রজেন্দ্র—সা: সা: চ: নং ৩ পৃ. ১৬।

৫। সমাচার দর্পণ, ৩১এ অক্টোবর, ১৮২৯।

৬। ঐ ১৯এ জুন, ১৮১৯।

৭। বন্দ্যো:, ব্রজেন্দ্র—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী।
Rev. Long.—Descriptive Catalogue (1855),p.55

৮। ঐ সা: সা: চ: নং ১৪ (১৩৫৪) পৃ. ৬

৯। Rev. Long—Descriptive Catalogue (1855), p. 55

১০। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'নবজীবন' মাঘ ১২৯৫ পৃ. ২৭৮

১১। Calcutta Review, July 1845, Vedantism—what is it ?

১২। বন্দ্যো:, ব্রজেন্দ্র—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী

১৩। ঐ সা: সা: চ: নং ৩ পৃ. ৪৬

১৪। ঐ ঐ পৃ. ৩৬

১৫। ঐ ঐ পৃ. ৪৫

১৬। সমুজ পত্র, ফাল্গুন, ১৩২১
১৭। Doy, S. K.—History of Beng. Literature (1962) p.200, 202
১৮। সেন, সুকুমার—বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৩৪১), পৃ. ২৬
১৯। বন্দ্যো:, অসিত—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য পৃ. ৫৭
২০। রায়, রামমোহন—'কবিতাকারের সহিত বিচার' রামমোহন গ্রন্থাবলী—অজিত ঘোষ (১৯৭৩), পৃ. ২১২
২১। Ward, William—A view of history Vol. IV (1820) p. 495
২২। বন্দ্যো:, ব্রজেন্দ্র—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী
২৩। Cal. Review—July, 1845 Vedantism—What is it ?
২৪। Friend of India (quarterly series) Vol. II no. vii p. 507
২৫। রায়, রামমোহন—কবিতাকারের সহিত বিচার
২৬। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র—নবজীবন, মাঘ (১২৯৩) পৃ. ২৭৭
২৭। বন্দ্যো:, অসিত—উনবিংশ শতাব্দীর..... (১৩৬৩), পৃ. ১১৩
২৮। ফাদার স্তিফেন—কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা (১৯১২) পৃ.: ৩১
২৯। মজুমদার, রমেশচন্দ্র—বাংলার ইতিহাস আধুনিক যুগ (১৯৭১) পৃ. ৪১৭
৩০। Potts, E. D.—British Baptist Missionaries in India (1967) p. 148
৩০। (ক) Ray, Rammohan—Some remarks... .. (1831) Eng. Works of Raja Rammohan Ray (Sadharan Brahma Samaj) (1934). p. 73-74
৩১। do p. 232
৩২। Smith, George—Life of William Carey (1885) p. 257
৩৩। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ—বাংলা সাহিত্য বঙ্গদর্শন (১২৮৭) পৃ. ৪৯৬
৩৪। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র—নবজীবন, মাঘ (১২৯৩) পৃ. ২৭৭

উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মচিন্তা ও অক্ষয় দত্ত

অসিত ভট্টাচার্য

দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন

রামমোহনের পর বাংলার ধর্মান্দোলনে স্বভাবতই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখিত হয়। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথকে (জন্ম ১৮১৭ মে ; মৃত্যু ১৯০৫ জানুয়ারি) রামমোহনের ধর্মভাবনা বা ধর্মদৃষ্টির উত্তরাধিকারী রূপে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু উভয়ের চিন্তা ও কর্মের ধারা অনুসরণে এই সহজিয়া মত গ্রাহ্য মনে হয় না। বরং দেখা যায় যে, সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূস্বামী দেবেন্দ্রনাথ যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবসায়ী ও পতনোন্মুখ মোগল সম্রাটের দূত রামমোহনের থেকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠির মানুষ, তেমনি ধর্মচিন্তা সমেত সমাজ-ভাবনার অন্যান্য স্তরেও দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন ভিন্ন পথের পথিক। এ-বিষয়ে দুটি মূল পার্থক্যের বিষয়ে বিশেষত উল্লেখ্য মনে করি।

(১) রামমোহন কখনও তাঁর জ্ঞানের এমনকি ব্রহ্ম জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে দৈবোদ্ভাসনের (devine revelation) উপর বা অন্তরোদ্ভাসনের উপর (Inner revelation) নির্ভর করেননি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি নির্ভর করেন বিতর্ক ও বিচারের উপর।

অন্যপক্ষে দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন সময়ে পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য০৫ দিলেও শেষপর্যন্ত আপন অন্তঃপ্রেরণাকেই তিনি প্রেরণার উৎস বলে বিশ্বাস করেন। আর এই অন্তঃপ্রেরণা, অন্তত তাঁর নিজের কাছে দৈবোদ্ভাসন বলেই প্রতীত হয়েছিল।০৬

(২) আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, রামমোহন কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি করে যান নি। বরং তাঁর প্রণীত ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কিত দলিল থেকে এ-কথাই মনে হয় যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একটি একেশ্বরবাদী গোষ্ঠি বা দল গঠন করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টা শুরু থেকেই একটি ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক সম্প্রদায়ের গঠনতন্ত্র রচনার দিকে ধাবিত হয়। ১৮০৯-এ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল

থেকে ব্রাহ্ম সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে চেষ্টা শুরু করেন তা ক্রমেই তাঁকে এক ঈশ্বরকেন্দ্রিক কর্তৃত্বপরায়ণ বিশ্বদীক্ষার দিকে নিয়ে যায়। এই গতিধারার প্রথম সার্থক রূপায়ণ ঘটে ১৮৩০-এ যখন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত The Brahmo Covenant বা ব্রাহ্ম অঙ্গীকার পত্র রচিত ও গৃহীত হয়।[৭] এর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাই ১৮৪১-তে সঙ্কলিত এবং ১৮৫০-এ প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম ১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থে। এর পূর্ণ রূপ চোখে পড়ে ১৮৬৪-র শেষে বা ১৮৬৫-র শুরুতে প্রকাশিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি গ্রন্থে। দেখা গেল লক ও নিউটনের মধ্যে যে চিন্তার শুরু, অবশেষে এই ঔপনিবেশিক সমাজে, তা অনুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে আকার পেল। তথ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে মৌল পার্থক্য আছে, তা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনার তত্ত্বগত কাঠামো স্মরণে রাখলে, স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ কেবল দু-জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নন্, দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির সামাজিক আন্দোলনের নেতা তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনের এই মৌলিক পার্থক্যের সামাজিক কারণ ও উৎস কি? যেহেতু আমাদের বিবেচনায় ধর্মমত সামাজিক মতের অঙ্গ ও অংশ এবং ধর্মমতের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের দ্যোতক, তখন এ প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ এমন কি অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব আমরা রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক উৎসমূল ও কর্মজীবনের পরিচয় গ্রহণ করব।

রামমোহন প্রসঙ্গে আমরা মনীষী হরপ্রসাদের একটি উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। 'সমাজ যে ভাঙিয়াছে তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন'। এই ভাঙনের[৮] বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৭৬৫-তে দান-কা-ওয়ন্তে মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে টাকা দিয়ে দেওয়ানি সনদ পাবার পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বারবার সর্বোচ্চ খাজনার দাবে গোটা বাংলাদেশকে নিলামে চড়াতে থাকে। এর ফলে দেশে যে ব্যাপক নিঃস্বতার সৃষ্টি হয়, তারই দরুন একবছরে শস্যহানিকে কেন্দ্র করে ১৭৬৯-৭০-এ ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়। মন্বন্তরে বাংলার জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশ অনাহার ও ব্যাধিতে মারা যান বলে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরাই স্বীকার করেছিলেন। তাতেও এই পীড়ন বন্ধ হওয়া দূরে থাক, হেস্টিংসের গৃহীত নীতি অনুসারে দুর্ভিক্ষে মৃতদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য খাজনা জীবিতদের কাছ থেকে আদায় করা হতে থাকে। বস্তুত ১৭৭০ থেকে ১৭৮৪-র মধ্যে বাংলায় আরো অন্তত তিনবার দুর্ভিক্ষ দেখা

দেয়। এই ক্রমিক্ষু পরিবেশে একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনার জন্যে সেই ১৭৮৪-তে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার কথা বলেন। সেই সময়ে বছর বছর খাজনার বন্দোবস্ত চলছিল বলে, জমিদার শ্রেণীর মধ্যেও অনিশ্চয়তা বেড়ে গিয়েছিল। (এই প্রসঙ্গে আনন্দমঠের মহেন্দ্রের সংসারী পিতা ভগবানের দুর্গতি স্মরণীয়)। অবশেষে ১৭৮৯-তে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রস্তাবিত দশশালা বন্দোবস্ত ১৭৯৩ তে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি লাভ করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আকারে এদেশে প্রবর্তিত হয়। এই বন্দোবস্তে (Settlement) কোম্পানীর সরকারকে জমিদারদের দেয় খাজনা চিরকালের মতো বেঁধে দেওয়া হয়। এতে পূর্ববর্তী নিলামের দ্বারা স্থিরীকৃত অত্যুচ্চ খাজনার দাবী একটুও কমানো হয়নি—শুধু খাজনা আদায়ের দায়-দায়িত্বটা পড়ে জমিদারদের ওপর। তাঁদের লোভ দেখানো হয় যে, এখন সরকারের খাজনার খাঁই বেশী হলেও ভবিষ্যতে জমিদারদের খাজনার আয় যে কোনো কারণে যতোই বাড়ুক, সরকার সেই বাড়তি আয়ের ওপর কোনো দাবী করবে না। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খাজনার খাঁই গোড়াতেই এতো বেশী ছিল যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার কয়েক বছরের মধ্যেই—গুপ্তের মতে,—জমিদারদের ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড দেনা হয়ে যায়। দেশের অর্ধেক চাষের জমি বাকি খাজনার দায়ে নিলামে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থাই প্রথমটায় চালু থাকে—কারণ খাজনার দাবী পূর্ববৎ উঁচু-হারেই বাঁধা ছিল। এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে Ascoli বলেন যে, জমি নিলামে চড়িয়েও সেজমি কেনার লোক মিলত না। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত সরকারী খাজনার আদায় উশুলের যে তথ্য অধ্যাপক এন. কে. সিনহা দিয়েছেন তাতে এই মত সমর্থিত হয়।৩০ এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, অষ্টাদশ শতকের পুরণো বড়ো জমিদারদের কাউকেই প্রায় উনিশ শতকে দেখা যায় না। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মতো যাঁরা ইংরেজের ঘরে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তারাও যেমন পথে বসেন, তেমনি সর্বস্বান্ত হন বর্ধমানের রাণী ভবানীও। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় পুরণো চালের জমিদার-ইজারাদারদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ দুরবস্থায় পড়েন, তাঁদের মধ্যে আমাদের কাছে বিশেষত উল্লেখযোগ্য হলেন রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন। পিতা রামকান্ত বকেয়া খাজনার দায়ে বারবার জেলবাস করে অবশেষে ১৮০৩-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জগমোহনও বাকি খাজনার দায়ে বেশ কয়েক বছর রাজত বাস করেন। রামমোহন এঁদের

সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখেন নি ; উপদেশও দেন নি, দায়িত্বও নেন নি। তাঁর আর্থিক জীবন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক পথে পরিচালিত হতে থাকে।

এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনোপায়কে বুঝতে হলে, আর একদিকে তাকাতে হবে। তপনমোহন রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই সোনারূপো আমদানি তথা বাংলার বহির্বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবাব সরকারের ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠ তথা বাংলার বাণিজ্যের উপরেই নিয়ন্ত্রণজাল বিস্তার করে।৬১ পলাশীর যুদ্ধের একবছর আগেই এদেশে কোম্পানির কর্তারা নিজেদের শক্তি এতো বেশী বলে বুঝেছিলেন যে, দেশের ভিতরে তাঁতীদের কাছ থেকে কাঁচা কাপড় সংগ্রহের জন্যে যে সব দিশি দালাল ও মহাজন (Contractor) রেখেছিলেন, তাদের ছাঁটাই করে দেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর পূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থিক তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন বলে মনে হয় না। কোম্পানির লোকেরা সেকালে তাদের এই কাজের জন্যে যেসব অজুহাত দেখিয়েছিল তাঁরা তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকেরা যাই বুঝুন, কোম্পানির কর্তারা মানে বুঝতে দেরী করেন নি। তাঁদের লাভের অংশে আর কোনো বখরাদার রইল না, এই চিন্তায় তাঁরা অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন। তাঁদের আনন্দ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল পলাশীর যুদ্ধের পর। এইবার রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কমদরে দিশি মাল আদায় করে, বেশী দরে বিদেশী মাল এদেশে বেচা যাবে, এই আশায় আনন্দে একেবারে ফেটে পড়লেন তাঁরা।৬২ ঘটনাও যে সেইরকম হয়েছিল, তা রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত বহু খ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত সার্জেন্ট ক্রেগোর চিঠি থেকেই বোঝা যায়। চৈনিক পলিটিক্যাল ইকনমিতে যাকে 'আমলাতান্ত্রিক পুঁজি' বা Bureaucratic Capital বলা হয়, সেই জিনিস যখন 'বিদেশী আমলাতান্ত্রিক পুঁজি' বা Foreign Bureaucratic Capital হয়ে দেখা দেয়, তখন যে তা কী ভয়ানক মূর্তি ধরে, সে বিষয়ে বাংলার সেকালীন অর্থনৈতিক ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা ভালোই জানেন। কিন্তু ব্যাপারটি এই রকম ঘটলেও, তাঁতী প্রভৃতি উৎপাদকরা কার্যত দাসে পরিণত হলেও, রেশম-শিল্পীরা ইংরেজ কুঠিয়ালদের ভয়ে নিজেদের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেও, কোম্পানির কর্তারা বিলেতে বসে যা চাইছিলেন তা হলো না ! কারণ বিচিত্র !

দেশী বণিকদের প্রতিরোধ বা তার আশা, মীর কাশিম-এর গদীচ্যুতির (১৭৬৩)

পর শূন্যে বিলীন হয়। অতঃপর মীরজাফর যখন নাম-কা ওয়াস্তে হলেও, দ্বিতীয়বার নবাব হয়ে এসে নিজের কর্মচারীদের চালাও হুকুম দিলেন৬৩ যে, "কোম্পানির গোমস্তারা [কর্মচারীরা] স্থলপথে অথবা জলপথে যে কোনো মাল তাদের কুঠি (factory) আনুক, অথবা যে কোনো জায়গা থেকে [অন্য] যে কোনো জায়গায় যদি কুঠিয়ালের দস্তক নিয়ে যায়, সেজন্যে কোনো শুল্ক চাইবে না বা নেবে না।.....এই হুকুমের বিরুদ্ধে যেই থাক না কেন তাকে শাস্তি দেবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইংরেজদের আছে .....৬৩ তখন, দেশী বণিকদের কেবল দুটি পথ খোলা রইল। হয় তাদের কোম্পানির গুঁতোদারি বা দালালি করতে হবে, নয় সমূলে উচ্ছন্নে যেতে হবে। স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার কোনো উপায় আর বাংলার বণিকদের রইল না।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একটি অভাবিত অবস্থার উদ্ভব হলো। কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা দেখল যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দস্তক (pass) দিয়ে নিজের নিজের ব্যবসা চালাতে পারে—লাভের পাহাড় জমাতে পারে। তবে কেন তারা লণ্ডনে পড়ে থাকা কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের পকেটপুর্তির জন্যে নিখো খেটে মরবে? যখন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে', তখন আর কর্মচারী হয়ে কেবল গোমাগাঁথা মাইনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকা কেন? এই হলো তাদের ভাব ও ভাবনা। এইভাবে ভাবিত হয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশে যে যার নিজের নিজের ব্যবসা শুরু করল। (ক্লাইভ তো আরো কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে বাংলায় একাধিক পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসাই শুরু করে দেন। কোম্পানির কর্তাদের চাপে তাঁকে সেই একচেটিয়া কারবার গুটিয়ে ফেলতে হয়।) ব্যবসার মাল ও লাভের কড়ি তারা এদেশের বাইরে পাঠাতে শুরু করল ফরাসী ও ডাচ্ কোম্পানির মারফৎ। কারণ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকার দরুণ, তাদের মারফৎ কোম্পানির কর্মচারীদের কিছুই ভারতের বাইরে পাঠাবার উপায় ছিল না। এই অবস্থার ফল দাঁড়াল অদ্ভুত। কোম্পানির কর্তারা দেখলেন যে, এদেশের রাজা হওয়ার ফলে, তাঁদের ব্যবসা ক্রমেই কমে আসছে; অন্যদিকে, রাজত্ব না করে, ফরাসী ও ডাচ্ কোম্পানির ব্যবসা দিনে দিনে ফেঁপে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমলে কোম্পানির কর্তারা বললেন যে, আবার সিধে কনট্রাকটরদের ফিরিয়ে আনো। কিন্তু তখন তারা কোথায়? আর, কে তাদের ফিরিয়ে আনবে? বরং এই সময়ে ১৭৭৬-এ কেতাবী ব্রিটিশ অর্থনীতির আদিগুরু আদম স্মিথের

Wealth of Nations প্রকাশিত হয় এবং তাতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা হলো যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকার ফলে, সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে Free Trade বা অবাধ বাণিজ্য একান্তই দরকার। এই অবাধ বাণিজ্যের দাবীটা তুলে নিল কোম্পানির কর্মচারীরাও। তারাও নিজের নিজের ব্যবসা চালিয়ে ধনী হবার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 'অবাধ বাণিজ্য'-এর ভক্ত সাধকে পরিণত হলো। দেখা যাবে যে, ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ এবং পরে ১৮৩৩ পর্যন্ত কোম্পানির প্রত্যেকটি নতুন সনদে (charter-এ) প্রাচ্যদেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ধাপে ধাপে সঙ্কুচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছে। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে অসম শুল্ক ব্যবস্থার আওতায়, এই অবাধ বাণিজ্যের প্রচণ্ড চোট এসে লাগল ভারতীয় জীবনে। আমদানীর ওপর শুল্কহীন ভারতবর্ষে হুহু করে বাড়তে লাগল ব্রিটিশ সুতী কাপড়ের আমদানি। কার্ল মার্ক্স-এর ভাষায় হিন্দুস্তান তাঁতিদের হাতে 'সাদা' হয়ে যেতে লাগল।

রামমোহনের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, ১৭৯৬-এর ১লা ডিসেম্বর পিতা রামকান্ত রায়ের কাছ থেকে অন্যান্য ভ্রাতার মতো পৈত্রিক ভূসম্পত্তির অংশ পাবার পর, তিনি সেই বিষয়ে তদারক করলেও, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নি। ১৭৯৭-তেই তিনি কোলকাতায় আসেন এবং তেজারতীর কারবার শুরু করেন। (প্রথম উল্লিখিত খাতক ছিলেন, কোম্পানির সিভিলিয়ান জনৈক এ্যানড্রু র‍্যামজে)। তেজারতী থেকে কোম্পানির কাগজ কেনাবেচার সূত্রে তাঁর ধনাগম ঘটে। অতঃপর তিনি সচেতনভাবে লাভজনক পরগণা বাছাই করে, তা, ক্রয় করতে থাকেন। তাঁর পিতা ও ভ্রাতার মতো পুরনো পরগণা আঁকড়ে থেকে জমিদার হন নি। ১৮০৪-এ দেখা যায়, রামমোহন তাঁর আর এক খাতক সিভিলিয়ান, উডফোর্ড-এর দেওয়ান। সে সময়ে উডফোর্ড ছিলেন বর্তমান ফরিদপুরের বা সেকালীন ঢাকা—জালালপুরের কালেক্টর। ১৮০৫-এ উডফোর্ড স্বদেশে ফিরে যান। এবং সেই ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহনের স্থায়ী কোলকাতা বাস শুরু হবার আগে পর্যন্ত রামমোহনকে—আর একজন সিভিলিয়ান, জন ডিগবীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এই কালে অধিকাংশ সময়েই তিনি জন ডিগবীর দেওয়ান হিসেবে কাজ করছিলেন। ডিগবী ছিলেন রংপুরের কলেক্টর।

আমায় স্বীকার করতে হবে যে, এই 'দেওয়ান' পদটির তাৎপর্য একদা আমায় বিভ্রান্ত করে। এখনও এ-বিষয়ে আমি জোরের সঙ্গে কোনো মত প্রকাশে অক্ষম। তবু, যদি আলোচনার সূত্রে সত্য উদ্ঘাটিত হয়, এই আশায়, এ-বিষয়ে আমার মত—কার্যত অনুমান পেশ করছি। আমরা জানি যে, সেকালে কোম্পানির প্রত্যেক বড়ো কর্মচারীরই নিজস্ব ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে দেখাশোনা করার জন্যে দেশীয় মহাজন ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে একজন দেশীয় ভদ্রব্যক্তিকে নিজস্বার্থেই তাঁদের পোষণ করতে হতো। ইনিই দেওয়ান। নচেৎ উডফোর্ড বা ডিগবীর মতো জেলা কালেক্টারের পক্ষে রামমোহনের মতো একজন ক্ষমতাশালী পুরুষকে ব্যক্তিগত দেওয়ান হিসেবে পোষণ করার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারতো না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রামমোহনকে ডিগবীর কর্মচারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।৬৪ কিন্তু উডফোর্ড বা ডিগবীর সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক নিছক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল না। এটা যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পেরেছিল তার কারণ উভয়ত এটা একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এই ধারণার মূলে এই সত্য কাজ করছে যে, এই সময়ে রামমোহন নিজেও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিত্ত সঞ্চয় করছেন—যেমন করছেন, তাঁর তথাকথিত মনিব ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও। তাঁরও নিজের তহশীলদার রয়েছে; রংপুরে থাকাকালীন দু-জায়গায়—রংপুরে ও কোলকাতায়। বস্তুত কোনো বিদেশী সিভিলিয়ানের ছত্রচ্ছায়ায় না থাকলে তখন দেশীয় কারুর পক্ষে ব্যবসা করাই ছিল অসম্ভব। বিশেষত লর্ড কর্ণওয়ালিশের Agency System চালু হবার পর ১৭৯১ থেকে কোম্পানীর মাল কেনাবেচার জন্যে, বা কোম্পানির ব্যবসার কনট্রাক্ট নেবার জন্যে, কোনো এদেশী লোক আর কোম্পানির এজেন্ট হতে পারতো না। আর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা যে অনেকদিন আগেই এইসব কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে চলে গিয়েছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। সুতরাং রামমোহনকেও সিভিলিয়ানদের ছত্রচ্ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হয়—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান অনুযায়ী বাঙ্গালী 'বাবু' হয়ে থাকার জন্যে নয়, নিজের ব্যবসা অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

এই পরিস্থিতিতে যখন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা—যারা নামে কোম্পানির কর্মচারী কিন্তু কাজে কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী—তারা যখন অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) দাবী তুলে ধরেন, তখন ব্যবসায়ী হিসেবে রামমোহন এবং তাঁর বন্ধু স্থানীয় ব্যবসায়ী দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও কোম্পানির বিরুদ্ধে সেই একই দাবী

উত্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশে স্বাধীন (অর্থাৎ কোম্পানির এক্তিয়ারমুক্ত) ইংরেজ বণিকদের বসবাস ও প্রার্থনা করেছিলেন তাঁরা।৬৫ তাঁরা আশা করেছিলেন যে, দেশী-বিদেশী বণিকসম্প্রদায় মিলে তাঁরা এদেশে একটা নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে আমেরিকার মতো "স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী কর্তৃক প্রাপ্ত হইবেক।"৬৬ ফলও ঔপনিবেশিকতার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা তাঁদের চেতনায় স্পষ্ট হয়নি। রামমোহন যখন ১৮৩১-এ ইংলণ্ডে উপস্থিত হন তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবার রদ করে অবাধ বাণিজ্য চালু করার জন্যে তিনি বিশেষ প্রার্থনা করেন।৬৭ তাঁর সে প্রার্থনা পূরণও হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে দেশী-বিদেশী বণিকদের সমবায়ে এদেশে কোনো স্বাধীন বণিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। যা গড়ে উঠল, তা হলো, একদিকে কর্ণওয়ালিশের 'এজেন্সী সিস্টেম' এবং অন্যদিকে বৃহৎ ব্রিটিশ পুঁজি, ব্যাঙ্ক ও under writer-দের সমবায়ে গঠিত 'ম্যানেজিং এজেন্সী সিস্টেম'। ১৮৩৩-এর সনদের পর যখন কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার রদ হয়, তখনই ম্যানেজিং এজেন্সী কারবার বা হাউসগুলির দ্রুত সম্প্রসার ঘটে। কর্ণওয়ালিশের আমলের এজেন্টরা হলেন বিলিতি বৃহৎ পুঁজির এদেশে অবস্থিত ম্যানেজিং এজেন্ট। গোড়া থেকেই এই ব্যবস্থা আমলা-তান্ত্রিক পুঁজির রাজনৈতিক ক্ষমতার আওতায় পরিচালিত। গোড়া থেকেই এর চরিত্র, একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব সম্পর্কে, পশ্চিমীসূত্রে প্রাপ্ত কেতাবী অর্থনীতির যে বয়ান, তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

রামমোহনের আশাবাদ, যুক্তিবাদ, জন লকের প্রতি আনুগত্য এসবই বোঝা যায় যখন দেখি তিনি সেকালে অন্তত কিছু সময়ের জন্যে এদেশের উদীয়মান বণিক শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন প্রতিভূ ছিলেন। কিন্তু কোম্পানির আমলাদের সঙ্গে যুক্ত এই শ্রেণীর রাজনৈতিক অচেতনারও অংশীদার ছিলেন তিনি। ১৮৩৩-এর সনদ যে, ১৬৮৮-র glorous revolution, হতে পারে না, এ তিনি বুঝেছিলেন বলে, মনে হয় না। তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আশাভঙ্গের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর জন্যে তাঁর দোষ দর্শনের অধিকার আমাদের অন্তত নেই। যাঁরা রামমোহনের মৃত্যুরও শতাধিক বৎসর পরে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার একাকার করে ফেলতে পারেন, তাঁদের কোনো অধিকার নেই রামমোহনের প্রতি জাতীয়তার প্রসঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করার। তবে, ভারতীয়, এক্ষেত্রে বাংলার তৎকালীন বণিক শ্রেণী বা গোষ্ঠি সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয়। তাঁরা চাইছিলেন রাস্তায় চেপে যাবার জন্যে একটি

ঘোড়া। ১৮৩৩-এর সনদে তাঁরা পেলেন রাস্তায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি অশ্বশাবক। 'উল্টা সমঝলি রাম' প্রবাদের কথা এ প্রসঙ্গে মনে না এসে পারে না।

ইংলণ্ড থেকে ২২শে মে ১৮৪৬-এর লিখিত, দ্বারিকানাথ ঠাকুরের একটি পত্রের ভিত্তিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে একটি সংজ্ঞিয়া মত প্রচলিত আছে যে, তিনি মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে এত জড়িত হয়ে পড়েন যে, বিষয়-কর্মে আর মনোনিবেশ করতে পারেন নি—এবং তার ফলেই দ্বারিকানাথ প্রতিষ্ঠিত কার-ঠাকুর কোম্পানি উঠে যায়। মতটি নানা কারণে গ্রহণীয় মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথ যদি একান্ত ব্যবসায়মুখীন হতেন, তাহলেও ১৮৪৮-এ কার-ঠাকুর কোং উঠে যেতে পারত, কারণ ১৮৪৭-৪-এ একটি বড়ো আন্তর্জাতিক মন্দার (depression) আঘাত ব্রিটিশ অর্থনীতি থেকে সৃষ্টি হয়ে এদেশের অর্থনীতিকে আঘাত করে। বিখ্যাত অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখক W. W. Rostow তাঁর *British Economy of the 19th Century* (1956) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৪৭-৪৮ সালকে তিনি মন্দার trough (বা নিম্নতম স্তর) বলেছেন। তারপরেই ছুটকি বাজার শুরু হয়। ব্রিটেনের এই মন্দার দরুণ সৃষ্ট বেকারীর তথ্য (Unemployment Data) প্রদান করতে গিয়ে রস্টভ ১৮৫০ থেকে আরম্ভ করেছেন। কারণ তাঁর মতে, '1850 comes after the beginning of the revival in 1848।' যাই হোক ১৮৪৮-এ শুধু কার-ঠাকুর কোং এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নয়, অনেক কোম্পানী ও এজেন্সী হাউস দেউলিয়া হয়। এক্ষেত্রে যেটা লক্ষণীয়, সেটা কোম্পানির বিশেষ কিছু হওয়া নয়, সেটা এই যে, মন্দার পর যখন চড়া-বাজারের ভাব ফিরে আসে, তখন দেখা যায় যে, নতুন পরিবেশে বাঙালী কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই অনুপস্থিত। অনুমান করতেই হয় যে, মন্দার প্রভাব অতিক্রম করার মতো উপযুক্ত সংগঠন, সংহতি ও পিছনে সরকারী ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সমর্থন তাঁদের ছিল না—যা সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির ছিল। সে আলোচনা আপাতত থাক। এখন দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

কার-ঠাকুর কোম্পানি উঠে যাবার পর দেবেন্দ্রনাথের বৈষয়িক জীবন কি শেষ হয়ে যায়? জীবনীকারদের বিপরীত প্রচার সত্ত্বেও ইতিহাস কখনই মেকথা বলে না। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সাহস প্রকাশ করেন একজন নেতৃস্থানীয় ভূস্বামীরূপে। ভারতবাসী ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য দূর করার জন্যে ডন্ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন ১৮৪৯-এ একটি খসড়া আইন আনার পর এদেশের শ্বেতাঙ্গরা তাদের চিরাচরিত জাতি-বৈষম্য জীইয়ে রাখার জন্যে হৈ-চৈ চিৎকার শুরু করে এবং ভারত সরকারকে

এই খসড়া বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। [বেথুনের এই বিলের পরিণাম পরবর্তী কালের ইলবার্ট বিলের (১৮৮৩) পরিণাম স্মরণ করায়]। এই সময়ে সরকার ও শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলার Landholders Association-কে যাঁরা সক্রিয় করে তোলেন তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। শুধু তাই নয়, রামগোপাল ঘোষের আন্তরিক চেষ্টায় ও উদ্যোগেও উপরোক্ত ভূস্বামী-সভা ও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তৎকালে নিষ্ক্রীয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিলিত হয়ে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫১, ২৯ অক্টোবর) তখন প্রথম থেকে দুই বছরেরও বেশী,—১৮৫৪-এর ১৩ই জানুয়ারি পর্যন্ত, দেবেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক রূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা করেন। যোগেশচন্দ্র বাগল উল্লেখ করেন যে, "সভা প্রতিষ্ঠার পক্ষকাল মধ্যেই ১১ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে একযোগে কার্য করিবার জন্য লিপি প্রেরণ করেন। এসময়ে বোম্বাইয়েও একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাও স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই মর্মে লিখিলেন যে, E. I. Co.-র সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রায়, এসময়ে একযোগে কাজ করিলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়তা হইবে।"[১০] দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠে দেখি যে, এসময়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পশ্চাতেও রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। যেমন—

"যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি তবে, সমুদায় ভারতবর্ষে ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার [ভারতের] পূর্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।"[১১]

বস্তুত এ ভাব তাঁর কখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। ১৮৬১-তে প্রদত্ত (১৭৮৩ শক ২০শে বৈশাখ) এবং ঐ বছর 'ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান, প্রথম প্রকরণ' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট, ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যানে তাঁকে বলতে শুনি, "যে ধর্মের প্রাণ স্বয়ং ব্রহ্ম সেই ধর্মের বলে আমরা পুনরায়" স্বাধীনতা লাভ করিব। স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ-সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব, পরাধীনতাই দুঃখের মূল।[১২]

এক্ষেত্রে অবশ্য স্বাধীনতা লাভের পন্থা, অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত 'জাতীয় ঐক্য' আর ১৮৫০-এর মতো স্পষ্টত উচ্চারিত হয়নি—'ধর্মের বল' যেন অনেকটা অলৌকিক শক্তি হিসেবেই উপস্থিত হয়েছে, এবং দেখা যায় যে, আত্মার স্বাধীনতার উপরেই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আনার দায় ন্যস্ত হয়েছে। তবু, স্বাধীনতার চিন্তা

যে তাঁর ধর্মচিন্তার অন্যতম প্রেরণা ছিল, পরাধীনতার দুঃখ দূর করা যে তাঁর ধর্মান্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, একথা বিস্মৃত হলে, ইতিহাস ও দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, উভয়ের প্রতি অবিচার করা হবে। আমরা জানি যে, "দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক থাকাকালে, চৌকিদারি আইন, নাখেরাজ ভূমি সম্পর্কীয় আইন, গবর্ণমেণ্ট লবণ উৎপাদন একচেটিয়া করায় জমিদার ও প্রজার অসুবিধা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভা আলোচনা করেন, এবং প্রতিবাদ লিপিও সরকার পেশ করেন। কিন্তু এই সময়কার সর্বপ্রধান ব্যাপার ভারত শাসন সম্পর্কে স্মারকলিপি প্রেরণ।"[১৩]

যোগেশচন্দ্র বাগল উল্লেখ করেছেন যে, "এই স্মারকলিপি রচনায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল বলিয়া জানা যায়", কিন্তু এর প্রেরণায় এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। বিশেষত বিনয়বিহারী মজুমদার তাঁর '*Indian Political Association and Reform of Legislature* (1818-1917) Calcutta 1965. ১৪ এবং দাদাভাই নৌরজীর বক্তৃতা থেকে এই চেষ্টার যে সুদূর বিস্তারী ফলের বিষয় উল্লেখ করেছেন তা স্মরণে রাখলে এই স্মারকলিপিতে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভাব অগোচরে থাকে না। আমরা বুঝতে পারি যে, কেন, "এই স্মারকলিপিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের শাসননীতির আদর্শে ভারতবর্ষেও স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপিত হয়... ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যপদে ভারতীয় গ্রহণের আবেদনও জানানো হয়।"[১৫]

বস্তুত এই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছাড়া আর একটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সংস্থা ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন বা দেশ-হিতার্থী সভার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানেরও (প্রতিষ্ঠাকাল সেপ্টেম্বর ১৮৫১) সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এঁদের প্রস্তাবে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে, এদেশে ব্রিটিশ আইন 'এদেশীয় প্রজা সাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে'। বিচার ব্যবস্থার সংশোধন প্রস্তাবও এঁরা উত্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মতো কেবল ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়নি। এঁরা চেয়েছিলেন যে, "সংস্থাটি [ব্রিটিশ-ভারতীয়] সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণীর প্রজাদের দ্বারা-গঠিত হবে, তার মধ্যে ধর্ম, জাত বা দেহবর্ণের পার্থক্য থাকবে না।"[১৬]

আমরা দেবেন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত একাধিক মন্তব্য থেকে দেখেছি যে, এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা এবং সমাজচিন্তা তথা রাজনীতিচিন্তা একই খাতে বহমান

ছিল। এই সময়েই তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ণ সহযোগিতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু দেখা যায়, অল্পদিনের মধ্যে, স্পষ্টত ১৮৩৪-র জানুয়ারিতে দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত রাজনৈতিক সভাসমিতি থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন। এর কারণ কেউ অনুসন্ধান করেন নি। যদিও দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যোগেশচন্দ্র বাগলও উল্লেখ করেছেন যে, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অতঃপর কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে দেখি না।"[৭৭] আমরা জানি না যে, এদেশের ভূস্বামী সম্প্রদায় ও তাদের চালিত আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে তিনি নিরাশ হয়েছিলেন কিনা। কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে দেখি যে, ১৮৩৪-র জানুয়ারিতে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে স্পষ্ট অপসরণ করার পরই তিনি বিশেষত মন দেন বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-বাদ বিস্তারে। তাঁর ব্রহ্ম-বাদের প্রকৃতিও এই কালে পরিবর্তিত হতে দেখি। তিনি বিরক্ত বোধ করতে থাকেন তত্ত্ববোধিনীর 'নাস্তিক'দের ওপর, অর্থাৎ অক্ষয় দত্ত ও তদীয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির উপর। আমরা পরে দেখব যে, তত্ত্ববোধিনী মারফৎ এই 'নাস্তিক' বর্গ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারে ও ব্রিটিশ শাসন এবং জমিদারী ব্যবস্থার অন্যায় প্রকৃতির উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যাই হোক' ১৮৩৪ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠেন যে, এই 'নাস্তিক'দের দূর না করলে বিমল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আর কোনো উপায়ই নেই।[৭৮] ফলত যতোই তিনি প্রত্যক্ষ সামাজিক রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে এলেন, যতোই তাঁর জীবন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ-সম্পর্কহীন বিশুদ্ধ ভূস্বামীর জীবন হয়ে উঠল, ততোই তিনি প্রত্যক্ষ সমাজ-ভাবনার থেকে দূরে বিশুদ্ধ ধর্ম ভাবনার ভাবুক হয়ে ওঠেন। ১৮৩৬ অক্টোবর থেকে দুই বছরের জন্য হিমালয় প্রবাস তাঁর এই প্রবণতা আরো দৃঢ় মূল করল। ১৮৩৮-র ১৩ই নভেম্বর কলকাতায় প্রত্যা-বর্তনের অব্যবহিত পরেই তিনি যে কাজে হাত দিলেন তা হলো 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র বিলোপ আইন। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে ১৮৩৯-র মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা লোপ পেল, এবং তাঁরই নির্দেশে সভার শেষ সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্য্য ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্ম সমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ত্ববোধিনী সভা লীন করিয়া দিলেন।"[৭৯] নাস্তিকরা দূর হলেন। এবং ১৮৩৯-তেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে ব্রহ্মানল, আবিষ্কার করে তাঁকে সমাজের নেতৃপদে বরণ করলেন। অক্ষয় দত্ত ও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ও

বৈপরীত্যের বিষয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার আশা রাখি। আপাতত রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাপার্থক্যের অপেক্ষাকৃত পূর্ণ একটি অবয়ব উপস্থিত করতে চাই। এ-বিষয়ে আমরা দুটি প্রধান পার্থক্যের সূত্র পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

প্রথমত, রামমোহন বিচার-বিতর্কের পথে নিজের ধর্মমত সংস্থাপনে ব্রতী হন এবং দেবেন্দ্রনাথ দৈববোধাসন বা অন্তর্বোধাসনকে তাঁর ধর্মভাবনার কেন্দ্ররূপে বিশ্বাস ও দাবী করেন। (যদিও এ-বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক উপলব্ধি যুক্তি বিচারের পথেই এসেছিল বলে আমরা তাঁর সাক্ষ্য থেকেই জানি।)

শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের ক্ষেত্রে রামমোহন যে কাজ করে যান তা অদ্যাবধি তুলনারহিত। কারণ তিনি শুধু নিপুণ শাস্ত্র-বিচারই করেন নি, শাস্ত্র বিচারের যুক্তি সম্মত একটা পদ্ধতিও তিনিই সৃষ্টি করে যান। ভূস্বামী নির্ভর ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী শাস্ত্রের নামে বাতুলতার যে অচলায়তন গড়ে তুলেছিলেন (নমুনা : অমুক কাজ করলে শরীরে যতো লোম আছে ততো বছর স্বর্গবাস কি নরকবাস ; অমুক কাজ করলে ত্রি-কোটি বৎসর নরকবাস কি স্বর্গবাস ইত্যাদি) সেই উদ্ভট, আজগুবি ও উচ্চারণের অযোগ্য বাক্যস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে, শাস্ত্রের নামে ভুরি-পরিমাণ মিথ্যা বচন যখন কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার মুখোশ পরে মানুষকে প্রতারিত করে চলেছিল, তখন সেই অবস্থায় মস্তিষ্ক শীতল রেখে, শব্দার্থের বোধ স্পষ্ট করে, কি শাস্ত্র এবং কি বা শাস্ত্র নয়, তা নির্ণয়ের পথ-নির্দেশ করে তিনি যে বিপুল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান, তা আজও ঠিক মতো বোঝা হয় না, কারণ তা বোঝার মতো জ্ঞান ও বোধশক্তি আমরা হারিয়েছি।

অপরপক্ষে দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায় তিনি অক্ষয় দত্ত সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনীতে যে খেদোক্তি করেন, তারই মাধ্যমে। আত্মজীবনীতে তিনি অক্ষয় দত্তকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগের পরিণাম সম্বন্ধে বলেন :

আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্যে [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা] নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মত বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা করিতাম ; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায় ? আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ—আকাশ-পাতাল প্রভেদ।৮০

বাস্তবিকই তাই, 'আকাশ-পাতাল প্রভেদ'। কিন্তু এই প্রভেদ শুধু অক্ষয় দত্ত

ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে নয়, রামমোহনের পদ্ধতি ও দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতির মধ্যেও। অক্ষয় দত্ত রামমোহনের বিচারমূলক পদ্ধতিই অনুসরণ (অনুকরণ নয়) করে চলেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আদিম বৈদোপনিষদ লব্ধ সত্য নির্ণয়ের পদ্ধতিতে। এই প্রত্যাবর্তন যে তাঁর সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত তা আমরা দেখেছি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রামমোহন সম্পর্কে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্রভূত প্রকাশ করলেও, পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সামাজিক ঐতিহাসিকবর্গ কেউই রামমোহনের পদ্ধতিকে স্বাগত জানান নি।

তাই দেখি যে, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস' নামক ইংরেজি গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতিকেই ধর্মের অনুকূল বিবেচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য ধর্ম জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ছিলেন, মূলত গঠনধর্মী ও রক্ষণশীল। তিনি ঋণাত্মক (negative) বিচারবিভেদের অক্ষয় দত্তকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন যে, দত্ত "জটাজুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন।" এই কারণে সম্পাদকের মত স্বেচ্ছামত কাটা-ছুটি করার অধিকার তাঁর আছে বলে তিনি আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে জ্ঞান সম্পর্কে দত্তের সম্পাদকীয়গুলি দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। বিশেষত ৭ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৭৬৫ শকে দত্ত স্পষ্টই প্রশ্ন করেন 'নির্জ্জন বনবাসী হইলে পশুগণের সহিত আমার বিশেষ কি প্রভেদ থাকে ?" তিনি জানেন knowledge is a social (dissent) পথে ধর্মীয় সত্য উপনীত হন নি ; পরন্তু [দৈব] উদ্ভাসন ও অন্তর্দৃষ্টির সদর্থক পথে [সত্য উপনীত হন]। ফলে, ধর্ম তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ মানসিক অনুভূতির বিষয় ছিল :—এমন একটি বাস্তব সত্য যার মধ্যে অপরাপর সমস্ত বাস্তব সত্য বিধৃত। ধর্মজীবন তাঁর কাছে বিকাশের বিষয় ছিল কেবল যুক্তি বুদ্ধির সম্মতি নয়। [তা ছিল] একটি আত্মিক প্রভাব যা সারা জীবনে সঞ্চারিত ও সঞ্চারিত হয়।৮১ আচার্য শিবনাথের মতে পরমপুরুষের প্রতি আত্মিক বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ মূর্তিপূজা ত্যাগ করেন অন্য কারণে নয়। অথচ দেবেন্দ্রনাথের নিজের ভাষণ থেকেই আমরা এর বিপরীত সাক্ষ্য পেয়েছি।

আচার্য শিবনাথ ছিলেন সৎপ্রকৃতির ভাবাশ্রয়ী মানুষ। নিঃসন্দেহে তাঁর বুদ্ধিও ছিল, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বা intellectual হবার dutions distinction তাঁকে স্পর্শ করে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রূপে যিনি স্বীকৃত, সেই

রামমোহন রায় স্বয়ং কি, শিবনাথ যাকে negative process of dissent বলেছেন, তার দ্বারা তাঁর সত্যে উপনীত হন নি ? এবং অন্যকে সেই পদ্ধতিতে প্রভাবিত করে স্বমতে আনার জন্যে আচার্য শিবনাথের ভাষায় তাদের intellectual assent-এর ওপর নির্ভর করেন নি ? স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পর্যালোচিত বৃত্তান্ত' শীর্ষক পুস্তিকার ৬-৭ পৃষ্ঠায় রামমোহনের 'যুক্তির কিরণ'-এর বিষয়ে উল্লেখ করে, তার অষ্টম পৃষ্ঠায় আমরা তাঁকে বলতে শুনি : "রামমোহন রায়ের যুক্তি সমুদ্ভূত তর্কশাস্ত্র জালে চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার রূপ বৃক্ষ সকল ছিন্নভিন্ন হইলে, ব্রাহ্মসমাজের পত্তনভূমি দীপ্তি পাইল।"৮২ আমাদের জ্ঞানে শুধু 'দীপ্তি পাইল' নয়, আদৌ প্রতিষ্ঠিত হলো।

সে যাই হোক্, স্বয়ং শিবনাথও তাঁর উক্ত ইতিহাস গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় চন্দ্রশেখর দেবের বেনামে প্রকাশিত, কিন্তু রামমোহনের রচিত 'The answer of a Hindui' why do you frequent a unitarian place of worship instead of the memerously attended churches' পুস্তিকা থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে রামমোহনের মত ও পথের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন :

Because I feel already weary of the doctrine of man-god or god-man frequently inculcated by the Brahmans in pursuance of their corrupt traditions : the same doctrine of man-god though preached by another body of priests, better dressed, better provided for, and eminently elevated by virtue of conquest cannot effectually tend to excite my interest".

অন্বয়ার্থ : কারণ ব্রাহ্মণরা তাদের অপকৃষ্ট ঐতিহ্য অনুসরণ করে যে দেবের বা দেবমানবের তত্ত্ব প্রায়শই পোষণ করেন তার দ্বারা আমি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত ; ফলে সেই একই তত্ত্ব যখন আর একদল পুরোহিতবর্গ [যাঁরা] আরো সুবেশে সুসজ্জিত, স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট এবং রাজ্যজয়ের কল্যাণে উর্ধ্বে অবস্থিত তাঁদের দ্বারা প্রচারিত হয়, তখন তা আমার মনে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করতে পারে না।

এই উক্তি 'negative dissent' ছাড়া কি ? রামমোহন আরো বলেন, "because the unitarians believe profess and inculcate the doctrine of divinety unity, a doctrine which I find firmly maintained both by the christian scriptures and by our most ancient scriptures called the Vedas' যার অর্থ : কারণ একত্ববাদীরা ঈশ্বরের একত্বের তত্ত্ব বিশ্বাস করেন, তা প্রচার করেন ও পোষণ করেন, যে মত খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র এবং আমাদের

সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বেদ উদ্ধৃত দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে বলে আমি দেখতে পাই।

এই উক্তিও যুক্তির সমর্থন বা intellectual assent ছাড়া আর কি? তাছাড়া কেবলমাত্র আত্মানুভূতির উপর নির্ভর করলে, কোনো protestant ধর্ম সম্প্রদায় দাঁড়ায় কি? Dissent বা মতানৈক্য ব্যতীত মানুষ প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদী হয় না, আবার ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অর্থাৎ divine authority কার্যত church-এর কর্তৃত্ব স্বীকার না করলে কোনো ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ও স্থায়ী হয় না। সমস্ত Protestantism-এর মূলে এই স্ব-বিরোধ। ফলে এর মধ্য থেকে একের পর এক denomination বা ধর্মশাখার উদ্ভব হয় অনিবার্য। ব্রাহ্মসমাজে এর ফল কি হয়, আমরা পরে দেখব।

ব্রাহ্মসমাজকে একটি সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের আকার দান যে দেবেন্দ্রনাথের কীর্তি, রামমোহনের নয়, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৮৫০-এ প্রকাশিত ব্রাহ্ম-অঙ্গীকার পত্র এবং তপ্তর ধারার এর বীজ পাওয়া। (শিবনাথ তাঁর ইতিহাসে এই অঙ্গীকার পত্রকে Tha Brahmo covenant বলে উল্লেখ করেছেন)। এতে উল্লেখ করা হয় যে, যারা ব্রাহ্ম হবেন, অর্থাৎ পরমপুরুষ ব্যতীত মনুষ্যসৃষ্ট কোনো প্রতীকের উপাসনা করবেন না, তারা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বা কার্যসাধনের জন্য প্রতি বৎসর কিছু অর্থ সাহায্য করবেন।

১৮৫০-এ প্রকাশিত ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের বিকাশে একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের মতে, "এপর্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিল না; তাহাদিগের ধর্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল; এখন ইহা একত্র সংক্ষিপ্ত হইল।"৮৩ গ্রন্থটি সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগলের উক্তি প্রামাণিক বেদ ও ইহার শিরোভাগ উপনিষদ হইতে আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ উদ্ধার করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলন করেন"।৮৪ এখানে আমরা ধর্মের উৎস রূপে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়ের সাক্ষাৎ পাই। (১) বেদ ও উপনিষদ। (২) দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তত্ত্ব।

এখানে যা উল্লেখ্য তা এই যে, তাঁর এই ধর্ম বিষয়ক আত্ম-প্রত্যয় সম্পূর্ণত তাঁর আত্মজাত নয়—অনেকাংশেই অক্ষয়কুমার দত্তের প্রেরণাজাত। আত্মজীবনীর দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের একটি বিবরণ পরবর্তী কালের জন্যে রেখে গেছেন। 'বেদে যেমন ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি হইতে পারে না, উপনিষদেও তেমনি হইতে পারে না। জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্ম-

ধর্মের পত্তনভূমি'৮৩ এই সিদ্ধান্তে তিনি কি ভাবে উপনীত হলেন তার আংশিক পরিচয় তাঁর আত্মজীবনীতে প্রদত্ত বিবরণ থেকে আমরা পাই।

কিন্তু আচার্য শিবনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ঐতিহাসিকই একথা স্বীকার করেন যে, অক্ষয়কুমার দত্তই ব্রাহ্মসমাজকে 'বেদশৃঙ্খল' থেকে মুক্তি দেন। শিবনাথ উল্লেখ করেন :

দেখা যায় যে, ১৮৪৫-এ বেদকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মের ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সমাজের ধর্মকে বৈদান্তিকতা বলে তুলে ধরা হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বাদানুবাদের ফল হিসেবে [তত্ত্ববোধিনী] পত্রিকার পৃষ্ঠায় বেদের অভ্রান্ততার (infallibility) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে [তত্ত্ববোধিনী] পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি বেদের অভ্রান্ততা প্রচারে ব্যবহৃত হলেও এর সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এই সময়ে এই নতুন পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি ; কারণ তাঁর যুক্তিবাদী প্রকৃতি এই মতবাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। তিনি বিষয়টি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা শুরু করলেন। এটাও দেখা গেল যে, যেদিন থেকে বেদের অভ্রান্ততার মত প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলো, সেদিন থেকে সমাজের সভ্যদের মধ্য থেকে একটি বিরোধী মত জেগেছে। এই বিরোধী মত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় চিঠিপত্রের আকারে প্রকাশ পেল, কিন্তু অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষিত হতে লাগল। সত্যই ১৮৪৬ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে সর্বতোভাবে এক কষ্টের সময় (trying time) গিয়েছে।৮৬

বস্তুত অক্ষয় দত্তের প্রভাবে 'বেদ-শৃঙ্খল' থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি খুব সুখী হতে পারেন নি বলেই মনে হয়। আত্মজীবনীতে তিনি বলেন এই উপনিষদ হইতে প্রথম আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না ইহাতেই আমার দুঃখ।৮৭

যদিও সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন নিজের উদ্দেশ্যেই নিজে বলেছেন : "কিন্তু এ দুঃখ কোনো কার্যের নহে যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না ; খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।৮৮ তবু এইসব উক্তির মধ্য থেকে তাঁর অন্তরের প্রবণতা আদৌ অস্পষ্ট থাকে না। তিনি চাইছিলেন অমোঘ ঈশ্বরবাদের উপর নির্ভর করতে, তার ভিত্তিতে

ধর্ম এবং সেই ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ সম্প্রদায় গঠন করতে। আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে বা বিচারমূলক সত্যের সন্ধান করতে নয়। তাই তাঁর সান্ত্বনা হয়ে রইল : "যেরূপ কর্তৃকর্ম অগ্রশাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম ? আমার হৃদয় তাহার সাক্ষী রইল "।৮৯

ধর্মসম্প্রদায় গঠনের পথে জীবনের ধারা অনুসরণ করলে, আমরা দেখতে পাই যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রাচীন প্রথাবদ্ধ সমাজের সমান্তরাল একটি সাম্প্রদায়িক-সামাজিক কাঠামো গঠন করতে হয়। এটি enlightenment বা বুদ্ধির মুক্তির দ্যোতক নয়—বরং তার পরিপন্থী। ১৮৬৬-তে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ বিচ্ছেদের অল্পকালপূর্বে ১৮৬৬-র শেষে বা ১৮৬৭-র শুরুতে প্রকাশিত তাঁর অনুষ্ঠান পদ্ধতি নামে এই নতুন প্রথাবদ্ধ সমাজ-কাঠামোর অবয়ব উদ্ঘাটিত করে। (প্রাগুক্ত টীকা নং ৫৭ দেখুন) এবং অন্তর্ভুক্ত জাতকর্ম, বিবাহ ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধব্যবস্থা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের ritual পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে তার যোগসংযোগই প্রতিপন্ন করে।

দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মজীবনের একটা প্রাথমিক পরিচয় আমরা নিয়েছি। পরিশেষে এর একটা সারসংকলনের প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি যুগবিভাগ স্পষ্ট হয়। (১) ১৮৩৯-৫৯ বা তত্ত্ববোধিনীর যুগ। এর শেষে বিশেষত ১৮৫৬ থেকে এই যুগের যুগান্ত লক্ষণ গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আমরা তা দেখেছি। (২) ১৮৫৯-৬৬ তত্ত্ববোধিনীর অবলুপ্তি ও কেশবচন্দ্র সেনের সক্রিয় নেতৃত্বের যুগ। এটিকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের যুগও বলা যায়। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ১৮৬৬-তে প্রকাশ্য বিচ্ছেদের পর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নতুন একটি পর্ব শুরু হয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটি তাঁর কর্ম জীবনের অন্ত সূচনা করে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের ধারা অনুশীলনে এই কালের আলোচনাও প্রয়োজন কিন্তু কর্মজীবনের বিচারে এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর। হয়তো বা কিছুটা নঞর্থক।

বর্তমান আলোচনায় আমরা মূলত রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমাদের বিচার সীমাবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মত বিবর্তনের ইতিহাসে অক্ষয় দত্তের উপস্থিতি অনিবার্য এবং তার পরিণামে কেশবচন্দ্র সেনের উল্লেখও অনিবার্যনীয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই দুই ব্যক্তির ধর্মচিন্তার পরিচয় নিয়ে, অক্ষয় দত্তের ধর্মমতের বিস্তৃততর আলোচনার দ্বারা উনিশ শতকের বাংলার ধর্মান্দোলন

ও অক্ষয় দত্তের স্থান সম্পর্কিত আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করার আশা রাখি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত]

টীকা

৩৫। দ্রষ্টব্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সপ্তম কল্প ১ম ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক ২৯২ সংখ্যা পৃ ১৫৫-১৫৭ অভিনন্দন পত্র : ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য মহাশয়ের শ্রীচরণেষু। (কেশব-চন্দ্র সেন কর্তৃক প্রদত্ত)। এবং পৃ ১৫৭-১৬০ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যাভিনন্দন পত্র।

উক্ত প্রত্যাভিনন্দন পত্রে উল্লেখিত হয় যে, "প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই এই অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়ন পথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্যভাবে আমার সমুদয় মন সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, সেই মুহূর্তে জ্ঞান নেত্র বিকশিত হইল।...সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপর আমার নয়ন যুগল উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের রচনা নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। (তত্ত্ববোধিনী, ঐ পৃ ১৫৮)। লক্ষনীয় যে, তাঁর জীবনের প্রথমে তিনি বস্তুজগতকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা অনন্তের ভাবে উপনীত হন।

উপরে উদ্ধৃত বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ শ্রীভবসিন্ধু দত্তের "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত" মাঘ ১৩২১ বঙ্গাব্দ পৃ ৩২৮-৩৩০ থেকে আত্মজীবনী (দ চ) গ্রন্থে ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। মহর্ষির স্বচরিত আত্মজীবনীতে এর কোনো উল্লেখ নেই।

৩৬। আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা, ১৯৬২ পৃ ৩-৫ পিতামহীর মৃত্যুর পূর্বদিন

রাত্রে গঙ্গাতীরে তাঁর বিষাদ ও আনন্দের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বিশেষত পৃ ৫ স্থানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না।...তাহা স্বাভাবিক আনন্দ, তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ।

এই গ্রন্থ অতঃপর আত্মজীবনী (আ চ) রূপে উল্লেখিত এবং শিবনাথ শাস্ত্রী History of the Brahmo Samaj, Calcutta, 1919 অতঃপর HBS রূপে উল্লেখিত।

৫৭। শি. শাস্ত্রী : HBS Appendix B পৃ ৩২০।

৫৮। অনুষ্ঠান পদ্ধতি : যোগেশচন্দ্র বাগলের বিবরণ অনুযায়ী এর বিষয় সূচী নিম্নরূপ 'জাতকর্ম নামকরণোপায়, দীক্ষা, বিবাহেত্তেষ্টিশ্রাদ্ধেতি সপ্তবিধ সংস্কারাত্মিকা।' তত্ত্ববোধিনী কালগুন ১৭৮৬ শক (১৮৬৫ মার্চ এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে যে রূপে ব্রাহ্মদিগের গৃহধর্ম সকল অনুষ্ঠিত হয় তাহার আদর্শ বিবৃত আছে। বর্তমান লেখকে সংগ্রহে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ আছে (কলিকাতা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বৈশাখ ১৮০৯ শক [১৯১৭ মার্চ-এপ্রিল]) তার বিষয়সূচী নিম্নরূপ : (১) সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা (২) জাতকর্ম (৩) নামকরণ (৪) উপনয়ন (৫) দীক্ষা (৬) বিবাহ ব্যবস্থা (৭) বিবাহ (৮) উদ্বাহকর্ম (৯) অন্ত্যেষ্টি (১০) শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা (১১) পিতা ও মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ (১২) মাসিক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা (১৩) গৃহ প্রতিষ্ঠা। মনে হয় প্রথম প্রকাশের পর ব্রহ্মোপাসনা অংশটি ব্রাহ্ম সাধারণের সুবিধার্থে অনুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়। অনুমানের কারণ এই যে, বর্তমান লেখক উপরোক্ত গ্রন্থের অন্য কোনো সংস্করণ দেখার সুযোগ পান নি।

৫৯। অর্থনৈতিক ভাঙন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে

(i) M. N. Gupta : *Land system of Bengal*

Calcutta University, 1940

পৃ ৮২-৯০ : ১৭৬০-৬৫ সালের পরিস্থিতি

১১৭-১২৪ ; ১৭৬৫-৮৪ ঐ

১৩১-২০২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

(ii) F. D. Ascoli *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report, 1812.* Oxford, Clarendon Press, 1017 পৃ ১২০-১৩৮।

(iii) N. K. Sinha *Economic History of Bengal, Vol. II.* Calcutta, 1962 K .L. Mukhopadya chs 2 to 8 পৃ ২৩-২১৪

(iv) K. K. Dutta, *Survey of India, Social Life and Economic Constitution in the 18th Century*, Calcutta K. L. Mukhopadhya, 1961 বিশেষত ch 4 এবং অবশ্যই রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India*, ১ম খণ্ড। এবং W. H. Hunter, *Annals of Rural Bengal*, London 1868.

৫৯। শিল্প অর্থনীতির ভাঙনের জন্যে দ্রষ্টব্য অবশ্যই রমেশচন্দ্র দত্ত এবং N. K. Sinha *Economic History of India*, Vol. I, Calcutta, 3rd ed, 1965.

W. W. Hunter প্রাগুক্ত

K. K. Dutta প্রাগুক্ত এবং উক্ত গ্রন্থের ch. 5

J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal.* London M'omillan 1927 কৃষি অর্থনীতির বিষয়েও গ্রন্থটি মূল্যবান।

B. R. Ambedkar, *The Evolution of Provincial Finance in British India.*, London (King & Sons Ltd.) 1925 সর্বোপরি Karl Marx writing On Colnialism (Moscow, 1920) বর্তমান রচনায় অর্থনৈতিক ইতিহাসের তথ্যাবলী উপরোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে গৃহীত। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া এই প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র টীকা সন্নিহিত হয়নি।

৬০। N. K. Sinha প্রাগুক্ত vol. II, পৃ. ১০৪।

৬১। তপনমোহন রায়চৌধুরী Calcutta (Frma K. L. Mukhopadhya)

৬২। K. K. Dutta প্রাগুক্ত।

৬৩। K. K. Dutta, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৫

After his restoration to the Masnad of Bengal Mir Jafar concluded treaty with the English article III of which provided that the English shall Carry on their trade by means of their own Dustucks (passpart) free from all duties taxes and impositions in all parts of the country ইত্যাদি।

৬৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিত মালার অন্তর্ভুক্ত 'রামমোহন রায়' শীর্ষক পুস্তিকা, পৃ. ২৪।

৬৫। অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য, বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, কলিকাতা। প্রবর্তক সংঘ। ১৯৬৪। পৃ. ৩৪-৩৫।

৬৬। অসিতকুমার ভট্টাচার্য প্রাগুক্ত।

৬৭। *The English works of Raja Rammohan Ray* Part III ed., by Dr. Kalidas Nag & Debajyoti Burman, Sadharan Brahmo Somaj. Calcutta 1947.

৬৮। W. W. Rostow, *British Economy of the Nineteenth Century*, Oxford, 1948 (Reprinted, 1968,) পৃ. ৩৩, Table II এবং পৃ. ৪৮ প্রবন্ধ পাদটিকা।

৬৯। *Speeches of Ramgopal Ghosh*, published by C. C. Mitra, Calcutta তারিখ নেই বিশেষত 31 Oct. 1849 ও 21 Nov. 1849 এ রামগোপাল ঘোষ প্রদত্ত Remarks on the Black Acts। কোলকাতার য়ুরোপীয়দের প্রতিবাদ সভা হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪৯।

৭০। যোগেশচন্দ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ৬১-৬২ : সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৩য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর শুধু বাগলরূপে উল্লেখিত।

৭১। আত্মজীবনী (স চ) ১৪শ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৬।

৭২। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান। আদি সমাজের উপাসনা কালীন বেদী হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়।

প্রথম প্রকরণ ১৭৮২ শকের [১৮৬০] ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের [১৮৬১] ১৭ জৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক চতুর্থবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৮০৭ শক [১৮৮৫]।

৭৩। বাগল ; পৃ. ৬২-৬৩।

৭৪। B. B. Majumdar *Indian Political Associations and Reform of Legislature* (1818-1917) Calcutta (Firma K. L. Mukhopadhyay) 1965 পৃ ৩৮ ও পৃ ৩৯ পাদটিকা।

৭৫। বাগল। পৃ ৬৩।

৭৬। বাগল। পৃ ৫০।

The Society to be Composed of member of all classes of the subjects of the empire without any distinction of Caste Creed or Colour.

৭৭। বাগল। পৃ ৬৪।

৭৮। রাজনারায়ণ বসু, প্রবাসী ১৩০৪ পৌষ।

৭৯। ঐ ৭৮নং টিকার অনুরূপ।

৮০। আত্মজীবনী (স চ) পৃ ৩৬-৩৭।

৮১। শিবনাথ শাস্ত্রী। *HBS* পৃ ২০১ (বঙ্গানুবাদ আমার)।

৮২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। পুনর্মুদ্রণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতা ১৩১০ (১৯৬৭)।

"শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) মহাশয় কর্ত্তৃক কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে ব্রাহ্ম বন্ধু সভাতে ১৭৮৬ শকের ২৬শে বৈশাখ (১৮৬৪-তে) শনিবার বিবৃত হয়।"

৮৩। আত্মজীবনী (স চ) চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ ১৪০।

৮৪। বাগল : পৃ ২৮।

৮৫। আত্মজীবনী (স চ) ষাড়িংশ পরিচ্ছেদের বিষয়সূচী। পৃ ১১।

৮৬। শিবনাথ শাস্ত্রী : *HBS* পৃ ৯৯-১০০।

৮৭। আত্মজীবনী (স চ)। পৃ ১৩৬।

৮৮। প্রাগুক্ত ৮৭ নং টিকার অনুরূপ।

৮৯। প্রাগুক্ত ৮৭ ও ৮৮ নং টীকার অনুরূপ।

বাংলার নবজাগরণ ঃ কয়েকটি প্রশ্ন

অমলেন্দু দে

(২) বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা প্রায় সবাই হিন্দু সমাজের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য বিষয় সীমাবদ্ধ রাখেন। তার মধ্যে আবার কলকাতার হিন্দু বা ব্রাহ্ম নেতাদের ওপরই তাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। অবশ্য প্রসঙ্গত তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকাও উল্লেখ করেন। এখনও এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জনসমষ্টির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ততটা প্রসারিত হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে তো কেবলমাত্র হিন্দুরাই বাসিন্দা নন। এখানে জনসমষ্টির এক বড় অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় তাঁদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত দুএকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের সাহায্য ছাড়াই এমন সব মন্তব্য করা হয়, তা যে কোন সচেতন পাঠককেই আহত করবে। দুএকজন গবেষক এমন কথাও বলেন, বাংলা দেশে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিশেষ কোন অবদান নেই। দীর্ঘকাল ব্যাপী যে ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চলে, যার প্রভাব মুসলিম সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে ও ক্রমান্বয়ে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পড়ে, তাকে অগ্রাহ্য করা সঙ্গত, তা তাঁরা ভেবে দেখেন না। হিন্দু সমাজের ধর্ম-সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও যে ধর্মসমাজ সংস্কারের আন্দোলন ছিল, সে কথা তাঁরা ভুলে যান। তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় না : মুসলিম সমাজের ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি? গ্রাম বাংলায় এর প্রভাব কতটুকু পড়ে? একেশ্বরবাদ ও ইসলামের বিশুদ্ধতা প্রচারের বিষয়টি হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম-সমাজ সংস্কারকদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাঁরা একথাও ভেবে দেখেন না, হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ

অসাধুতা ছিল, আর ফরাজী ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে এই মনোভাব অনেকটা দূরীভূত হয়। তাই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আলোচনায় এমন বাংলার মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিষয় উল্লেখ করলে বাঙালী মানসের ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিষয়ের প্রতি কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তেমনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙালী মুসলমানেরা কেন দূরত্ব বজায় রাখেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে এমন বাংলায় মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই দিক থেকে বিষয়টি কাউকে আলোচনা করতে দেখিনি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার দুজন প্রখ্যাত ফরাজী নেতা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। তাঁদের নাম হল মৌলবী কফিল আল-দীন ও খান বাহাদুর সৈয়দ আল-দীন। তাঁরা দুজনেই ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গভঙ্গ সমর্থনে জনমত গঠন করেন। এই দুজন ফরাজী নেতা ফরিদপুরের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা অম্বিকা চরণ মজুমদারের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন। স্বভাবতই ফরাজী আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ না করলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের ছবি স্পষ্ট হয় না। ১

পশ্চিমবঙ্গের যে দুএকজন গবেষক ফরাজী-ওয়াহাবিদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা এইসব আন্দোলনের সময়কাল সম্পর্কেও কোন স্বচ্ছ ধারণা পাঠককে দেননি। তাই ফরাজী ওয়াহাবি আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর উল্লেখ করা প্রয়োজন। (ক) ফরাজী আন্দোলনের সময়কাল : (১) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ (২) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ—ধর্মীয় গ্রুপরূপে ফরাজীদের অস্তিত্ব ফরিদপুর জেলায় ছিল।

(খ) ওয়াহাবি আন্দোলনের সময়কাল : (১) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়ে বাংলাদেশে তিতুমীরের ভূমিকা লক্ষণীয়। তিতুমীর আন্দোলন সুরু করেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৩১ তাঁর আন্দোলন দমিত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক শিখ রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদও নিহত হন। (২) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ—ইংরেজের দ্বারা পাঞ্জাব দখল পর্যন্ত ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের শিখ বিরোধী ভূমিকা ছিল। (৩) ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়ে ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্রিটিশ

বিরোধী চরিত্র প্রধান বিষয় ছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবিদের প্রভাব দমিত হয়।

(গ) বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ : (১) ফরাজী আন্দোলন, (২) পাটনা স্কুল, (৩) তাঐউনি আন্দোলন, (৪) আহ্‌-লই-হাদিস। এই চারটি ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে ধর্মীয় আচরণ বিধি নিয়ে বিতর্ক চলে।

সুতরাং বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আলোচনা করতে হলে উপরে উল্লিখিত প্রধান প্রধান স্তরগুলো মনে রাখা দরকার। তা না হলে এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝা কষ্টকর হবে।

ফরাজী আন্দোলনের নেতা ছিলেন পূর্ববঙ্গের বাদারীপুর মহকুমার হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০খ্রী) নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি কলকাতাতে ও হুগলি জেলার ফুরফুরাতে শিক্ষালাভের পরে মক্কা ও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে বাংলা দেশে ফিরে এসে বাদারীপুর মহকুমায় ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। বাংলার গ্রামাঞ্চলে ও আসামে মুসলিম সমাজে ও ধর্মে যে সব দুর্নীতি ও অ-ইসলামীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা দূর করে দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম যুক্ত হওয়ায় ফরাজী আন্দোলন ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের এক মিশ্রিত রূপ ধারণ করে।২

তারিকা-ই-মহম্মদীয়া বা ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন রায় বেরিলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রী)। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিতে তারিকা-ই-মহম্মদীয়া (বা 'মহম্মদের পথ') নামক ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই তারিকা-ই মহম্মদীয়া আন্দোলনই ওয়াহাবি আন্দোলন নামে খ্যাত।৩ সৈয়দ আহমদের শিষ্য তিতুমীর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।৪

মুসলমান কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনে যোগ-দান করে। কোন অর্থবান বা শহরবাসী মুসলমান এই সব আন্দোলনে যোগ দেয় নি। তাছাড়া হিন্দু, গোঁড়া মুসলিম ও ইউরোপীয় নীলকরেরা তাদের ওপর অসন্তুষ্ট

ছিল। জমিদার, ইউরোপীয় নীলকর ও সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। ফরাজী প্রভাবিত অঞ্চলে একটি পৃথক শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করে ফরাজী নেতারা তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কোন মামলা ইংরেজ আদালতে নিয়ে যাওয়া কঠিকর ছিল। জমিদার নীলকর-সরকার বিরোধী উপাদান থাকায় ব্রিটিশ সরকার এই সব আন্দোলন সম্পর্কে খুবই বিব্রত ছিল এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে এই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হয়।৫ তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলন এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, ব্রিটিশ সরকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে এই আন্দোলন দমন করে। এই ধরণের একটি সংঘর্ষেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯নভেম্বর তিতুমীরের মৃত্যু হয়।৬ একই সময়ে সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সামরিক শিবির থেকে শিখদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' পরিচালনা করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি নিহত হন।৭

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিখদের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত হয়। কিন্তু ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাব দখলের পরে ওয়াহাবিদের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং একটানা দীর্ঘকাল চলে। ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সীতানা শিবির থেকে সুদূর বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ওয়াহাবিরা একটি সামরিক রাজনৈতিক কমিটির স্থাপন করে এবং এই কমিটির নির্দেশেই অর্থ ও মুজাহিদ সীতানা শিবিরে প্রেরণা করা হয়। এমনকি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র ছিল। অর্থাৎ ওয়াহাবি আন্দোলন এক সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে।৮

উপরে বর্ণিত সর্বভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের সামরিক-রাজনৈতিক রূপ মনে রাখলে বাংলাদেশে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের ভূমিকা বিশ্লেষণ সহজ হবে। পাটনা স্কুলের নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমদের শিষ্য বেলায়েত আলি ও এনায়েত আলি। ১৮৩১ অথবা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এনায়েত আলি বাংলাদেশে এসে ওয়াহাবি সমর্থকদের সংগঠিত করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এনায়েত আলি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করে ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার করেন। সুতরাং সীতানা ক্যাম্পের সঙ্গে সুদূর বাংলাদেশের

গ্রামাঞ্চলের যোগসূত্র কেন বজায় ছিল, তার প্রকৃত উত্তর পেতে হলে পাটনা স্কুলের নেতা এনায়েত আলি প্রচারিত তারিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের প্রভাব মনে রাখা দরকার।৯

সৈয়দ আহমদের শিষ্য জৌনপুরের কেরামত আলি (১৮০০-১৮৭৩ খ্রী) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন সুরু করেন। এই আন্দোলনকে তাঐউনি (Ta'aiyuni) আন্দোলন বলে। শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে তিনি যে মত প্রচার করেন তার সঙ্গে কোন কোন ধর্মীয় আচরণ-বিধি সম্পর্কে ফরাজী ও ওয়াহাবিদের(পাটনা স্কুল) মত-পার্থক্য ছিল। আবার ফরাজীদের সঙ্গে ওয়াহাবিদেরও কয়েকটি বিষয়ে মত পার্থক্য ছিল।১০ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাটনা স্কুলের একটি অংশ বেরিয়ে আসে এবং 'প্রফেটিক ট্রাডিশন' অনুসরণ করে আহল-ই-হাদিস নামে এক ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন সুরু করে। কিন্তু এই স্কুলের চিন্তাধারা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এক গণ আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পারেনি। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রুপের সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।১১

সুতরাং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাংলাদেশে চারটি ধর্মীয় গ্রুপ সক্রিয় ছিল এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিতর্ক বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত চলে।১২ এর মধ্যে তিনটি গ্রুপের (যথা-ফরাজী আন্দোলন, পাটনা স্কুল ও তাঐউনি আন্দোলন) বিভিন্ন বেলায় ব্যাপক গণভিত্তি ছিল। তাদের মধ্যে ফরাজী ও পাটনা স্কুল পরিচালিত ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। অবশ্য পাটনা স্কুল পরিচালিত আন্দোলনই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধী ওয়াহাবি আন্দোলনরূপে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এবং তারাই দীর্ঘকাল ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে ব্রিটিশ শাসনকে বিব্রত করে। কিন্তু কেরামত আলি বাংলাদেশে যখন তাঐউনি আন্দোলন পরিচালনা করেন, তখন তিনি ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক মনোভাব যুক্ত করেননি। তিনি ফরাজী ও ওয়াহাবিদের মত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে 'দারুল হরবত' (শত্রুর দেশ) মনে করেননি। অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নিয়েই তিনি ইসলামের বিশুদ্ধতা

রক্ষার্থে সচেষ্ট হন এবং বাঙালী মুসলমানকে খাঁটি মুসলমানে পরিণত করার চেষ্টা করেন।১৩ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলা দেশে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন কেরামত আলি। তিনি একজন সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর একটানা নৌকায় করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর খবর পেলেই দলে দলে মুসলমান তাঁর কথা শুনতে আসতো। তাই তাঁর নৌকা ছিল যেন 'ভাসমান কলেজ'। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে রংপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাংলা দেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে তাঁর শিষ্যরা রংপুরে এসেছিলেন। এই একটি ঘটনা থেকেই তাঁর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।১৪ কেরামত আলির মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মৌলবী হাফিজ আহমদ (তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) তারিউনি আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তারপরে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মহম্মদ মহসীন।১৫ কেরামত আলির সব রচনাই উর্দুভাষায়। এখন পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, তিনি ৪১ খানা গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মুসলমানদের বিষয়ে আলোচনা করতে হলে কেরামত আলির রচনাসমূহ একান্ত অপরিহার্য। তা না হলে মুসলিম সমাজে ধর্ম-সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের মূল ধারাটি বোঝা কষ্টকর হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এখনও এদিকে আকৃষ্ট হয়নি।১৬

এবার ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি আন্দোলন ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতাকে পরিপুষ্ট করে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এইসব আন্দোলনের বড় অবদান হল মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন করা। সরকারী সূত্র থেকে জানা যায়, এই সব আন্দোলনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মুসলমান বিধবার সংখ্যা হ্রাস পেতে সুরু করে এবং সমাজ জীবনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।১৭ অন্যদিকে ফরাজী ও ওয়াহাবিদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে শ্রেণী সংঘাতের উপাদান পাওয়া যায়। আর রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। তাদের মধ্যে ওয়াহাবিদের কর্মসূচীতে প্রথমে শিখ বিরোধী, পরে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলনরূপে সুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যে তা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।১৮ অবশ্য প্রথম দিকে এই আন্দোলনে ধর্মান্ধতার উপকরণ পাওয়া যায়।

জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাজী ও ওয়াহাবিরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গো হত্যা করে, হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করে ও হিন্দু গ্রাম লুট করে, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মূলত: হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হলেও তাদের এই সব আচরণে সাধারণ হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাব খুবই আহত হয় এবং তারা খুবই শঙ্কিত হয়। হিন্দুদের মনে এই আন্দোলন কি গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে তার এক বিবরণ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' নামক কাগজে প্রকাশিত পত্রে পাওয়া যায়।১৯

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, জমিদারদের নির্যাতনের ফলেই ফরাজী ও তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্ভব। তাই হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু এইসব আন্দোলনের যে কয়টি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের দাবি ছিল, তা মুসলমান জমিদারদের পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল না। সুতরাং মুসলমান জমিদারেরা এই সব দাবি মেনে নেওয়ায় তাঁদের ঠিক হিন্দু জমিদারদের মত ধর্মীয় বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয়নি। অপ্রকাশিত সরকারী দলিল থেকে জানা যায়, মুসলমান জমিদারেরা ফরাজীদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ফরাজীদের বিরোধ চলে এবং মামলা-মোকদ্দমাও হয়।২০ অন্যদিকে হিন্দু জমিদারেরা ধর্মীয় কারণে যেমন প্রকাশ্যে গোহত্যা তাঁদের জমিদারিতে মেনে নিতে পারেননি, তেমনি নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের পক্ষে ফরাজী-ওয়াহাবিদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া এবং সাংগঠনিক অধিকার মেনে নেওয়াও কষ্টকর ছিল। স্বভাবতই হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে ফরাজী-ওয়াহাবিদের বিরোধের মীমাংসা হয়নি। উপরন্তু হিন্দু জমিদারেরা ইউরোপীয় নীলকর ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ফরাজী-ওয়াহাবিদের প্রভাব নষ্ট করতে সচেষ্ট হন। এই কারণেই হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে ফরাজী-ওয়াহাবিদের বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ফরাজী ওয়াহাবিদের কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে।২১ কিন্তু এই সংঘর্ষ মূলত: হিন্দু জমিদারদের এলাকাতে জমিদারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দু গোমস্তা- পেয়াদা বা স্থানীয় কিছু সংখ্যক অধিবাসীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী নয় অথবা জমিদারদের বাসস্থানের সংলগ্ন এলাকার নয় এমন কোন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীরা কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোন তথ্য সরকারী বা বে-সরকারী সূত্র থেকে পাওয়া কষ্টকর। মোটকথা, কোন তথ্য থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যায়

না, ফরাজী-ওয়াহাবিরা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সময় সাম্প্রদায়িক মনোভাব বজ্র করলেও, জমিদারী প্রথার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই এমন ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছে। এমনকি 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পত্রখানি ভালো করে পাঠ করলেও, আর শরীয়ত উল্লাহ, দুদু মিঞা ও নোয়া মিঞা পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন এবং তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবি আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকেও এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়।২২

'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত তথ্য স্বীকার করেও কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে ফরাজী প্রভাবিত অঞ্চলে অথবা অন্যত্র প্রকাশিত কাগজপত্রে এই ধরণের আর কোন তথ্য পাওয়া যায় কি? ফরাজীদের অত্যাচারের ফলে হিন্দুরা দলে দলে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি? এই বিষয়ে কোন সরকারী তথ্য আছে কি? এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করলেই 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত তথ্যের ওপর আরও আলোকপাত করা যায়। প্রথমত: এই সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে হিন্দু জমিদারদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। মফস্বল বা শহরাঞ্চলে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। জমিদারেরা স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে সক্রিয় করে ফরাজী-ওয়াহাবিদের প্রভাব দমন করতে চেষ্টা করেন। এমনকি জমিদারেরা প্রয়োজন মত হিন্দুদের মধ্যে ফরাজী-ওয়াহাবি সম্পর্কে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে হিন্দুদের সহায়তালাভে সচেষ্ট হন। এই রকম প্রচেষ্টা যে জমিদারদের পক্ষ থেকে হয় তার নজির পাওয়া যায়।২৩ দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ফরাজী ওয়াহাবি প্রভাবিত অঞ্চলে কয়েকটি ঘটনায় হিন্দু জমিদারেরা বা কিছু পাতিশ্রিয় অধিবাসী সাময়িকভাবে তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেও দলে দলে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়নি।২৪ তৃতীয়ত: সরকারী সূত্রে ধর্মান্ধতার কথা বলা হলেও এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যবসিত হয় এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।২৫ ধর্মীয় স্তরকে প্রাতিস্বার করে এই আন্দোলন পরিচালনা করায়, ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারায় এবং নেতৃত্বের নানা দুর্বলতা থাকায় ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন জমিদার-নীলকর-সরকার বিরোধী হিন্দু-মুসলিম যুক্ত আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারেনি ঠিকই, তবুও কোনক্রমে এই আন্দোলনকে হিন্দুদের

বিরুদ্ধে পরিচালিত সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলা যায় না। মনে রাখা দরকার, যদি ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন পুরোপুরি হিন্দু বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক আন্দোলনই হত, তাহলে নীল বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান কৃষকদের অভূতপূর্ব ঐক্য গ্রাম বাংলায় আমরা দেখতে পেতাম না এবং দীর্ঘকালধরে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী কবিতর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না।২৬

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলন এক নতুন রূপ ধারণ করে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ওয়াহাবিরা শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিহার করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তখন থেকেই হিন্দুরা এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। লক্ষণীয় এই যে, এমন দক্ষতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় যে ওয়হাবিদের উদ্দেশ্য ইংরেজ বিতাড়ন করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হলেও কোথাও ওয়াহাবিদের সাথে হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়নি। হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁদের সহানুভূতি প্রদর্শন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই কারণে এই আন্দোলনের সময়ে কিছু সংখ্যক হিন্দুকেও গ্রেপ্তার করা হয়।২৭ লক্ষণীয় এই যে, ওয়াহাবিরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজের বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওয়াহাবি আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায়।২৮

৩। জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি রচনায় কৃষক বিদ্রোহের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিচালিত উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ গ্রাম বাংলায় এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। কলকাতা শহরের হিন্দু নেতৃবৃন্দকে নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও এই কৃষক বিদ্রোহগুলি নিয়ে এখনও তেমন কিছু আলোচনা হয়নি। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পুস্তক থেকে ছাত্ররা উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত হিন্দু নায়কদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারেন। অন্ততঃ নামগুলির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হন। আর যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা অথবা জাতীয় আন্দোলন পড়ানো হয় সেখানেও

প্রধানতঃ হিন্দু নেতৃত্বন্দ সম্পর্কেই আলোচনা নিবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পরেও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। স্বভাবতই এক পেশে ধারণা নিয়ে ছাত্রদের পড়তে থাকতে হয়। অথচ দীর্ঘকাল ধরে যে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ গোটা বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছে, আর যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কৃষক সমাজ করেছে এবং তাদের অসংখ্য আত্মত্যাগের কাহিনী ছড়িয়ে আছে, তার কথা ছাত্রদের নিকট অজানাই থেকে যায়। আমরা কি করে ভুলতে পারি যে, শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুদের অনেক আগেই কৃষকেরা ও উপজাতির লোকেরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিদ্রোহের পতাকা তারাই প্রথমে উড্ডীন করে। কারণ বিদেশী শাসন তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সময়েই বাণিজ্য পুঁজি স্তর (morchant capitalist stage) থেকে শিল্প পুঁজির স্তরে (industrial capitalist stage) ইংলণ্ডের উত্তরণ হয়। ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু দিকগুলি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপকরণ গুলি সবেমাত্র বিকশিত হতে শুরু করেছে। পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, কিন্তু কমোডিটি প্রডাকশনের (Commodity production) বিকাশ খুব ধীর মন্থর গতিতে হচ্ছে এবং জমিতে ও শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা সত্বের বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা দ্রুত বিকশিত হতে পারেনি। তাছাড়া সামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষ অনগ্রসর ছিল। আর ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এমন ক্ষয়িষ্ণু শাসকদের ওপর ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল। তাই পরস্পর বিবাদমান এইসব শাসকদের হাত থেকে ইংরেজরা সহজেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তারফলে নিজস্ব পথে ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজরা এমন নীতি অনুসরণ করে যার ফলে কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের উপকরণগুলি বজায় থাকে। যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে 'ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, (Indian Feudalism) নামে অভিহিত করা হয়। শুধু কৃষির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর অবস্থায় থাকে। ভারতের নিজস্ব শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় কারিগর ও কুটির শিল্পীরা বিপন্ন হয়। স্বভাবতই জমির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে থাকে। ভারতীয় বণিক ও কুসীদজীবী, যাদের হাতে টাকা ছিল, তারা জমিতেই তা লগ্নী করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক স্বার্থে

ভারতবর্ষে রেল লাইন স্থাপন করা হলে কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও তার সংখ্যা ছিল খুবই কম। অন্যদিকে এর ফলে ব্রিটিশ শাসন আরও সুদৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাঁচামাল বন্দর গুলিতে সহজে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।২৯

এই অবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে সমূলে বিনাশ করে ধনতান্ত্রিক উপাদান ব্যবস্থার পথকে দ্রুত প্রশস্ত করা এবং এক স্বাধীন-গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করাই ছিল ভারতবাসীর সামনে একমাত্র কর্মসূচী। কিন্তু ইংরেজ শাসনকে উৎখাত না করে তা করা কখনই সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই মনে আসে : কারা এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়? অনুন্নত ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপটি যদি আমাদের চোখের সামনে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাবো তিনটি ধারায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে এই জাতীয় চেতনা বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান ধারায় প্রবাহিত হয়। এই তিনটি ধারা হল : (১) কৃষক বিদ্রোহের ধারা, (২) রামমোহন থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিচালিত ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এবং উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা, ৩। মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ও আবদুল লতিফ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের ধারা।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহ ঘটে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩-১৮০০ খ্রী) ; মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬-১৭৮৩ খ্রী) ; তন্তুবায়গণের সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০ খ্রী) ; মালঙ্গীদের বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০৪খ্রী) ; রেশম চাষীর সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০০ খ্রী) ; আফিম চাষীদের প্রতিরোধ (১৭৮০-৯৩ খ্রী) ; রংপুর বিদ্রোহ (-১৭৮৩ খ্রী) ; যশোহর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪, ১৭৯৬ খ্রী) ; বীরভূমের গণবিদ্রোহ (১৭৮৩-৮৬ খ্রী) ; বীরভূম-বাঁকুড়ার পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১ খ্রী) ; বাখরগঞ্জের সুকাদিয়া বিদ্রোহ (১৭৯২ খ্রী) ; চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-৯৯ খ্রী)। উনবিংশ শতাব্দীর—মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬ খ্রী) ; ময়মনসিংহ পরগনায় কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২ খ্রী) ; সন্দীপের বিদ্রোহ (১৮১৯ খ্রী) : ময়মনসিংহের ধাঙী খেদা বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের পাগলাপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩, ১৮৩৭-৮২ খ্রী) ; ফরাজী আন্দোলন

(১৮১৮-১৯০৬খ্রী) ; ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮১৮-১৮৭০ খ্রী) ; সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬ খ্রী) নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০ খ্র) ; পাবনা-বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩ খ্রী) ; ইত্যাদি ।৩০ এই তালিকা থেকেই এই সব বিদ্রোহের ব্যাপকত্ব উপলব্ধি করা যায় ।

উপরে উল্লিখিত তিনটি ধারার মধ্যে কোন কোন ধারায় অগ্রসর পাশ্চাত্যের অথবা আরবী-ইরাণী তুর্কী সংস্কৃতির প্রভাব যেমন পড়ে, তেমনি ভারতীয় ইতিহাসের নিজস্ব জীবনধারার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় । সামন্তান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই তিনটি ধারার সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন সমূহে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের এক জটিল সংমিশ্রণ ঘটায় এই তিনটি ধারার মিলিত প্রবাহের পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় । এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সক্ষম এমন কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উদ্ভব তখন হয়নি । অবশ্য এই তিনটি ধারা পরস্পর মিলিত হয়ে প্রবাহিত হলে যে বেগের সঞ্চার করত তার ফলে সহজ-স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনন বিকশিত হত । আর তখনই সত্যিকারের বাঙালী রেনেসাঁর পরিচয় আমরা পেতাম । কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভবপর হয়নি । বিদেশী শাসনের ফলে সৃষ্ট ও তার ওপর নির্ভরশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে কৃষক বিদ্রোহগুলির নেতৃত্ব দেওয়া অথবা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না । কেবল মাত্র নীল বিদ্রোহের সময় আমরা দেখতে পাই এই তিনটি ধারা এক বিন্দুতে এসে মিলেছে । এই কারণেই নীল বিদ্রোহ বাঙালীর জাতীয় চেতনাকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করে । কিন্তু দুঃখের বিষয় নীল বিদ্রোহের উত্তাপ প্রশমিত হবার পরে এই তিনটি ধারা পুনরায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । আর কৃষকের সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুর ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় । তারফলেই বিংশ শতাব্দীতে স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কৃষকের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বপন করা সহজ হয় । উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু নেতাদের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে বিংশ শতাব্দীর কংগ্রেসের হিন্দুনেতৃবৃন্দ যদি বলিষ্ঠতার সঙ্গে কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারতেন তাহলে হয়তো আমাদের দেশের ইতিহাস ভিন্ন হত । যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের রূপ আমাদের ইতিহাস ও জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য থেকে আমরা কল্পনা করেছিলাম তা অপেন মহিমায় উজ্জ্বল থাকত ।৩১

সূত্র নির্দেশ

১। Muin-ud-Din Ahmad Khan, History of the Fara'idi Movement in Bengal (1818-1900) Karachi, 1965, pp 140-142.

২। Ibid, part II, Chapter III ; Jagadish Narayan Sarkar, Islam in Bengal (Thirteenth to Nineteenth Century), Calcutta, 1972, pp. 52-56.

৩। The Calcutta Review, vol LI, 1870 ; M. Husain. Origins of Indian Wahabism, in the Proceedings of the Indian History Congress, Calcutta, 1939. M.A. Khan. op cit., part I chapter II.

৪। W.W. Hunter, The Indian Musalmans, Calcutta, 1945 (Reprint), pp. 36-37, Azizur Rahman Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856, Dacca, 1961, Chapters III-IV ; আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৭৫ বাংলা সন।

৫। Proceedings of the Judicial Department (Unpublished), O. C. Nos. 21-25, 29 May, 1843 ; O.C. Nos. 99-100, 7 April 1847 ; দীনেশ চন্দ্র সেন, আমার জীবন, তৃতীয় ভাগ, কলিকাতা অক্ষয়মিশ, ১৩১৭ বাংলা সন, পৃষ্ঠা ১৪২-১৫৫

৬। W.W. Hunter, op. cit , pp. 38-39

৭। Ibid, p. 10

৮। Ibid ; Chapters I-II; R.C. Majumdar (General Editor), British Paramountcy and Indian Renaissance, vol. IX, Part I, Bombay, 1963, pp. 887-899 . Qeamuddin Ahmad, The Wahabi Movement in India, Calcutta, 1966.

৯। Proceedings of the Indicial Department, O.C. Nos 22-22A, 20 May, 1843, pp 455-456.

১০। Ibid. O.C. No. 23. 20 May, 1843, p.457.

১১। M. A. Khan, op cit., Part I, Chapter II ; J. N. Sarkar, op cit., pp 48-75.

১২। M. A. Khan, op cit; J. N Sarkar, op cit.

১৩। Ibid.

১৪। J. N. Sarkar, op cit., pp. 67-70

১৫। Ibid.

১৬। Ibid, p. 74

১৭। E. A Gait, Census of India, 1901, vol. VI The Lower Provinces of Bengal and their Feudatories, Part 1, The Report, Calcutta, 1902, p. 262.

১৮। Proceedings of the Judicial Department, 20 May, 1843 and

7 April, 1847 , Hunter, op. cit ; James Wise, Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal. London, 1883. pp. 21-27 ; নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর ; A.R. Mallick op. cit.; M.A. Khan op cit, J.N. Sarkar, op cit.

১৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৪২, পৃষ্ঠা ৩১১-৩১২

২০। Proceedings of the Judicial Department, O.C. No. 25, 29 May, 1843, p. 402.

২১। Hunter, op. cit; S. B. Chauuhuri, civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857). Calcutta, 1955, p 97 ; A. R. Mallick, op cit. , Chapters III-IV.

২২। Hunter, op cit ; নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, তৃতীয় খণ্ড ; বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই, কলিকাতা ১৩০৪ বাংলা সন ; A. R. Mallick op cit ; M. A. Khan op cit; J. N. Sarkar, op cit.

২৩। সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর।

২৪। Proceedings of the Judicial Department, op. cit ; Hunter, op cit; A. R. Mallick, op cit.

২৫। Ibid.

২৬। R.C. Majumdar, op. cit., pp. 887-901, 954--955 ; Books and articles on Indigo Rebellion.

২৭। Ibid.

২৮। Ibid.

২৯। ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস এর রচনাবলী, রজনী পাম দত্ত, কে এন আশরাফ, নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, অবনেশ ত্রিপাঠি, বি. বি. মিশ্র, এ. আই. চিচেরভ, ইরফান হবিব, ডি. আই. পাভলভ প্রভৃতি লেখকের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নিয়েছি।

৩০। S. B. Chaudhuri, op. cit ; নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, কলিকাতা, ১৯৫৭ ; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬ ; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৬ বাংলা সন।

৩১। Anil Sil, The Emergence of Indian Nationalism. Cambridge, 1968, Chapter 7 ; A.I.C.C. Papers available at Nehru Memorial Museum & Library New Delhi ; Volumes of of Annual Register by Mitra ; News Papers of Calcutta, in National Library ; Files of Ganshani (1926-1928)